চীনাবাজার

নিমাই ভট্টাচার্য

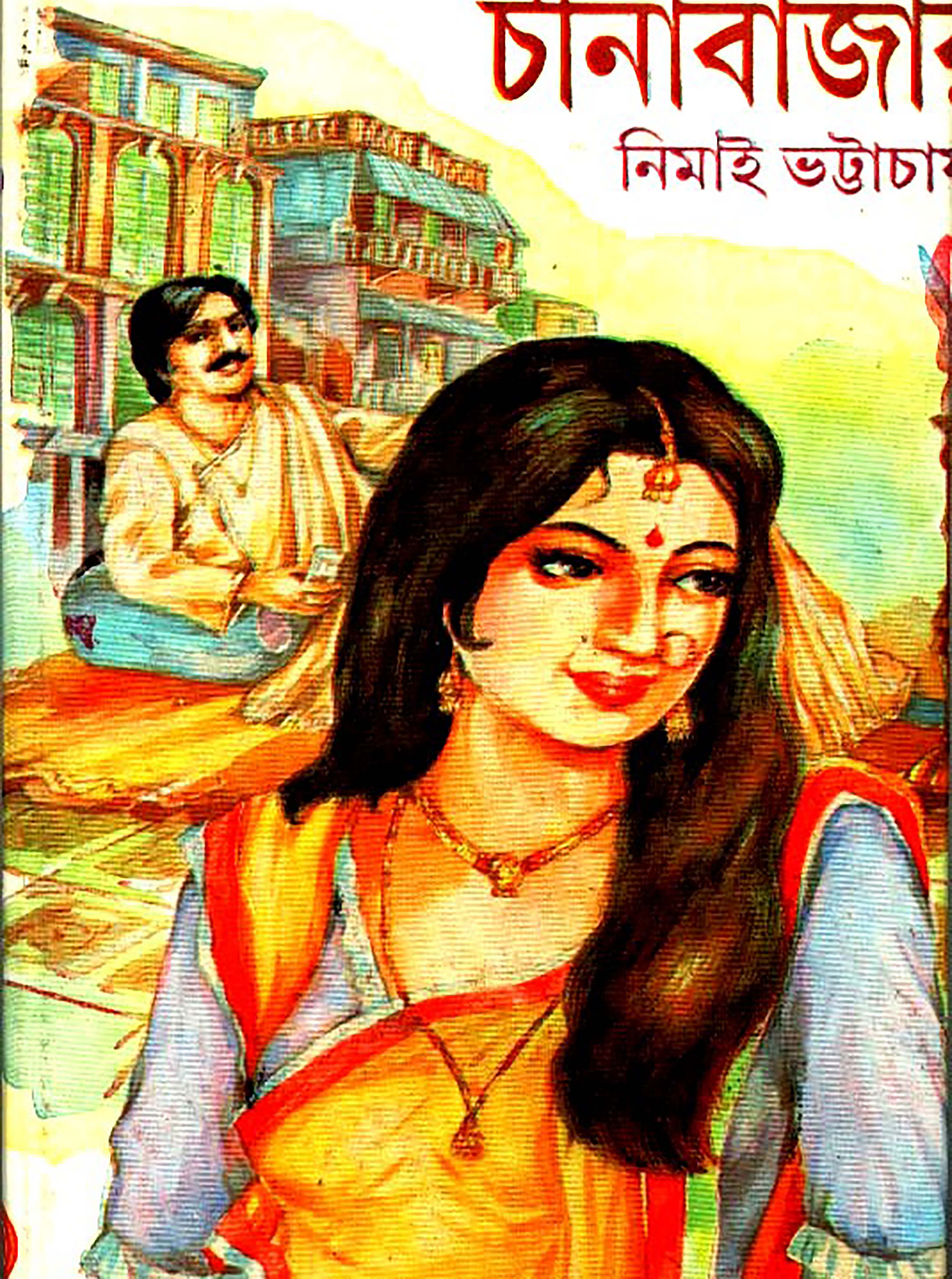

চীনাবাজার

নিমাই ভট্টাচার্য

BIRCHANDRA STATE CEN... LIBRARY
RRRLF
3554
14.12.95

দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

CHEENA BAZAR
A Bengali Novel by Nimai Bhattacharyya
Published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta 700073
Rs. 50.00

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৫

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ

দাম : ৫০ টাকা

ISBN-81-7079-698-9

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপনা : লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০৭৩

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী প্রতিমা ভট্টাচার্যকে

লেখকের অন্যান্য বই

স্বপ্নভঙ্গ
এক চক্কর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
ফুটবলার
কেয়ার অব ইন্ডিয়ান এম্বাসী
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
শেষ পারানির কড়ি
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
রাজধানী এক্সপ্রেস
রাজধানীর নেপথ্যে
অনেকদিনের মনের মানুষ
পিকাডিলি সার্কাস
ডিফেন্স কলোনী
পার্লামেন্ট স্ট্রীট
সাব-ইনস্পেক্টর
লাস্ট কাউন্টার
উইং কমান্ডার
প্রবেশ নিষেধ
শ্রেষ্ঠাংশে
সেলিম চিস্তি
ভি আই পি
মেমসাহেব
ভালোবাসা
ডিপ্লোম্যাট
রিপোর্টার
অ্যালবাম
এডিসি
রিটায়ার্ড
পেন ফ্রেন্ড এন্ড ক্লাস ফ্রেন্ড
আকাশভরা সূর্য তারা
ওয়ান আপ টু ডাউন
এই আমি সেই আমি
মাতাল
জার্নালিস্টের জার্নাল
ভরা থাক স্মৃতি সুধায়
বাঙালীটোলা
ইন্দ্রাণী
অধ্যাপিকা
শ্রাবন্তী
গোধূলিয়া
একান্ত নিজস্ব
মোগলসরাই জংশন
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
ইওর অনার
চিড়িয়াখানা
ইমন কল্যাণ
ইনকিলাব
ব্যাচেলার
প্রিয়বরেষু
ককটেল
নিমন্ত্রণ
তোমাকে
সোনালী
ম্যাডাম
রবিবার
রত্না
কেরানী
নাচনী
বন্যা
অসমাপ্ত চিত্রনাট্য
নিউমার্কেট
নিউ এম্পায়ার ক্লাব
স্বার্থপর
কয়েদী
ফুটপাত
ভবঘুরে
শ্রেষ্ঠ গল্প
ভদ্দরলোক
পূজাস্পেশাল
প্রবাসী
ডার্লিং
সদরঘাট
প্রথম নায়িকা
চেক পোস্ট
প্রথম প্রেম
অনুরাগিনী

কলকাতা ৭৫

চীনাবাজার

এক

কথায় বলে, স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত যায় না ধুলে। বৃদ্ধ অঘোর বাঁড়ুজ্যেরও হয়েছে তাই।

সেই কবে কোন কালে ছোটদাদু শিখিয়েছিলেন, আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ, মেকস্ এ ম্যান হেলদি...! তখন ওঁর কত বয়েস? বড় জোর পাঁচ-সাত। আর এখন এই বিরাশি বছরেও সে অভ্যেস ছাড়তে পারলেন না। জল-ঝড় শীত-গ্রীষ্ম যাই হোক, ভোর সাড়ে চারটেয় ওঠা চাই-ই চাই। মুখ-হাত ধুয়ে, বাথরুম পর্ব শেষ করে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে পাঁচটার মধ্যে প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেই হবে।

সেই পুরনো অভ্যেস এখনও আছে ; তবে এখন আর বাইরে যান না। অঘোরনাথ ছাদেই পায়চারি করেন। কার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন? বন্ধুবান্ধব তো দূরের কথা, এ পাড়াতে এখন একজন পরিচিত মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অথচ এই ভবানীপুরেই একদিন ওঁর জন্ম হয় ; এখানেই শৈশব-কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছেন। তখন কত অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, পরিচিত ছিল চারদিকে।

ছোটদাদুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে কি দারুণ রোমাঞ্চ ছিল ; বাড়ি থেকে বেরিয়েই ছোটদাদু ওঁকে বলতেন, দাদুভাই, কুইক মার্চ!

ব্যস! শিশু অঘোরনাথ প্রায় দৌড়তে শুরু করতেন আর ছোটদাদু লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতেন। বড় রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়ে থাকতেন স্বয়ং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়! অঘোরনাথ প্রায় ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। স্যার আশুতোষ ওঁর মাথায় এক হাত রেখেই অন্য হাত দিয়ে পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বলতেন, ত্রিদিব, আজও তুমি এক মিনিট দেরিতে এলে।

ছোটদাদু সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, দাঁড়াও, ঘড়িটা মিলিয়ে দেখি। তারপর নিজের ঘড়িটা দেখেই বলতেন, আই অ্যাম স্যারি আশুতোষ।

ছোটদাদু এইটুকু বলেই থামতেন না। বলতেন, আমি কথা দিচ্ছি আশুতোষ, কাল থেকে আর দেরি হবে না।

সেই সব দিনের কথা আজ যেন স্বপ্ন মনে হয়। ছোটদাদু ত্রিদিবনাথ বাঁড়ুজ্যে ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক আর স্যার আশুতোষ ছিলেন প্রখ্যাত বিচারপতি। কলকাতা ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্সেলার। রোজ সকালে অঙ্ক-শাস্ত্র নিয়ে দুই বন্ধুর তর্কাতর্কি দেখে অঘোরনাথ ঘাবড়ে যেতেন। ভয় পেতেন। মনে মনে ভাবতেন, হয়তো দুই বন্ধুর আর মুখ দেখাদেখিও হবে না। হা ভগবান! পরের দিন সকালবেলায় ঐ মোড়ের মাথায় পৌঁছেই দেখতেন, বাংলার বাঘ দাঁড়িয়ে আছেন। অত বড় গোঁফের তলা দিয়েও ওঁর মুখের হাসিটি দেখে শিশু অঘোরনাথও হেসে ফেলতেন।

দুই বন্ধুর একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেও হবে, আবার তর্ক-বিতর্কও হবে। অঘোরনাথ কিছুই বুঝতে পারতেন না। কিছু যে জিজ্ঞেস করবেন, তাও সাহসে কুলোতো না। তবে একটু বড় হবার পর উনি একদিন সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলেন না—আচ্ছা ছোটদাদু, রোজ সকালে আপনারা দুই বন্ধু ঝগড়া করেন কেন?

ত্রিদিবনাথ এক গাল হাসি হেসে আদরের নাতিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, না দাদুভাই, আমরা ঝগড়া করি না ; তর্ক করি।

অঘোরনাথ অবাক হয়ে ছোটদাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ছোটদাদু একটু থেমে আবার বলেন, আমি শুধু অঙ্ক শাস্ত্র নিয়ে একটু-আধটু পড়াশুনা করেছি আর আশুতোষ যে কোন শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত না, তা ভগবানই জানেন। একটু তর্ক-বিতর্ক না করলে কি ওঁর কাছ থেকে কিছু জানার উপায় আছে?

এই ছাদে পায়চারি করতে করতে বৃদ্ধ অঘোর বাঁড়ুজ্যের চোখের সামনে যেন সেইসব দিনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি ভেসে ওঠে। একদিনের কথা ওঁর স্পষ্ট মনে আছে। কলেজ থেকে ফেরার পরই ছোটদাদু বললেন, দাদুভাই, আজ সন্ধেবেলায় আশুতোষের বাড়ি যেতে হবে।

—সন্ধেবেলায়? কিশোর অঘোরনাথ একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন।

—হ্যাঁ দাদুভাই, আজ ওকে অভিনন্দন জানাতে যাব। উনি একটু থেমে বলেন, আশুতোষের জন্যই এবার থেকে তোমরা ইউনিভারসিটিতে এম. এ. এম. এস-সি পড়তে পারবে। ও যে বাঙালির কি উপকার করল, তা এখন তুমি বুঝবে না। বড় হলে বুঝবে।

বিরাট দু'হাঁড়ি রসগোল্লা আর বেশ কিছু বই নিয়ে সেদিন সন্ধেয় ত্রিদিবনাথ বন্ধু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন। সেদিন ওখানে কত বিখ্যাত পণ্ডিতের ভিড় দেখেছিলেন অঘোরনাথ, সে স্মৃতি কি ভুলে যাওয়া সম্ভব?

এই ভোরবেলায় পায়চারি করতে করতেই আরো কত কথা মনে পড়ে! এই ভবানীপুরে তখন কত বিখ্যাত জজ-ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, উকিল আর ডাক্তার থাকতেন। ছোটদাদুর সঙ্গে টাউন হল বা অ্যালবার্ট হলের সভায় গেলে ভবানীপুরের কত মানুষকে দেখা যেত! আর এখন? প্রত্যেকটা বাড়ি বদলে গেছে। বদলে গেছে বাড়ির চেহারা, বদলে গেছে বাড়ির বাসিন্দারা! পাড়াটা দেখে যেন আর চেনা যায় না। অতীতের চিত্ত-চাঞ্চল্যময়ী উনযৌবনা নায়িকা যেন জরাগ্রস্তা, বিধবা! নাকি মানস-মন্দিরের সেই প্রতিমা কুলত্যাগিনী কলঙ্কিনী! দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভারে অঘোরনাথ আর পায়চারিও করতে পারেন না, থমকে দাঁড়ান।

নামের ডাকে গগন ফাটে, ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে। সরকারদের বাড়িটাও হয়েছেই তাই। ঐ হতচ্ছাড়া আজ আবার সাত সকালে মুকুন্দর সঙ্গে ঝগড়া করছে। নিশ্চয়ই বউ বলেছে, চা-চিনি নেই। তাই মুকুন্দর দোকান থেকে চা নিতে গেছে। এই সাত সকালে কোন দোকানদার ধার দেবে? তার উপর বিনুর মতো খদ্দেরকে। সঙ্গে সঙ্গে বাবুর কি রাগ! দেখ মুকুন্দ, ভুলে যাস নে আমি সরকারবাড়ির ছেলে! তাছাড়া তুই আমাদের জমিতে আমাদের কৃপায় দোকান করেছিস।

না, মুকুন্দ চুপ করে থাকেনি : থাকবে কেন? বিনু সরকারের কছে তো ও মাথা বিক্রি করেনি! মুকুন্দ ওকে সোজাসুজি বলেছে, চুপ করো, চুপ করো। বেশি ওস্তাদি দেখিও না। তুমি যে বুড়ির কৃপায় এই বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকো, আমি সেই বুড়ির ভাড়াটে। তোমার কৃপায় ব্যবসা করার আগে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

—ওরে যে বুড়ির কথা বলছিস, সে আমার ঠাকুমা ; তোর কে?

শুধু মুকুন্দ না, দোকানের দু'তিনজন খদ্দেরও ওর কথায় হাসে। হাসবে না কেন? মুকুন্দ ওর কথার জবাব না দিয়ে অন্য খদ্দেরদের দিকে নজর দেয়।

বিনু একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে মুকুন্দ, চা দিবি কি?

—যে খদ্দের তিরিশ-বত্রিশটা টাকা ছ'মাসের মধ্যে দিতে পারে না, তাকে ধারে

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বিনু বলে, ঠিক আছে। তোকে কি করে টাইট দিতে হয়, তা আমি জানি।

কবে কোনকালে বাড়িটায় গোলাপী রং করা হয়েছিল, তার ঠিক নেই। জল-ঝড় রোদ-বৃষ্টিতে সে রং কবে ধুয়ে-মুছে উঠে গেছে; একটু-আধটু ছাপ লেগে আছে এখানে-ওখানে কিন্তু তবু পাড়ার সবাই বলে, গোলাপী বাড়ি। এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দারা অবশ্য বলেন সরকারবাড়ি। তবে নামেই সরকারবাড়ি। এ বাড়িতে কত রকমের কত ভাড়াটে যে আছে, তা শুধু ভগবানই জানেন। আড়াই বিঘে জমির উপর বিরাট চারতলা বাড়ির মধ্যে মাত্র দু'খানা ঘর এখনও ঐ বুড়ি কামিনীবালা দাসীর দখলে। বাকি সব ঘরদোর ভাড়াটেদের দখলে। এই বুড়ি যেদিন চোখ বন্ধ করবে, সেইদিন এই দু'খানা ঘরও কোনো ভাগ্যবান ভাড়াটের হাতে চিরকালের জন্য চলে যাবে। ব্যস! সেইদিন থেকে এই বাড়িতে সরকারদের নাম চিরকালের জন্য মুছে যাবে।

বুড়ি কামিনীবালার দিনও শুরু হয় এই সাত সকালেই। ইচ্ছা হয় আরো একটু শুয়ে থাকতে কিন্তু দেরি হলে তো পোড়া কয়লাগুলো বেছে কে যে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। তাই ঘুম থেকে উঠেই চোখে-মুখে জল দিয়ে একটা ভাঙা কড়া হাতে নিয়ে শিউলিতলায় চলে যান।

এই বিরাট শিউলিগাছের চারপাশে এখন ছাইয়ের পাহাড়। হবে না! যদি তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন সাত গুষ্টির উনুনের ছাই এখানে ফেলে, তাহলে আর কি হবে? একটুকরো পাথরের উপর আধপোড়া কয়লার টুকরোগুলো ঠুক ঠুক করে ঠুকতে ঠুকতে বুড়ি অজান্তেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, জম্মো জম্মো ধরে কি পাপই যে করেছিলাম!

সত্যিই তাই। এককালে ঠিক এই জায়গায় কি সুন্দর বাগান ছিল! ছোটকর্তা নিজে কত জায়গা থেকে কত ভাল ভাল ফুলের গাছ এনে এই বাগান সাজিয়েছিলেন। চাঁপা, চামেলি, গন্ধরাজ, গোলাপ! কত রকমের গোলাপ! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। তাছাড়া বিলিতি ফুলের কত গাছ ছিল। সন্ধেবেলায় ছাদে গেলেও এইসব ফুলের গন্ধে মন ভরে-যেত

কী একটা শব্দ হতেই কামিনীবালা মুখ তুলে এদিক-ওদিক দেখেন। কাউকে না দেখে দৃষ্টিটা গুটিয়ে আনতে গিয়েও আনতে পারেন না। ডানদিকের ঐ টিনের ঘরখানা দেখেই বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। ওখানেই তো ছিল আস্তাবল। বাপরে বাপ! ঘোড়াগুলো কি বিরাট ছিল! দেখতেও কি সুন্দর ছিল। ছোটকর্তার ঘোড়াটা আবার সাদা--কালো রংয়ের ছিল। ওকে দেখতে সব চাইতে ভাল ছিল। তাছাড়া ছুটত কি জোরে! ওর গাড়ি চড়লে যেন মনে হতো উড়ে যাচ্ছি। ছুটবে না? ঘোড়াগুলোর কি যত্ন করা

হতো। ছ'জন তাগড়া পশ্চিমী হিমশিম খেয়ে যেত ওদের দেখাশোনা করতে। ছোটকর্তার গাড়ি চড়ে কামিনীবালা কতদিন কত জায়গা বেড়াতে গিয়েছেন। কালীঘাট থেকে আহিরীটোলা-শোভাবাজার-বাগবাজার এমনি বরানগর-দক্ষিণেশ্বরেও গিয়েছেন কতদিন। আর আজ? সেই আস্তাবলের পাশে ছাইয়ের ঢিপির উপর বসে পোড়া কয়লা বাছতে হচ্ছে! একেই বলে, কপালের লিখন না যায় খণ্ডন!

কয়লা বাছতে বাছতে বুড়ি কামিনীবালার কত কি মনে পড়ে। রোজ মনে পড়ে। কি ছিল না এই সরকারবাড়িতে? দাস-দাসী ঠাকুর-চাকর দারোয়ান-কোচোয়ান থেকে বাজার সরকার-ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত। হাঁচি-কাশি দেবার আগে দাস-দাসীরা ছুটে আসতো। বাড়ির কর্তা-গিন্নিদের হুকুম তামিল করে ওরা কৃতার্থবোধ করতো। বিশেষ করে ছোটকর্তার জন্য ওরা কি না করতে পারতো?

হঠাৎ কামিনীবালার চোখে-মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ছোটকর্তা কি রসিকই ছিলেন! কি আনন্দ আর হৈ-হুল্লোড়ই না করতে পারতেন! অথচ এই মানুষটাকেই ফুলশয্যার রাত্তিরে দেখে কি ভয়ই পেয়েছিলেন!

সেদিন ফুল দিয়ে কি সুন্দর সাজানো হয়েছিল ছোটকর্তার ঘর। যেদিকে তাকাও সেদিকেই শুধু ফুল। আর কি সুন্দর আতরের গন্ধ! আঃ! এখনও যেন নাকে লেগে আছে। বারান্দার বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতেই বড়গিন্নি মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, কি হলো ছোটবউ? কর্তা আসছে না দেখে মন খারাপ লাগছে নাকি?

কিশোরী কামিনীবালা কোনো জবাব দেননি, দিতে পারেননি।

বড়গিন্নি এবার বললেন, ছোটকর্তা হচ্ছেন এ বাড়ির সবচেয়ে রসিক মানুষ। তিনি ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে আড্ডায় একটু আটকে পড়েছেন বলেই...

ঠিক এমন সময় কে যেন ঘরে ঢুকেই বলে গেল, ছোটকর্তা আসছেন। ব্যস! এক মুহূর্তের মধ্যে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু টলতে টলতে মুখে হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকেই ছোটকর্তা বললেন, শুদ্দু তোমার জন্য এই সন্ধেবেলায় ছোট্ট খোকাবাবুর মতো বাড়ি ফিরে এলাম।

ছোটকর্তার কথা শুনে কামিনীবালার মাথা ঘুরে যায়। লোকটা বলে কী? এই ওর সন্ধেবেলা? নববধূ দুর্গানাম শরণ করেন।

ছোটকর্তা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে কামিনীবালার মুখের সামনে মুখ নিতেই উনি কি একটা বিচ্ছিরি গন্ধে মুখ ঘুরিয়ে নেন। ছোটকর্তা এক গাল হাসি হেসে বললেন, ভয় পেয়ো না ছোটগিন্নি। আজ শুভদিন বলে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে বসে একটু সিদ্ধি

খেয়েছি; কিচ্ছু ভয় পাবার নেই।

ওঁর কথা শুনে কামিনীবালার রক্ত প্রায় জল হয়ে যায়। জিভ তো শুকিয়ে কাঠ!

আবার ছোটকর্তার মুখে সেই হাসি। উনি বলেন, হাজার হোক আমি সরকারবাড়ির ছোটকর্তা। এমনি সিদ্ধি তো মুখে রোচে না ; তাই বিলিতি সিদ্ধি খেয়েছি।

দত্তদের ঐ পুরনো বাড়িটার সামনে দু'তিনটে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে পাঁচ-সাতজন নেমে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখাতে দেখাতে আলাপ-আলোচনা করছেন। এই গাড়িগুলি চেপে এঁরাই আরো কয়েকবার এসেছেন। মাসখানেক আগে এক রবিবার সকালে দু'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তিন-চারজন বয়স্কা মহিলাও এসেছিলেন। ঐ মহিলারা বাড়ির চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখার পর ভিতরেও গিয়েছিলেন।

ভদ্রলোকেরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর একটা গাড়ির বনেটের উপর একটা বিল্ডিং প্ল্যান রেখে কত কি কথাবার্তা বললেন। প্রায় আধঘণ্টা আলাপ-আলোচনার পর এক ভদ্রলোক বাড়ির পিছন দিকের দোতলা থেকে বিশুবাবুকে ডেকে আনলেন।

কোনো ভূমিকা না করেই কেশব আগরওয়াল ওঁকে প্রশ্ন করলেন, বিসুবাবু, আপনি কবে শিফট্ করছেন।

বিশুবাবু লুঙ্গি ঠিক করতে করতে বললেন, শিফট্ তো আমি কালই করতে পারি, কিন্তু সোনারপুরের স্কুলে ছেলে দুটোকে ভর্তি না করা পর্যন্ত....

—কিন্তু আমরা তো কাল থেকেই বিল্ডিং ভাঙা শুরু করছি।

—কাল থেকেই?

হাঁ, কাল থেকেই। কেশববাবু সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বের করতে করতে বলেন, এখন আর ভবানীপুরে দো-তিনতলা বাড়ি বানিয়ে পোসাবে না। কমসে কম ছ'তলা না হলে পরতায় পোসাবে না। কিন্তু সামনের দেওয়ালীর আগে এই ছ'তলা কমপ্লিট না করতে পারলে আমাদের মিনিমাম চালিস লাখ টাকা লুকসান হবে।

বিশুবাবু ওঁর কথা শুনে চুপ করে থাকেন।

কেশববাবুর রুপোর কৌটো থেকে পান-জর্দা মুখে দিয়ে বলেন, আপনি রবিবারের মধ্যে পজিটিপলি চলে যাবেন।

কেশববাবুর বড়ছেলে কিশোরবাবু এই কলকাতা শহরেই জন্মেছেন। প্রথমে দয়ানন্দ সরস্বতী স্কুলে ও পরে সিটি কলেজে লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাপের ব্যবসায় নিত্য যাতায়াত করে এই চল্লিশ বছর বয়সেই পাকা ব্যবসাদার হয়েছেন। এই দত্ত পরিবারের এক আত্মীয়ের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব আছে এবং সেই সূত্রেই এই সম্পত্তি ওঁরা কিনতে পেরেছেন। এই পরিবারের সবকিছুই উনি জানেন এবং ওঁর উপর কেশববাবুর ষোল আনা আস্থা আছে। তাই তো উনি সোজাসুজি বিশুবাবুকে বললেন, দেখুন বিশুবাবু, আপনার সঙ্গে এই দত্ত ফ্যামিলির কোনো ডাইরেক্ট সম্পর্কও নেই; অথচ একটি পয়সা ভাড়া না দিয়ে সারাজীবন এই বাড়িতে বেশ কাটিয়ে দিলেন। আমরা নিছক ভদ্রলোক বলে আপনাকে কিছু টাকা দিয়েছি। যাই হোক, আপনি রবিবারের মধ্যেই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

বিশুবাবু এদের নতুন দেখছেন না। সবই জানেন, সবই বোঝেন। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদেরই যখন চলে যেতে হয়েছে, তখন ওঁকেও যে যেতে হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু উনি বললেন, যদি কাইন্ডলি আরো একটা সপ্তাহ টাইম দেন, তাহলে....

—অসম্ভব।

ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক ওঁদের আশেপাশে জড়ো হয়েছেন। এঁদেরই একজন বললেন, বিশু, তুমি বিনা ভাড়ায় এত বছর কাটাবার পর এঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েও বাড়ি ছাড়ছ না?

কিশোরবাবু বেশ রাগ করেই বললেন, আই হ্যাভ পেড হিম ফাইভ থাউজ্যান্ড রুপিজ।

—পাঁচ হাজার! ভদ্রলোক এবার হেসে বিশুবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো আচ্ছা ওস্তাদ লোক! ফোকটে পাঁচ হাজার পেয়েও বাড়ি ছাড়তে ...,

পিছন দিক থেকে একটি ছোকরা বলল, বিশুদা, ক্লাবের পুজোর চাঁদা না দিয়ে কেটে পড়ো না।

এবার বিশুবাবু বললেন, ঠিক আছে, রবিবারের মধ্যেই আমি চলে যাব।

কিশোরবাবু মুখ ঘুরিয়ে এক ভদ্রলোককে বললেন, মিঃ ঘোষ, তাহলে কাল থেকেই

কাজ শুরু করে দিন।

মিঃ ঘোষ বললেন, হ্যাঁ, কালই শুরু করব। বর্ষার আগে রিইনফোর্সড্‌ কনক্রিটের কাজ শেষ না করতে পারলে ভীষণ মুশকিলে পড়ব।

—কাম হোয়াট মে, বর্ষার আগেই এই কাজ শেষ করতে হবে।

—সে তো একশ'বার। মিঃ ঘোষ এবার পিছন দিক ফিরে বললেন, মুখার্জিবাবু, মানিককে সব কথাই বলা আছে ; তবু এখুনি একবার ওর অফিসে গিয়ে আরেকবার বলে আসুন কাল সকাল থেকেই কাজ শুরু হবে।

কিশোরবাবু ড্রাইভারকে বললেন, চন্দনকো জলদি বুলাইয়ে।

দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চন্দন হাজির হয়েই বলল, কিশোরদা, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

—শোন, কাল থেকেই আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে। সুতরাং....

—ব্যসস্‌ ব্যসস্‌ আর বলতে হবে না। এখান থেকে যদি একটা ইটও এদিক-ওদিক হয়, তাহলে চন্দন মুখুজ্যেকে জুতো পেটা করবেন।

কিশোরবাবুর ওর পিঠে একটা চড় মেরে বললেন, তুই বড্ড বকবক করিস।

চন্দন চলে যেতেই মিঃ ঘোষ একটু হেসে বলেন, ছেলেটি বেশ গুণী মনে হলো।

কিশোরবাবু হেসে বলেন, খুব গুণী কি না জানি না ; তবে পাতালরেলের লোহালক্কড় সিমেন্ট চুরির জন্য উইকে অন্তত একবার ওকে ভবানীপুব থানায় যেতেই হয়। মাত্র বার চারেক জেলও খেটেছে।

মিঃ ঘোষ হো হো করে হেসে ওঠেন। তারপর হাসি থামলে বলেন, এর চাইতে গুণী ছেলে আমাদের দরকার নেই।

কিশোরবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, অথচ হি কামস ফ্রম এ ভেরি ভেরি গুড ফ্যামিলি, আর ছেলেটাকে প্রপারলি ডিল করলে দেখবেন, হি ইজ নট এ ব্যাড এলিমেন্ট।

উনুনে ডাল বসাতে বসাতেই মালতী দেবী ডান দিকে মুখ করে একটু গলা উঁচু করে বলেন, হ্যাঁগো, বাজার যাবে না?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রামপ্রসন্ন মিত্তির পুরনো ফিল্ম ম্যাগাজিনে ডিম্পলের একটা সুন্দর ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই সময় বাজার যাবার কথা শুনে ওঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। বললেন, এত বেলায় বাজার যাবার কথা বলছ?

মালতী দেবী উঁকি দিয়ে একবার টাইমপিস দেখেই বলেন, মোটে তো সাতটা বাজে।

এর আগে আবার কবে তুমি বাজারে যাও?

ডিম্পলের ছবি দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যান রামপ্রসন্নবাবু। তাই স্ত্রীর কথা শুনেও যেন শুনতে পান না। একটু পরে বলেন, মন্টুকে বলো না, একটু বাজার যেতে।

—তাঁকে পাব কোথায়? তিনি রাজ্যসম্মেলন নিয়ে এতই ব্যস্ত যে ভোর ছ'টায় বেরিয়ে গেছেন।

রেখা-হেমা মালিনী-শ্রীদেবীর নানা ভঙ্গিমার ছবি দেখতে দেখতেই উনি বলেন, ছেলেকে বলে দিও, মিছিল-মিটিং করে পেটও ভরবে না, দেশেরও কিছু হবে না।

—তুমি বলে দিও। মালতী দেবী তরকারির ছোট্ট ঝুড়িটা একবার দেখে নিয়েই আবার বলেন, কিগো, বাজার যাবে না?

—ডিম নেই?

—আছে।

—তাহলে ঐ ডিম দিয়েই আজ চালিয়ে নাও।

—কিন্তু যা ডিম আছে, তা দিয়ে তো দু'বেলা সবার হবে না। এবার মালতী দেবী ঘরে ঢুকে স্বামীকে দেখে একটু হেসে বলেন, সিনেমা ম্যাগাজিন আনার জন্য খুকির উপর রাগ করো, কিন্তু আমি তো দেখি এইসব বই পড়তে তোমারই আগ্রহ সব চাইতে বেশি।

অবস্থার গুরুত্ব মালতী দেবী খুব ভালভাবেই বোঝেন এবং জানেন। যেদিন ভবানীপুরের দেবীপ্রসন্ন মিত্তিরের পুত্রবধূ হয়ে এই বাড়িতে প্রথম আসেন, সেদিন ওঁর মনে কত স্বপ্ন, কত আনন্দ! স্বামী তখনও কলেজের ছাত্র কিন্তু তবুও স্থির জানতেন এত বড় পরিবারের ছেলে কিছু না কিছু হবেই। তাছাড়া শরৎ বোসের পরম স্নেহভাজন আস্থাভাজন উকিল দেবীপ্রসন্ন মিত্তিরের ছেলে হয়তো ব্যারিস্টারও হতে পারেন। অন্ততপক্ষে নামকরা উকিল নিশ্চয়ই হবেন, কিন্তু হা ভগবান! কি ভেবেছিলেন আর কি হলো!

একটা ছেলেমেয়েকে নিয়েও শান্তি পেলেন না মালতী দেবী। পাঁচজনের একজনও মনে মতো হলো না। বড় ছেলে দুর্গাপুরে ইলেকট্রিকের মিস্ত্রীর কাজ করছে, একথা লোককে বলতেও ঘেন্না হয়। মন্টুও যেভাবে রাজনীতিতে মেতেছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ওর ভবিষ্যৎও বিশেষ উজ্জ্বল না। আর তিনটি মেয়ে তো তিনটি অবতার! ছোটটিকে নিয়ে এখনও তেমন কোনো ঝামেলা ভোগ করতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু ও যে দুই দিদির মতো যন্ত্রণা দেবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

দুটি মেয়ের এমনই খ্যাতি ছিল যে তাদের পার করতে খেসারত দিতে হয়েছে

অনেক। না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। বড় খুকির বিয়ের সময়েই তো দোতলাটা গুপ্তাজিদের দিয়ে যে টাকা অ্যাডভান্স পাওয়া গেল, তাই দিয়ে কোনোমতে মান রক্ষা হলো। মেজ খুকির বিয়ের সময় কার কাছে হাত পাততে হয়নি? এ পাড়ায় যে ক'ঘর পুরনো বাঙালি আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কম-বেশি সাহায্য করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায়। কারণ রামপ্রসন্ন মিত্তিরের অবস্থা কে না জানেন? কে না জানেন দেবী মিত্তিরের মৃত্যুর পর রাম মিত্তির রেস খেলে সব উড়িয়েছেন? তাই তো পাড়ায় কারুর কাছে ওঁর মুখ দেখাবার উপায় নেই। এমনকি মেয়ের বিয়ের সময়েও উনি পুরনো প্রতিবেশীদের বাড়ি যাননি।

মালতিকে দেবী অঘোর বাঁড়ুজ্যেকে প্রণাম করে কার্ডটা হাতে দিতেই উনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, বৌমা, কার বিয়ে?

—মেজ মেয়ের।

—বাঃ! খুব আনন্দের কথা।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাইপো নীতীশের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ছোট মা, বৌমা এসেছেন মেজ মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

নীতীশবাবুর স্ত্রী কণিকা একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ আমি জানি।

—আজকালকার দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো সহজ ব্যাপার না।....

—সে তো একশ'বার।

বৃদ্ধ অঘোরনাথ কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে পাঁচশ টাকার চেক কেটে নীতুকে দিয়ে বলবে, ও নিজেও যেন শ'আড়াই দেয়। তারপর তুমি বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ সাড়ে সাতাশ' দিয়ে বিয়ের কিছু জিনিসপত্র কিনে দিও।

কণিকা দেবী একটু হেসে বলেন, ছোট কাকা, আপনি রিটায়ার্ড হয়ে যদি পাঁচশ' দেন, তাহলে আপনার ছেলে আড়াইশ' দেবে কেন? তারও অন্তত পাঁচশ' দেওয়া উচিত।

মালতী দেবী অবাক হয়ে ওঁদের দুজনের কথা শোনেন।

অঘোরনাথ একটু মধুর হাসি হেসে বলেন, আমার যা কিছু দরকার তা সবই তো তোমরা দাও ; আমার আর খরচা কোথায়। তোমাদের তো এখনও অনেক দায়-দায়িত্ব পড়ে আছে।

—নাতি-নাতনীদের জন্য আপনার খরচ কম?

—ওদের জন্য আবার কোথায় খরচা করি?

কণিকা দেবী একগাল হাসি হেসে মালতী দেবীকে বলেন, জানো মেজদি, ছোট কাকার সব টাকাকড়ি আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা আছে। দু'দিন পর পরই উনি বলবেন, ছোট মা, হাত একেবারে খালি। কিছু টাকা তুলে দেবে?

মালতী দেবী মুগ্ধ হয়ে ওঁর কথা শোনেন।

নীতুবাবুর স্ত্রী বলেন, নাতি-নাতনীদের বাঁদরামির জন্য ছোট কাকা কীভাবে জলের মতো টাকা খরচ করেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

বৃদ্ধ অঘোরনাথ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন, কি যে বলো ছোট মা? আমি আবার ওদের জন্য খরচ করলাম কবে?

কণিকা হাসতে হাসতে বলেন, এই দিন দশেক আগে পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টে ডিনার দিলেন কাদের জন্য?

ওঃ! অঘোরনাথ হেসে বলেন, বাপের বিয়ের পর ঐ তো প্রথম ঢোলে কাঠি পড়ল! তাছাড়া ওটা খুবই স্পেশাল ব্যাপার ছিল।

—নাতি-নাতনীদের সবকিছুই স্পেশাল।

অঘোরনাথ মালতী দেবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আচ্ছা তুমিই বলো বৌমা, নাতির সঙ্গে যাদবপুরে একটি মেয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মেয়েটি রূপে-গুণে কথায়-বার্তায় এত ভাল যে তোমাকে কি বলব। বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, মেয়েটির সঙ্গে আমার আবার খুবই ভাব-মানে ভেরি স্পেশাল ভাব। এখন ঐ মেয়েটির সঙ্গে জন্মদিনে আমি নাতি-নাতনী আর তাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে কি অন্যায় করেছি?

ঘটনাটা শুনেও মালতী দেবীর মন খুশিতে ভরে যায়। বলেন, না. না, অন্যায় করবেন কেন।

—ঐ শোনো ছোট মা, বৌমা কি বলছেন।

কণিকা হেসে বলেন, মেজদি, তোমাকে পরে আমি সব বলব।

যাই হোক, এই বাঁড়ুজ্যে বাড়ি থেকেই ওঁদের মেজ মেয়ের বিয়ের সময় পুরো এক হাজার টাকার জিনিসপত্র কিনে দেন। এমনকি ঐ সরকার বাড়ির বুড়ি কামিনীবালা পর্যন্ত, একটা নাকছাবি মালতী দেবীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, বৌমা, আমার তো আর সেদিন নেই ; তাছাড়া যা সামান্য কিছু ছিল, তাও হতভাগা নাতিদের কল্যাণে শেষ হয়েছে। এটা ছাড়া আর কিছু নেই! তুমি এটা ভেঙেচুরে ওকে যা হয় করে দিও।

স্বামীর কল্যাণে মালতী দেবী কার কাছে হাত পাতেননি? বাইরের দরজা থেকে রান্নাঘরে ফিরে আসতে আসতেই এইসব মনে পড়ে ওঁর। এমন সময় সিঁড়িতে চটির

আওয়াজ শুনেই পিছন ফিরে দেখেন, সন্তোষ নামছে।

ওকে দেখেই মালতী দেবী বলেন, সন্তোষ, বাবা একটা কথা শুনবে?

সন্তোষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, হ্যাঁ কাকিমা, বলুন।

—এখানে না, ঘরে এসো।

সন্তোষ ওঁর পিছন পিছন ঘরে ঢুকতেই মালতী দেবী বলেন, তুমি যদি রাগ না করো, তাহলে একটা কথা বলতাম।

সন্তোষ একগাল হাসি হেসে বলে, আপনি কি যে বলেন! আমি আপনার উপর রাগ করতে পারি? আপনি বলুন কি বলবেন।

—বাবা, কিছু টাকার দরকার কিন্তু...

—কাকিমা, আপনি আমার মায়ের মতো। আপনি আমাকে বেশি বললে লজ্জা পাব।

—কিন্তু বাবা।

—আপনার কত টাকার দরকার?

—হাজার খানেক হলে খুব ভাল হয় ; আর তা না পারলে...

সন্তোষ বলল, আমি দোকানে বেরুবার সময় আপনাকে দিয়ে যাব।

—না, না, তখন কাকা থাকবেন। ওঁর সামনে দিও না। মালতী দেবী লুকিয়ে একতটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, উনি টাকার কথা জানতে পারলেই হয়তো অফিস কামাই করে রেসের মাঠে বসে থাকবেন।

—তাহলে দুপুরবেলায় কোনো এক সময় আমি আসব।

—হ্যাঁ, সেই ভাল।

—তবে কাকিমা, এই টাকার কথা যেন কেউ না জানে। মানে আমি আর আপনি ছাড়া কেউ জানবে না।

—আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

সন্তোষ ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়িয়েও ফিরে এস বলে, আর একটা কথা কাকিমা ; আপনার যখন যা দরকার আমাকে বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।

মালতী দেবী দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলেন, তুমি সুখী হও বাবা। এমন কথা আমার স্বামী বা ছেলেরাও কোনোদিন বলেনি, বলবেও না।

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
RRRLF
3558
14.12.95

—এই পটল, তোর দাদুকে বলে দে, এই বারান্দাটা পেচ্ছাব পায়খানা করা বা মুখ ধোবার জায়গা না।

বারান্দায় এক কোনায় বসে রান্না করতে করতেই আড় চোখে মেজ শ্বশুর অমূল্যচরণকে বারান্দার অন্য দিকের কোনায় বসে মুখ ধুতে দেখেই বঙ্কু বসুর বউ শুধু ঐটুকু বলেই থামেন না। আরো অনেক কথা বলার পর শ্রীমতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, পোড়া কপাল করে এসেছি বলেই এইসব জংলিগুলোকে নিয়ে সংসার করতে হচ্ছে।

অমূল্যচরণ এসব কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেন। বঙ্কুর বউয়ের কথাবার্তার ধরনই এইরকম বলে উনি বিশেষ পাত্তা দেন ন। এই মেয়ের সঙ্গে বঙ্কুর বিয়ের সম্বন্ধ হবার সময়ই উনি বড়ভাইকে বলেছিলেন, দাদা, যে লোকটা এককালে আমাদের পাশের দোকানের কর্মচারী ছিল ও পরে মালিককে ঠকিয়ে দোকানটা নিজের করে নেয়, তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিও না।

প্রফুল্লচরণ বলেছিলেন, কিন্তু মেয়েটিকে যে আমার বড্ড পছন্দ হয়েছে।

—মেয়েটি যত সুন্দরই হোক, ওর শরীরে তো ঐ বেইমান যতীন সরকারের রক্ত আছে। এই বেইমানের মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলে কি তুমি খুব সুখী হবে?

—কোন মেয়েকে ঘরে এনে যে সুখী হবো, তা তো শুধু ভগবানই জানেন। প্রফুল্লচরণ একটু থেমে বলেন, তাছাড়া আমাদের পরিবারের কথা জানে বলেই যতীন একশ' ভরি সোনা, এগারো হাজার টাকা নগদ আর মণ পাঁচেক কাঁসার বাসন দিচ্ছে।

অমূল্যচরণ গম্ভীর হয়ে বলেন, এই যুদ্ধের বাজারে জোচ্চুরি করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে বলেই..

মেজভাইকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রফুল্লচরণ বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলেন, এই যুদ্ধের বাজারে কোন ব্যবসাদার জোচ্চুরি করে পয়সা কামাচ্ছে না? আমরা খদ্দেরদের ঠকিয়ে বেশি কামাচ্ছি না? যত দোষ যতীন সরকারের?

না, এর পর অমূল্যচরণ আর তর্ক করেন নি। যথারীতি মাঘ মাসের এক শুভদিনের শুভলগ্নে স্বর্গীয় রায়সাহেব সারদাচরণ বসুর প্রপৌত্র, স্বর্গীয় বরদাচরণ বসুর পৌত্র ও শ্রীযুক্তবাবু প্রফুল্লচরণ বসুর একমাত্র পুত্র পরম কল্যাণীয় শ্রীমান বঙ্কিমচরণের সহিত উলুবেড়িয়ার লাটবাড়ি খ্যাত সরকার পরিবারের পরম শ্রদ্ধেয় উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু যতীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের তৃতীয়া কন্যা পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতি উমারানীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল।

এই বিয়ের আগেই নিমন্ত্রণপত্র পাবার পরই বসু পরিবারের আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীদের মধ্যে সে কি হাসিঠাট্টা! করবে না কেন? বসু পরিবারের অর্ধেক আত্মীয়-স্বজনই তো চীনাবাজার-কলুটোলা-মুর্গীহাটা-স্ট্রান্ড রোডের আশেপাশেই ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন কয়েক পুরুষ ধরে। এছাড়া বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজন ক্লাইভ স্টিট-ক্যানিং স্ট্রিট-ডালহৌসির নানা সওদাগরী অফিসে চাকরি করেন। এঁরা কাজে-অকাজে হরদম আত্মীয়দের দোকানে যান। সুতরাং উলুবেড়িয়ার লাটবাড়ি খ্যাত সরকার পরিবারের পরম শ্রদ্ধেয় উত্তরাধিকারীকে অনেকেই চেনেন। খুব ভাল করেই চেনেন।

প্রফুল্লচরণে মাসশ্বশুর ও বার্ড কোম্পানির ছোট ক্যাশবাবু হীরেন্দ্রনাথ নেমন্তন্নর চিঠিটা পড়েই নিকেলের চশমাটা একটু তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি লাট্টু সরকারের নাতনীর সঙ্গে বঙ্কুর বিয়ে দিচ্ছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হাজার হোক বার্ড কোম্পানির ছোট ক্যাশবাবু! উঠতে-বসতে খাস বিলিতি সাহেবদের সঙ্গে কাজ-কারবার। ধুতির মধ্যে শার্ট গুঁজে উপরে কোর্ট ও পায়ে কালো বুট পরে অফিস যান। বৈঠখানায় কুইন ভিক্টোরিয়ার বিরাট ছবি। এক কথায় আত্মীয়-স্বজন মহলে পাক্কা সাহেব বলেই খ্যাত। ইংরেজদের মতো কম কথার মানুষ। তবু উনি দু'চারটি কথা জিজ্ঞেস না করে পারেন না। হীরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বলেন, তার মানে তোমার ভাবী পুত্রবধূ ঐ স্কাউন্ড্রেল যতের মেয়ে?

কথাটা শুনেই প্রফুল্লচরণের পিঠে একটা চাবুকের ঘা পড়ল। সারা শরীর-মন জ্বলে ওঠে কিন্তু বার্ড কেম্পানির ছোট ক্যাশবাবুর সামনে প্রতিবাদ করার সাহস হয় না। শুধু বলেন, হ্যাঁ, যতীনবাবুর মেয়ের সঙ্গেই বঙ্কুর বিয়ে দিচ্ছি।

—ঐ অশিক্ষিত মুর্খ জোচ্চর ছোটলোকটা এখন তোমার কাছে যতীনবাবু হয়েছে?

প্রফুল্লচরণ মাথা নিচু করে থাকেন।

—তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু ঐ ছোটলোকের বাড়িতে আমি বরযাত্রী যেতে পারব না।

প্রফুল্লচরণ অত্যন্ত বিনম্রভাবে নিবেদন করেন, দয়া করে অহীন্দ্রবাবুকে যাবার অনুমতি দেবেন।

—ভুলে যেও না প্রফুল্ল, অহি আমার ছেলে এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ওভারসিয়ার। তারও একটা মান-মর্যাদা আছে।

—বৌভাতে...

—সে ভেবে দেখব।

একমাত্র ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে গিয়ে অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনের কাছেই প্রফুল্লচরণকে এই ধরনের কথা শুনতে হয়েছে।

চীনাবাজারে ভোলনাথ মুখার্জি অ্যান্ড সন্সের দোকানের ঠিক উল্টোদিকেই

প্রফুল্লচরণের বড় শালার দোকান। সে তো নেমন্তন্ন চিঠি পড়ে হেসেই খুন। — সত্যি প্রফুল্ল, তুমি এই মেয়ের সঙ্গে বঙ্কুর বিয়ে দিচ্ছ?

—তবে কি আমি বিয়ে করছি? প্রফুল্লচরণ একটু রেগেই জবাব দেন।

বড় শালা নিবারণবাবু এবার বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, ভুলে যেও না প্রফুল্ল, বঙ্কু শুধু তোমার ছেলে না, আমার ছোটবোনেরও ছেলে এবং আমি তার বড় মামা। চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিটের সবাই জানে, ভোলা মুখুজ্যের মতো শিবতুল্য মানুষটাকে যতে সকার চক্রান্ত করে একটা বেশ্যার কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে তার ব্যবসাটা নিজের করে নেয়।

প্রফুল্লচরণ মাথা হেঁট করে বড় শালাবাবুর কথা শোনেন।

—তুমি কি ভেবেছ, তুমি হয়তো কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ হতচ্ছাড়া ছোটলোকটার মেয়ের সঙ্গে বঙ্কুর বিয়ে দিচ্ছ বলে আমি আনন্দে ধেই ধেই করে নাচব?

না, প্রফুল্লচরণ এবারও কোনো কথা বলেন না।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে নিবারণবাবু সব শেষে বলেন, তোমাকে আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি প্রফুল্ল, এই বিয়েতে আমাদের পরিবার থেকে কেউ যেতে পারবে না।

যতীন সরকারের মেয়ের সঙ্গে বঙ্কুর বিয়ে দেবার জন্য সবাই একটু অবাক না হয়ে পারলেন না। অনেকেই সন্দেহ করলেন, যতে সরকার নিশ্চয়ই এমনভাবে প্রফুল্লচরণকে হাত করেছে যে এই বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। সে কি শুধু একশ' ভরি সোনা আর এগারো হাজার টাকা নগদ? নাকি আরো কিছু?

নিবারণবাবুর স্ত্রী সব শুনে একটু মুচকি হেসে বললেন, একাদশীর ঠাকুরানী, ডুব দিয়ে খান পানি। ঠাকুরজামাই ভাবেন, আমরা আর কিছু বুঝি না। ওঁর নিজের কোনো স্বার্থ বা দুর্বলতা না থাকলে ঐ ঘরের মেয়েকে উনি পুত্রবধূ করে আনেন?

নিবারণবাবুর ছোটভাই পঞ্চানন বললেন, ঠিক বলেছেন বৌঠান! আমাদের এই দাদাবাবুটি যে অতীব ঘোড়েল, তা আর জানতে কারুর বাকি নেই।

বড় বৌঠান একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, ঠাকুরপো, আমি বাগনানের মেয়ে। আমার দিদি বিয়ে হয়েছে উলুবেড়ে। লাটবাড়ির ইতিহাস আমার জানতে বাকি নেই।

—শুধু আপনি কেন বৌঠান, দুনিয়ার সবাই জানে যতে সরকারের ঠাকুরদাদা লাটসাহেবের বাড়ির ডাকঘরের পিয়ন ছিল বলেই উলুবেড়ের লোক ঠাট্টা করে ওদের বাড়ির নাম দিয়েছিল লাটবাড়ি।

উলুবেড়ের এই লাটবাড়ি ইতিহাস সত্যি বিচিত্র। যতে সরকারের ঠাকুরদাদা গিরীন সরকার লাটসাহেবের বাড়ির ডাকঘরের পিয়নগিরি করেই পাকা সাহেব হয়ে ওঠেন।

নেড়িকুকুরের মতো কিছু সাহেবকে খুশি করার জন্য উনি কোর্টে গিয়ে হলফনামা করে নিজের নাম বদলে হন মিস্টার গ্রীন সোরকার। শুধু তাই নয়। দেশী পোশাক ত্যাগ করে কোটপ্যান্ট ধরলেন। বউ গাউন পরতে রাজি না হওয়ায় মিস্টার গ্রীন এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছুঁড়িকে বিয়ে করে বৌবাজারে নতুন সংসার পাতলেন। সন্ধের পর একটু বিলিতি ওষুধের সঙ্গে সোডা মিশিয়ে দু'চার গেলাস পেটে না পড়লে ওঁর কিছুতেই ঘুম আসতো না।

এইসব খবর উলুবেড়ে পৌঁছবার পর ঘরে ঘরে সে কি হাসিঠাট্টা আর আলোচনা। কেদার মিত্তিরের বৈঠকখানায় সেদিন কেউ দাবা না খেলে শুধু মিস্টার গ্রীন সোরকারকে নিয়ে হাসাহাসি করেই কাটিয়ে দিলেন। যদু মোক্তার হাসতে হাসতে বললেন, আমার ঠাকুমা বলতেন—

ধানের ব্যাপারী এল আফিঙের ভাউ জানতে
ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা এল ধুতি-উড়ানি কিনতে।

উনি একটু থেমে বলেন, গিরীন হারামজাদারও হয়েছে তাই। লাটের বাড়ির ডাকঘরের পিয়ন যদি কোট-প্যান্ট পরে আর মদ খেয়ে সাহেব হতে পারতো তাহলে আর দুঃখ্যু কি ছিল?

শুধু কর্তাদের আড্ডায় নয়, ঘোষেদের পুকুরঘাটে সারা পাড়ার বউ-ঝিদের মধ্যেও কি কম হাসাহাসি! নন্দ বোসের বউ হাসতে হাসতে বলেন—

মনে করছেন ছিদাম ঘোষ কোলে করবেন নাতি।
সে আশ্বাসে পড়ল ছাই, বউ নয় পোয়াতি।

ওঁর কথা শুনে অন্য সবাই হেসে ওঠেন। তারই মধ্যে নন্দ বোসের বউ বলেন, সরকার বাড়ির কর্তা বোধহয় ভেবেছিলেন উনি ফিরিঙ্গি মাগী নিয়ে ঘর করছেন বলে উলুবেড়ের বউঝিরা আনন্দে গাউন পরে নাচতে শুরু করবে। ঝাঁটা মারো অমন মিনসের কপালে!

তবে উলুবেড়ের লোকজন যে যাই বলুন, গ্রীন সোরকারও কম হুঁশিয়ার ছিলেন না। ঐ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছুঁড়িকে দেখিয়ে আর লর্ড কার্জনের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী ক্যাপ্টেন বেল'কে তৈল মর্দন করে সরকারবাড়ির ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

গ্রীন সোরকার উলুবেড়ে না গেলেও তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলেরা নিয়মিত ওঁর বৌবাজারের বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

—গুড মর্নিং স্যার ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন বেল'কে আসতে দেখেই গ্রীন সোরকার ছত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে ডান হাত মাথায় তুলে সেলাম দেন।

—ইয়েস গ্রীন, এনি লেটার?

—স্যার ক্যাপ্টেন, নো লেটার টু-ডে বাট মাই এক্স ইন্ডিয়ান ওয়াইফ সনস্ স্যালুট ইউ।

ক্যাপ্টেন বেল মুচকি হেসে বলেন, কোথায় তোমার ছেলেরা?

—স্যার ওয়ান মিনিট কামিং।

একটু পরেই গ্রীন সোরকার তাঁর ভূতপূর্ব ভারতীয় স্ত্রীর তিন পুত্রকে নিয়ে ক্যাপ্টেন বেল'এর ঘরে ঢুকেই ছেলেদের বলেন, ক্যাপ্টেন স্যারকে স্যালুট কর।

ছেলেরা পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে। তারপর গ্রীন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একে একে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দেন, স্যার, নাম্বার ওয়ান সন সতীশ ওয়ারশিপ কিং-কুইন এভরিডে ; নাম্বার টু সন গিরীশ পাক্কা সাহেব, রিড ইংলিশ, হেট সংস্কৃত অ্যান্ড বেঙ্গলি ; ফাইনাল সন নীতীশ নট গো কালী মন্দির, ওয়ারশিপ গ্রেট জেসাস।

গ্রীন এখানেই থামেন না। সাহেবকে খুশি করার জন্য বলেন, স্যার অল সনস্ হেট সুরেন বাঁড়ুজ্যে অ্যান্ড পোয়েট্রি রাইটার রবীন্দ্রনাথ টেগোর।

বাংলাদেশে তখন হই হই ব্যাপার। আই-সি-এস পাস করা সুরেন বাঁড়ুজ্যে থেকে প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি রবিবাবুর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওঁদের মতো লোক পর্যন্ত কার্জনের মতো একজন পরম ভারত-হিতৈষীর বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালি জাতটাকে খেপিয়ে তুলল? যাই হোক, তখন মহানুভব সরকারের কিছু বেইমান বাঙালির দরকার। এইসব বেইমান বাঙালিদের বিচার-বুদ্ধি না থাকলে আরো ভাল। সুতরাং ক্যাপ্টেন বেল'এর অনুগ্রহে গ্রীন সোরকারের থ্রি সনস্'এর রাজপূজা করার দুর্লভ সুযোগ এলো। সতীশ আর গিরীশ বেঙ্গল পুলিশে ও নীতীশ কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল হওয়ায় উলুবেড়ের লাটবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। গ্রীন সোরকারও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। নগদ বত্রিশ টাকায় এক ডজন স্যাম্পেনের বোতল কিনে ক্যাপ্টেন বেল'এর কোয়ার্টারে হাজির হয়ে বললেন, স্যার লঙ লঙ স্যালুট টু ইউ। স্যার, ইউ গড! মাই সনস্ স্যালুট ইউ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাইমস্!

না, গ্রীন সোরকারের তিন ছেলেও বেইমানি করেননি, তাঁরা ইংরেজ সরকারের সেবায় মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন এবং তিনজনেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সতীশ কুষ্ঠিয়া বোমার মামলার এক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে এ এস-আই পদে উন্নীত হয়ে মেদিনীপুরে বদলি হন। মেদিনীপুরের যেসব আদর্শভ্রষ্ট যুবকরা মহামান্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন, তাঁদের বিভীষিকা ছিলেন সতীশ সরকার। বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে তাঁর জুড়ি ছিল না সারা মেদিনীপুরে। শুধু মহিষাদল আর তমলুকেরই পাঁচজন বিদ্রোহীকে ইনি গুলি করে হত্যা করে স্বয়ং মহামান্য লাটসাহেবের হাত থেকে প্রশংসাপত্র ও পদক লাভ করেন। উলুবেড়ের লাটবাড়ির

.সামনের ঘরে এই অবিস্মরণীয় ঘটনার ছবি বহুকাল শোভা পেয়েছে। এখনও বোধহয় ভিতরের কোনো ঘরে সে ছবি টাঙানো আছে। মেদিনীপুরের বিপ্লবীরাও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না।

সেদিন ছিল দুর্গাপূজার মহাষ্টমী। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হিংসা-দ্বেষ ভুলে মহিষাদল-তমলুকের সমস্ত মানুষ পূজার আনন্দে মেতে উঠেছেন। জেলা পুলিশের ঝানু গোয়েন্দারা নিশ্চিতভাবে জেনেছিলেন, না, এখন কয়েকদিন কোনো গণ্ডগোল হবে না। সতীশ সরকার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের আগেই উলুবেড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উনি তিন দিনের ছুটি নিয়ে মহাষ্টমীর দিন সকালবেলায় তমলুক থেকে বাসে মেচেদা স্টেশনে এসে উলুবেড়ের ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন আসার তখনও আধ ঘন্টা দেরি। তাছাড়া মহাষ্টমীর দিন! কোন বাঙালি সেদিন ঘর ছেড়ে বেরুবে? প্লাটফর্মে দু' একজন যাত্রী এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। একটু পরে দু'জন মাঝারি বয়সী বৈষ্ণব খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন গাইতে গাইতে প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির। কীর্তন শুনিয়ে দু'একজন যাত্রীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে ওঁরা সতীশ সরকারের কাছে এসেই খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করে দিলেন।

—আঃ! কীর্তন-টির্তন বন্ধ করো। আমি ভিক্ষে দিই না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সতীশ সরকার এই কথা বলে ডান হাত নেড়ে চলে যেতে বলেন।

—বাবু, এমন দিনেও একটা পয়সা ভিক্ষে দেবেন না?

সতীশ সরকার অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, বলছি চলে যাও।

ব্যস! এক পলকের মধ্যে দু'টি বৈষ্ণবের হাতে দুটি পিস্তল একসঙ্গে পরপর কয়েক বার গর্জে উঠল!

গুলির আওয়াজ শুনে রেলের বাবুরা যখন প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হলেন, তখন শুধু সতীশ দারোগার মৃতদেহ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলেন না। হীরেন বেরা ও নগেন সামন্ত পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সে অন্য মামলায়।

এই বেইমান সর্বজনঘৃণ্য সতীশ দারোগার একমাত্র পুত্র যতীন সরকার।

বন্ধুর বউ-এর কথাবার্তা শুনলে এইসব ও আরো কত কি মনে পড়ে বৃদ্ধ অমূল্যচরণের।

ওঁরা তিন ভাই ছিলেন কিন্তু ছোট ভাই খুব অল্প বয়সেই মারা যান। বড় ভাই প্রফুল্লচরণের একমাত্র সন্তান এই বঙ্কু। অমূল্যচরণের দুই মেয়ে কিন্তু কোনো ছেলে নেই বলে বঙ্কুকেই নিজের পুত্রতুল্য স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করেছেন। বঙ্কুর যত দোষই থাক, মেজকাকা বা কাকিমাকে কোনোদিনই কোনো অপমানজনক ব্যবহার করে না এবং করবেও না। কিন্তু বেচারীর কোনো ব্যক্তিত্ব নেই বলে স্ত্রীর কথায় ওঠে-বসে। উমারানী মেজকাকাকে যত অপমানই করুক, তাকে একটি কথা বলারও সাহস নেই বঙ্কুর।

তবে অমূল্যচরণের স্ত্রী উমারানীর বেয়াদপি একদম বরদাস্ত করেন না। উনি স্পষ্ট বলে দেন, বৌমা, ভুলে যেও না বঙ্কু শুধু তোমার স্বামী না, সে আমাদেরও ছেলে। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়, তাও কি বাবা-মা শেখাননি?

উমারানীও যুদ্ধ না করে পরাজয় বরণ করার পাত্রী না। উনি রান্না করতে করতেই জবাব দেন, ভুলে যাবেন না আমি উলুবেড়ে লাটবাড়ির মেয়ে। আপনাদের মতো জংলিদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তা সত্যি শিখিনি।

—বৌমা, আর হাসিও না। এমন বিখ্যাত বাড়িরই মেয়ে তুমি যে ঘেন্নায় কোনো আত্মীয়-স্বজন বঙ্কুর বিয়েতে বরযাত্রী গেলেন না।

—তাতে আমাদের বয়েই গেছে।

—এত অহঙ্কার বা মেজাজ কোনোটাই যে ভাল না, তা কি এখনও বুঝতে পারছো না? বাপ আর মেয়েতে মিলে এই সোনার সংসারটা ছারখার করে দিলে!

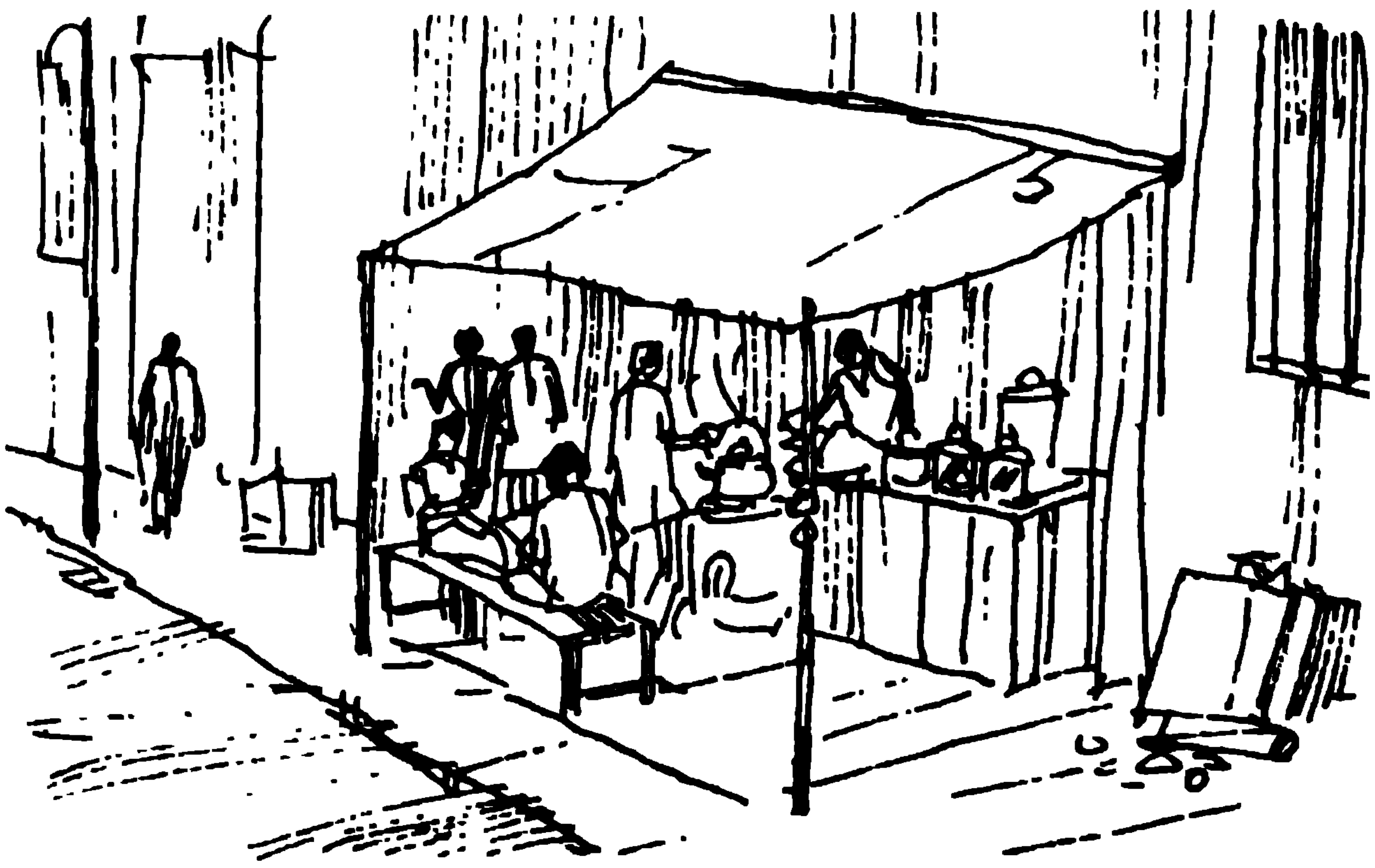

একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দর চায়ের দোকানে এক দল ছেলেছোকরার আড্ডা জমে উঠেছে। হঠাৎ নন্দু দোকানে ঢুকতেই পটল জিজ্ঞেস করল, কিরে চাঁদু,কাল সন্ধেবেলায় কোথায় ডুব দিয়েছিলি?

ঘোড়ায় চড়ার মতো বেঞ্চির দু'পাশে পা দিয়ে বসে নন্দু ভুরু নাচিয়ে বলল, মাইরি, রেখা আমাকে পাগল করে দেবে। আর অমিতাভ শালা কি অ্যাকটিংই করেছে মাইরি!

কচি মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, ম্যাটিনি দেখে কী তোরা ইডেন গার্ডেনে আড্ডা দিলি?

—তোরা মানে? নন্দুও একটু মুখ টিপে হেসে বলল, তাছাড়া ম্যাটিনিতে গিয়েছি তোকে কে বলল?

—তুই বেড়াস ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। কচি একটু থেমে বলল, পৌনে দুটোর সময় ল্যান্সডাউন মার্কেটের ওখানে তোর কারেন্ট হিরোইনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই....

পটল হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ক্যাচ্-কট্-কট্! মুকুন্দদা, নন্দুর অ্যাকাউন্টে তিনটে ডবল ওমলেট আর তিনটে ডবল-হাফ চা!

—ডবল ডিমের ওমলেট না চিকেন কাটলেট খাওয়াবো! মুকুন্দদা, তিনটে ডবল-হাফ চা দাও!

মুকুন্দ এক মিনিটের মধ্যে তিনটে চা ওদের সামনে দিয়ে বলে, আচ্ছা, তোরা কি এইভাবে চ্যাংড়ামি ফাজলামি করেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারবি?

পটল দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, জয় মা পাতালরেল!

মুকুন্দ ওর কাণ্ড দেখে একটু না হেসে পারে না।

কচি বলল, দ্যাখো মুকুন্দদা, তুমি আর ভবানীপুর থানার লোকজন আমাদের রিয়েল ফ্রেন্ড! তোমাকে খোলাখুলি বলছি, যতদিন পাতালরেলের পুরোটা পাতালে চালু না হবে আর চন্দনদা আছে, ততদিন...:

—ওরে, চোরের দশ দিন, গেরস্থর একদিন! সেদিন কি করবি?

নন্দু চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, রামকেষ্ট-বিবেকানন্দ যা পারেনি, আমরা তাই পেরেছি। হোল বাঙালি জাতিটা ধম্মোকে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু এই আমরাই আবার বাঙালির ধম্মো ভাব জাগিয়ে তুলেছি।

পটল বলল, ঠিক বলেছিস! ও মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে বলে, আগে বাঙালি দুর্গাপূজা আর কালীপূজা ছাড়া কোন পূজা করতো?

সঙ্গে সঙ্গে কচি বলল, আর স্কুল- কলেজে সরস্বতী পূজা!

নন্দু একটু গম্ভীর হয়ে বলে, গুপ্তপ্রেস পাঁজিতে যত রকমের পূজার কথা আছে, সব রকম পূজা হচ্ছে শুধু আমাদেরই জন্য। এবার নন্দু একটু হেসে বলে, তুমি তো ভাল করেই জানো মুকুন্দদা, শনিঠাকুরের কৃপাতেই আমরা হেসেখেলে সপ্তাহের চার-পাঁচটে দিন কাটিয়ে দিতে পারি। আর শনিবার অমাবস্যা হলে তো পুরো মাসটাই ঠাকুরের কৃপায় কেটে যায়।

মুকুন্দ কাপ-ডিশ ধুতে ধুতেই বলে, তোদের কেলোর কীর্তি সব জানি। আমাকে আর

নতুন করে বলতে হবে না। একটু নিঃশ্বাস নিয়ে ও যেন আপন মনেই বলে, তোরা কোন সব ফ্যামিলির ছেলে আর কি করে জীবন কাটাচ্ছিস!

কচি দপ্ করে জ্বলে ওঠে, রেখে দাও ফ্যামিলির কথা! সব ফ্যামিলির কীর্তিই আমাদের জানা আছে।

দুই

দত্তদের বাড়িটা সত্যি সত্যি ভাঙা শুরু হয়েছে। প্রায় শ'খানেক কুলি-মজুর বিরাট হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙছে আর ইট-কাঠ-পাথর সাজিয়ে রাখছে। চার-পাঁচজন বাবু গোছের লোক ওদের কাজ-কর্ম তদারকী করছেন। কখনও কখনও মোটর হাঁকিয়ে এঞ্জিনিয়ার সাহেব মিঃ ঘোষ ঐসব বাবুদের কি সব বুঝিয়ে যাচ্ছেন। কোনোদিন বিকেলের দিকে দুধের মতো সাদা ধবধবে মোটর চড়ে স্বয়ং কিশোর আগরওয়াল এসে বেশ কিছুক্ষণ সময় এখানে কাটান। দু'পাঁচ দিন পরপর বৃদ্ধ কেশব আগরওয়ালও একবার চক্কর দিয়ে যান।

রোজ বিকেলের দিকে দু'তিনটে লরি এসে দত্ত বাড়ির ইট, দরজা-জানলা,কড়ি-বরগা আর পাথর নিয়ে চলে যায়। একদল মেয়ে-পুরুষ ছেলে-ছোকরা হাঁ করে এইসব দেখে। দেখে মুকুন্দর দোকানের খদ্দেররাও। পঞ্চু মিস্ত্রি চা খেতে খেতে বলে, জানিস মুকুন্দ, আমাদের পুব্বোপুরুষ বলাগড় ছেড়ে চলে আসে শুধ্যু এই দত্তবাবুদের বড়ির কাজে করার জন্যি।

মুকুন্দ অন্য খদ্দেরদের চা তৈরি করতে করতেই জিজ্ঞেস করে, দত্তবাবুদের আদি বাড়ি ছিল কাটোয়ায়, তাই না?

পঞ্চু মিস্ত্রি একটা ছোট্ট চ্যাপ্টা ওষুধের কৌটো থেকে বিড়ি বের করতে করতে একটু হেসে বলে, দত্তবাবুরা আসলে অগ্নোরদীপের লোক; ঐ কাটোয়ার পাশেই আর কি!

মুকুন্দও এই ভবানীপুরেরই ছেলে। এইখানেই ছিল ওর পূর্ব-পুরুষের বাস। গাঁজা পার্কের পাশের রাস্তায় যেখানে ব্রাহ্মরা উপাসনা করতেন, তার কাছেই ছিল বামনদাস ঘোষের বিরাট দোতলা বড়ি। ক্লাইভ স্ট্রিট-ক্যানিং স্ট্রিটের মোড়ের কাছেই ছিল বামনদাস ঘোষের লোহা-লক্কড়ের দোকান।

বামনদাস যেমন কর্মবীর ছিলেন, তেমনই ধার্মিক ও বিনয়ী ছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরেই গীতার এক অধ্যায় পাঠ না করে উনি জলগ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্মণদের কি ভক্তিই করতেন! ভ্যাবলা-বসিরহাটের রাজেন মুখুজ্যে ওঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং এঁরই অনুপ্রেরণায় বামনদাস গ্রাম ছেড়ে কলকাতা এসে চিৎপুরের একটা দোকানে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী হন। পরবর্তী জীবনে বামনদাস ওঁর ছেলেমেয়েদের বলতেন, ওরে, মার্টিন-বার্নের মালিক হয়েছে বলে এখন আমাদের ভ্যাবলার রাজেনকে নিয়ে সবাই নাচানাচি করে। শেরিফ আর স্যার উপাধি পাবার পর তো ইংরেজি খবরের কাগজেও ওর ছবি ছাপা হচ্ছে কিন্তু লোকে তো জানে না অভাবের জন্য ছেলেটাকে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ছেলেমেয়েরা এ গল্প বহুবার শুনেছে। আবার শুনতে ভালও লাগে না কিন্তু তবু চুপ করে বাবার কথা শোনে।

—রাজেন তখন ঠিকাদারী করে। একদিন আমাকে বলল, বামন, তোমাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে এবং তার জন্য অভিজ্ঞতা চাই। তাই তো আমি চিৎপুরের দত্ত কোম্পানির তিন টাকা মাইনের চাকরি নিলাম।

বামনদাস একবার বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, হাজার হোক বামুনের ঘরের ছেলের রাজেনের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

এই স্যার আর. এন. মুখার্জির উৎসাহে ও পরামর্শে বামনদাসও ব্যবসা-বাণিজ্য করে রীতিমত ধনী হন কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তঁরই ছোট নাতি মুকুন্দ এখন চায়ের দোকান চালিয়ে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছে। তা হোক। কিন্তু ও ছোটবেলায় কয়েকটা বছর বাড়িতে ম্যানেজারবাবু না দেখলেও বাজার সরকার দেখেছে, একটা লম্বা মোটরগাড়ি দেখেছে। বাড়িতে দুর্গাপূজা হবার কথাও একটু একটু মনে পড়ে। সে যাই হোক, মুকুন্দর স্পষ্ট মনে আছে, বাজার সরকার শ্রীহরিবাবু থেকে শুরু করে ঝি-চাকরদেরও বাড়ি ছিল বসিরহাটে। ভবানীপুরের লোকজন তো ওদের বাড়ির নামই দিয়েছিল বসিরহাটি ঘোষের বাড়ি। তাই পঞ্চু মিস্ত্রির কথা শুনে ও অবাক হয় না।

পঞ্চু বিড়ি ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বলে, ঠাকুমার কাছে শুনেছি, এই দত্তবাড়ি তৈরি হবার সময় এক কর্তা শুধু পছন্দমতো কাঠ কেনার জন্য জাহাজে চড়ে বার্মা মুল্লুকে চলে গিয়েছিলেন। আরেক কর্তা পাথর কেনার জন্য গেলেন উত্তর না পুবে।

ওর পিছন দিক থেকে কার্তিক বলে, তখনকার দিনের কর্তাদের ব্যাপারই ছিল আলাদা।

—সত্যিই তাই। পঞ্চু খুব জোরে বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বলে, ঐ ঠাকুমার কাছেই শুনেছি, দত্তবাড়ির বউরা দুগ্গাপূজার সময় রোজ এক একখানা নতুন বেনারসী পরতেন।

মুকুন্দ কথাটা শুনে আপনমনেই হাসে।

পঞ্চু একটু থেমে আবার বলে, তবে হ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলব না। দত্তবাড়ির কর্তাবাবুরা আমাদের মতো দেশের লোকজনকেও যথেষ্ট দেখাশুনো করতেন। ঐ বাড়ির খেয়েপরেই তো বাপ-ঠাকুদ্দার সংসার চলেছে।

দুপুরবেলার দিকে বুড়ি কামিনীবালা মুকুন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে নাতি, দত্তদের বাড়িটা নাকি ভাঙছে?

—হ্যাঁ, ঠাকুমা।

—ঐ বিনু হতচ্ছাড়াটা তো সত্যি কথা বলতে শেখেনি, তাই শুনে ভাবলাম তোকে জিজ্ঞেস করলে খাঁটি খবরটা জানা যাবে।

—হ্যাঁ ঠাকুমা ; ওরা পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ওখানে নতুন করে বড় বাড়ি তৈরি করবে।

কামিনীবালা অবাক হয়ে বলেন, অমন সুন্দর বাড়িটা ভাঙারই বা কী দরকার আবার নতুন করে তৈরিই বা করবি কেন?

মুকুন্দ বলে, ঠাকুমা, আজকাল তো ঐ ধরনের বাড়ি কেউ তৈরি করে না, নতুন ধরনের....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বুড়ী দু'হাতের দুটো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, আজকালকার লোকদের মুরোদ থাকলে তো ঐ ধরনের বাড়ি বানাবে!

মুকুন্দ একটু হেসে বুড়িকে সমর্থন জানায়।

—বুঝলি নাতি, ঠাকুরের কাছে শুনেছি, আমাদের এই বাড়ি আর দত্তদের বাড়ি একই বিলেত-ফেরত ইঞ্জিন-ইয়ার বানায়। এই দুই বাড়ির জানলা-দরজা কড়ি-বরগার কাঠ কেনার জন্য ঐ বাড়ির এক কর্তা জাহাজে করে বার্মা দেশে যান, আর পাথরটাথর কেনার জন্য এই বাড়ির এক জামাইকে বিলেতে পাঠানো হয়।

—দুই বাড়ির তো দারুণ ভাব ছিল!

বুড়ি চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, ভাব ছিল মানে — দারুণ ভাব। উনি একটু থেমে বলেন, ঠাকুরের কাছেই শুনেছি...

মুকুন্দ কথার মাঝখানেই কথা বলে, শুনেছি, আপনার-শ্বশুর এখানে থাকতেন না

—আমার বিয়ের দশ-বারো বছর আগেই ঠাকুরের স্ত্রীবিয়োগ হয়। কামিনীবালা এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু চাপা গলায় বলেন, উনি গলায় দড়ি দিয়ে মারা যান বুঝলি?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁরে, মনের দুঃখে উনি গলায় দড়ি দেন।

মুকুন্দ মুখে কিছু বলে না। শুধু ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কামিনীবালা মুখ নেড়ে চোখ বড় বড় করে বলেন, ঠাকুর কদাচিৎ কখনও কলকাতা আসতেন ; তা নয়ত সারা বছরই কাশীর বাঈজীকে মানে একটা মেয়েছেলে নিয়ে থাকতেন।

শুনে মুকুন্দ অবাক হয় না। ও মনে মনে বলে, তখন তো অনেক বাড়ির অনেক কর্তারই এই গুণ ছিল!

—শুধু কী তাই? ঠাকুর নেশা-টেশা করে এলেই স্ত্রীকে নাকি খুব মারধর করতেন বুড়ি কোনোমতে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, এই গোলাপী বাড়ির কোনো পুরুষ তো আমার কর্তার চাইতে বেশি আমোদ-আহ্লাদ করেনি কিন্তু যত নেশা করে যত রাত্তিরেই বাড়ি ফিরুন উনি আমার সঙ্গে কি অসম্ভব ভাল ব্যবহার করতেন, তা তোরা ভাবতে পারবি না।

মুকুন্দ খুব ভাল করেই জানে, বুড়ি যখন পুরনো দিনের কথা বলেন, তখন চট করে থামেন না। থামতে পারেন না। থামবেন কি করে? সেই পুরনো দিনের কিছু ধূসর স্মৃতি ছাড়া ওঁর আছে কী?

কামিনীবালা একটু থেমে মুখ-চোখ নেড়ে বলেন, মাথার উপর ঠাকুর আছেন মিথ্যে বলব না। আমরা বউরা যখন কাশী যেতাম, তখন ঠাকুর আমাদের জন্য কি না করতেন! পুত্রবধূদের উনি সত্যি নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করতেন।

—সব মানুষেরই কিছু গুণ তো থাকে। এতক্ষণ পর মুকুন্দ প্রথম কথা বলে।

—সে তো একশ'বার। বুড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেন, দত্তবাড়ির মেজ কর্তার কত দুর্নাম ছিল। তবে উনি এই বাড়ির ছোটকর্তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন — যাকে বলে হরিহর আত্মা.....

কথাটা শুনে মুকুন্দ একটু না হেসে পারে না।

—হাসছিস কিরে! এবার বুড়িও একটু হেসে বলেন, কখনও কখনও দু'জনে মিলে কি কাণ্ডটাই না করতেন! কিন্তু দু'জনেই কী উদার ছিলেন। ওঁদের কৃপায় অনেক ঝি চাকররাও এই কলকাতা শহরে বাড়ি-ঘর বানিয়ে নিয়েছে।

না, কামিনীবালা মিথ্যে বলেননি। তবে সে ঔদার্যের পিছনেও একটা কারণ ছিল। স্বার্থ ছিল। বিকৃত চিত্তবিনোদনের উপকরণ ছিল।

সে যাই হোক, বনবিহারী দত্ত কত শখ করে ভবানীপুরের বনেদী পাড়ায় যে ছোটোখাটো প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেই বাড়ি এখন ভাঙা হচ্ছে! নতুন মালিক এখানে নাকি আধুনিক ও আরো বড় বাড়ি তৈরি করবেন। সত্যি মানুষ ভাবে এক, হয় এক। এমন দিন যে কখনও আসবে, তা কে ভেবেছিলেন।

কেউ না। পরিবারের লোকজন তো দুরের কথা, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীদের সবাই বলাবলি করতেন, দামোদর দত্ত ও তাঁর পুত্র বনবিহারী দত্ত তাঁদের পারিবারিক যে ব্যবসা-বাণিজ্য ধন-সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন, তা দশ পুরুষেও শেষ করতে পারবে না। তবে কথায় যে বলে, মানুষই লক্ষ্মী, মানুষই ঝক্কি। এই একটা পরিবারে কত অঘটনই ঘটল!

অগ্রদ্বীপের দত্ত পরিবারের সৌভাগ্যের প্রথম বুনিয়াদ রচনা করেন-নীলমণি দত্ত। কোম্পানির আমলের শেষ অধ্যায়ে বন্ড সাহেবের উনি সরকারবাবু ছিলেন ; অর্থাৎ বন্ড সাহেবের সংসারের খানসামা, বাটলার, রাঁধুনি, ধোপা-নাপিত, ঝি-চাকর, দারোয়ান-কোচোয়ান, বেয়ারা, খিদমতগার থেকে মালি ভিস্তি পর্যন্ত সব কর্মচারীর সর্বময় অধিকর্তা ছিলেন। কোম্পানির আমলে অন্যান্য সাহেবদের মতো বন্ড সাহেবও ব্যবসা-বাণিজ্য জাল জুয়াচুরি করে দশ হাতে আয় করতেন। অন্য সাহেবদের মতো ইনিও মেমসাহেবকে এ দেশে আনেননি, মেমসাহেবও এই মশা-মাছি ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের দেশে আসতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাননি। তাই তো কোম্পানির অন্য সাহেবদের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বন্ড সাহেবও দেহ ও মনের দাবি মেটাবার জন্য দু'টি নেটিভ রক্ষিতা রেখেছিলেন। এই তিনটি সংসারের চেয়ার-টেবিল খাট-বিছানা থেকে শুরু করে শেরি-স্যাম্পেন-হুইস্কি মাছ-মাংস তরিতরকারি কেনার সব দায়িত্বই এই নীলমণির উপর ছিল। এবং প্রতিটি জিনিস কেনার জন্যই সরকারবাবু দোকানদারদের কাছ থেকে ভালরকম দস্তুরি পেতেন। এমন কি কোন ফেরিওয়ালা সাহেবের কুঠিতে ঢুকলেও ওর কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগ ঘটত। মাইনে আর কমিশন ছাড়াও চুরি-চামারি করে নীলমণি ভাল আয় করতেন।

কিন্তু বেচারা নীলমণি চিনির বলদের মতো সারাজীবন এই দস্তুরি আর চুরি চামারির

নেশায় এমনই মশগুল ছিলেন যে উপভোগ করার সুযোগ ও মন দুটোই হারিয়ে ফেলেন। নীলমণি দত্ত'র চোদ্দটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন দামোদর এবং ইনি একদিন ভাগ্যের সন্ধানে হাজারখানেক ভরি সোনা নিয়ে কলকাতা চলে আসেন।

দামোদর যেমন কর্মবীর তেমনই বুদ্ধিমান ছিলেন। উনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। তাই তো উনি কিছুকাল কলকাতার বাজারে ঘোরাঘুরি পর একদিন সমস্ত সোনা বিক্রি করে থলিভর্তি টাকা নিয়ে সাসেক্স এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির বড় সাহেবের কাছে হাজির হয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, স্যার, আমি আপনার কোম্পানির মালপত্র বিক্রি করতে চাই।

সাহেব ওঁকে প্রশ্ন করলেন, টুমি বিজনেস করতা হ্যায়?

—নো সাহেব, নো। দিস মানি স্টার্ট বিজনেস।

—বাট....

দামোদর সোজাসুজি বললেন, স্যার নো বাট। আই গুড ম্যান, ইউ মাই গড।

সাহেব একবার ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু ভাবেন। তারপর একটু হেসে বললেন, অল রাইট ডামোডর, ইউ স্টার্ট বিজনেস, হাম মদত কোরবে।

সেই শুরু! দামোদর তাঁর নিষ্ঠা, সততা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা এক বিরাট সম্ভাবনার ভিত্তি রচনা করেন। দামোদরের এগারটি সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনটি পুত্র ছিল। এবং এই তিনটির মধ্যে একটি পুত্র কৈশোরেই মারা যায়। নিজের সংসারে দায়-দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ইনি বিডন স্ট্রিটের সাড়ে তিন কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। শুধু তাই নয়। অগ্রদ্বীপেও বিরাট পাকাবাড়ি তৈরি করে দেন। উনি যে পূজামণ্ডপ তৈরি করেন, সেখানেই পরবর্তীকালে পোস্ট অফিস হয়। পোস্ট অফিস নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পর এই পূজামণ্ডপকে গুদাম হিসেবে ভাড়া দেওয়া শুরু হয়।

দুঃখের বিষয়, দামোদরের মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যেই তাঁর দুই ছেলের বিবাদ চরমে ওঠে। বিশিষ্ট উকিল ও প্রতিবেশী অমৃতবাবুর মধ্যস্থতায় সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়। এই ভাগাভাগির ফলে বনবিহারী পান ক্লাইভ স্ট্রিটের ব্যবসা আর মাত্র পনের হাজার টাকা। বাকি সব-স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পান তাঁর ভাই রাসবিহারী।

বনবিহারীও তাঁর বাবার মতোই সৎ, নিষ্ঠাবান ও সর্বোপরি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। বড় বড় কোম্পানির সাহেবরা সত্যি ওঁকে খুব পছন্দ করতেন।

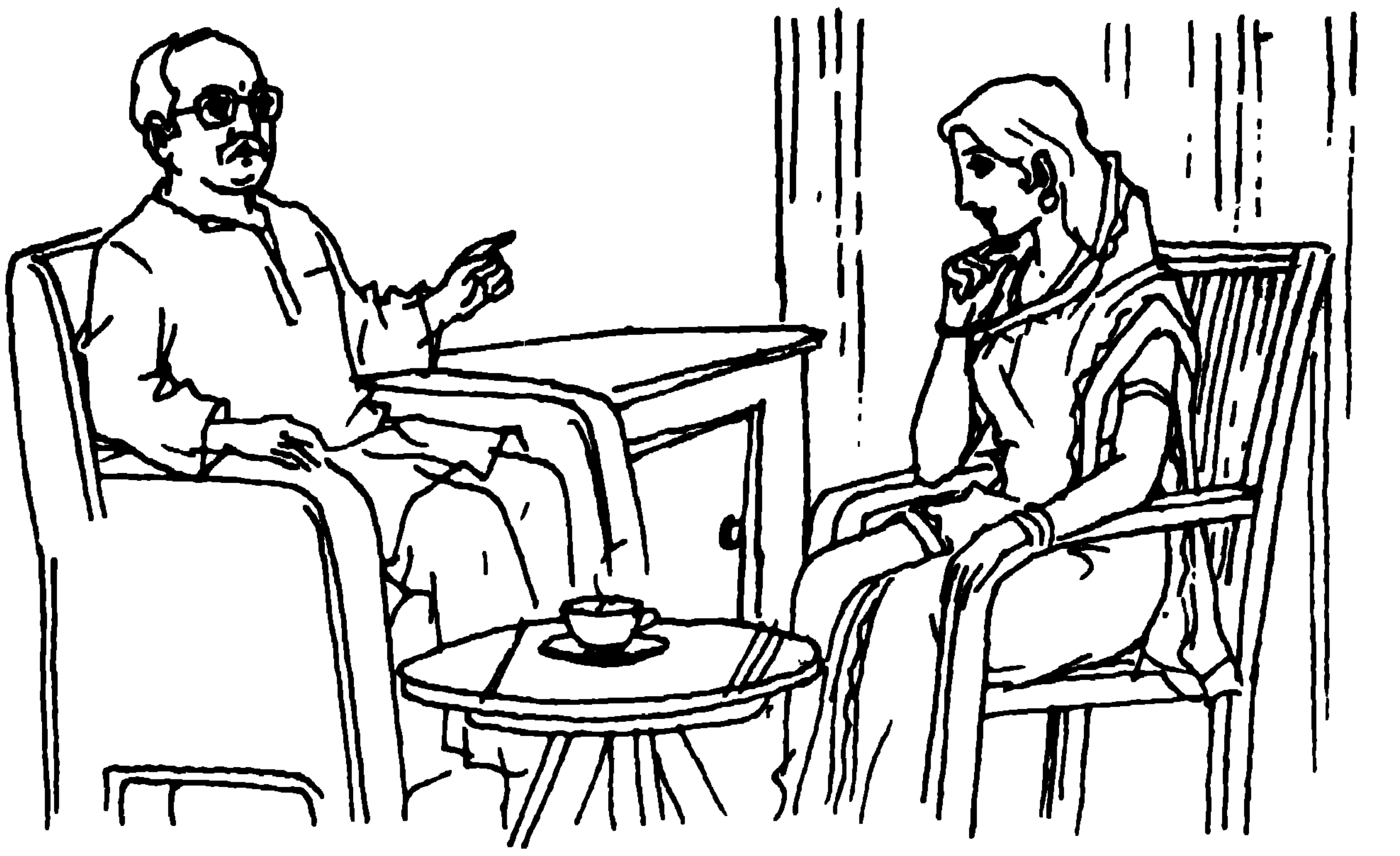

স্বামী ও ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যাবার পরও কণিকা দেবীকে সংসারের টুকাটাকি কাজে ঘণ্টাখানেক ব্যস্ত থাকতে হয়। অঘোরনাথ হঠাৎ ভিতর এসে বলেন, কী ছোট মা, তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে না?

—হ্যাঁ ছোটকাকা, এখনি খাবো ; আপনি বসুন। কণিকা এবার রান্নাঘরের দিকে মুখ করে বললেন, সরলা আমাকে খেতে দাও।

অঘোর বাঁড়ুজ্যে অত্যন্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। পৌনে আটটা থেকে আটটার মধ্যে উনি ব্রেকফাস্ট খান। ব্রেকফাস্ট মানে অবশ্য এক গেলাস দুধ আর একটা শশা। শশা না পাওয়া গেলে অন্য কোনো ফল। তবে অন্য কিছু নয়। কখনই নয়।

অঘোরনাথের দীর্ঘ কর্মজীবন কেটেছে বাংলার বাইরে। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস'এর কৃপায় উনি ঘুরছেন পেশোয়ার থেকে এলাহাবাদের মধ্যবর্তী এলাকায়। পেশোয়ার, আম্বালা, মীরাট, দিল্লি প্রভৃতি শহরে। এরই মধ্যেই কয়েক বছর কাটিয়েছেন পুনা আর বোম্বেতে। উনি বাংলাদেশের বাঙালিদের মতো শুধু অসুখ বিসুখ হলেই ফল খান না। উত্তর ভারতের লোকজনদের মতো প্রতিদিন ওঁর ফল খাওয়া চাই-ই। নীতীশ জানেন, ছোটকাকা ফল খেতে ভালবাসেন ; তাই উনি অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায় নিয়মিত কিছু ফল কিনে আনেন। তবে অঘোরনাথের পাল্লায় পড়ে এখন এ বাড়ির সবাইকে রোজ একটু-আধটু ফল খেতে হয়। নীতীশ অফিস বেরুবার আগেই উনি কণিকা দেবীকে বলেন, ছোট, মা নীতুর ব্রিফকেসে একটা আপেল দিয়েছ?

—হ্যাঁ ছোটকাকা, দিয়েছি।

—নীতু, বাবা আপেলটা খেতে ভুলে যাস না।

—না, না ভুলব না ছোটকাকা।

কণিকা একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলেন,

জানেন ছোটকাকা, ও মাঝে মাঝেই ফল খেতে ভুলে যায়।

—কদাচিৎ কখনও ভুলে...

না, নীতীশকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অঘোরনাথ বলেন, না বাবা, ভুলে যাস না। রোজ একটু আধটু ফল খেলে দেখবি, অসুখ-বিসুখ হবে না।

অবশ্য নীতীশের ছেলেমেয়ে-সন্দীপন আর শর্বরীর মাথায় ওদের ছোটদাদু ঢুকিয়েছেন, ফল খেলে চেহারা সুন্দর হয়। ফল আর দুধ খাওয়ার জন্যই তো মুনি-ঋষিদের দেখতে এত সুন্দর ছিল। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা বয়স আসে যখন সে সুন্দর হতে চায়, আরো সুন্দর হতে চায়। এ বাড়িতে একমাত্র কণিকাই ফল খেতে পছন্দ করেন না কিন্তু অঘোরনাথের পাল্লায় পড়ে তাঁরও মুক্তি নেই।

কণিকার ব্রেকফাস্টের সময় অঘোরনাথ রোজ ওঁর পাশে বসবেন এবং কিছু ফল ওঁকে খেতেই হবে। শর্বরী বাড়ি থাকলে ও মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, জানো দাদু, তুমি সামনে না থাকলে মা কোনো ফল মুখে দেয় না।

কণিকা হাসিমুখেই মেয়েকে বকুনি দেন, তুই চুপ কর বাঁদর মেয়ে! এবার উনি গম্ভীর হয়ে বলেন, তোর দাদুকেই জিজ্ঞেস কর, আমি ওঁর কোনো কথা অমান্য করি কি না।

অঘোরনাথ দু'জনের দিকে একবার তকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, আমি কার দলে যাই? একদিকে আমার মা, অন্যদিকে আমার চিরজীবনের জীবনসঙ্গিনী!

সে যাই হোক, কণিকার ব্রেকফাস্ট করার সময় অঘোরনাথ রোজ এক কাপ কফি খান এবং দু'জনে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেন। নানা বিষয়ে ওঁদের কথাবার্তা হয়! অঘোরনাথের ছেলেবেলায় গল্প, কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, নীতীশের ছাত্রজীবনের কাহিনী। আরো কত কি! কখনও কখনও সন্দীপন আর শর্বরীকে নিয়েই ওঁদের কত আলোচনা হয়।

আজ ডাইনিং টেবিলে বসেই অঘোরনাথ বললেন, জানো ছোট মা, দত্তদের বাড়িটা ভাঙছে দেখে মনে মনে খুশিই হচ্ছি।

—খুশি! কণিকা অবাক হয়ে বলেন।

—দেখ ছোট মা, এ সংসারের সবকিছুরই কারণ থাকে। মানুষের উন্নতিরও যেমন কারণ থাকে, অবনতিরও কারণ থাকে।

এবার কণিকা মাথা নেড়ে বলেন, সে তো বটেই!

—বনবিহারী দত্ত আমার জন্মের বহু আগেই এই বাড়ি তৈরি করেন। শুনেছিলাম, সরকারদের বাড়ি আর এঁদের বাড়ি একই এঞ্জিনিয়ার তৈরি করেন। আমি ছোটবেলায় বনবিহারী দত্তকে বেশ বৃদ্ধই দেখেছি কিন্তু ঐ বয়সেও উনি যা পরিশ্রম করতেন তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ছোট কাকার গল্প শুনতে কণিকার ভালই লাগে। কত কি জানা যায়! তাছাড়া বৃদ্ধ

হলেও বেশ আধুনিক মনের মানুষ।

অঘোরনাথ বলে যান, ঐ বৃদ্ধের মধ্যে একটা সাধনা ছিল, প্রতিজ্ঞা ছিল। ক্লাইভ স্ট্রিটের একটা ছোট্ট দোকান থেকে উনি কি বিরাট ব্যবসা গড়ে তোলেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

—উনি নাকি লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না? এতক্ষণ পর কণিকা প্রশ্ন করেন।

—আগে উনি সত্যি বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না। এমন কি ইংরেজিতে নিজের নাম পর্যন্ত সই করতে পারতেন না কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য একটু গুছিয়ে নেবার পর উনি ছোটদাদুর কাছে পড়াশুনা শুরু করেন।

দু'জনেই কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দেন। কণিকা জানতে চান, পড়াশুনা শুরু করেন মানে?

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, সে এক মজার ঘটনা। ছোটদাদুই একদিন ওঁকে বলেন, বনবিহারী, ব্যবসা-বণিজ্য তো ভালই করছ কিন্তু একটু লেখাপড়া না শিখলে যে বেশি উন্নতি করতে পারবে না।

কণিকা আবার একটু জিজ্ঞেস করেন, শুনেছি, ওঁর নাকি বাতিক ছিল সবাইকে লেখাপড়া শেখানো?

—বাতিক মানে? প্রচণ্ড বাতিক।

—আপনাদের এক বুড়ো চাকরকেও নাকি উনি নিজে পড়িয়ে গ্র্যাজুয়েট...

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, না, না, তুমি একটু ভুল শুনেছ। রামদুলাল বলে আমাদের বাড়ির এক চাকরকে ছোট দাদু নিজে পড়িয়ে ম্যাট্রিক পাস করান। তারপর ওকে ইউনিভারসিটিতে একটা চাকরি দেবার জন্য ছোটদাদু স্যার আশুতোষকে ধরেন।

উনি এক নিঃশ্বাসে বলে যান, স্যার আশুতোষ ওকে চাকরি দিয়েছিলেন এই শর্তে যে ও গ্র্যাজুয়েট হবে।...

—রামদুলাল কি শেষ পর্যন্ত গ্র্যাজুয়েট হন?

—রামদুলাল বোধহয় একবারেই ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কিন্তু একবার বা দু'বার ফেল করার পর বি. এ. পাস করে।

—বনবিহারী দত্তকেও উনি ম্যাট্রিক বা...

কণিকাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, না, না, উনি ম্যাট্রিকও পাস করেননি, গ্র্যাজুয়েটও হননি ; তবে উনি রোজ সকালে ছোটদাদুর কাছে পড়তে আসতেন।...

—তখন ওঁর কত বয়স?

—হবে চল্লিশ-পঞ্চাশ।

—আচ্ছা!

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, উনি শেষ পর্যন্ত এত ভাল ইংরেজি শিখেছিলেন

যে বড় বড় সাহেবরাও অবাক হয়ে যেতেন। শেক্সপিয়র-মিলটন-বায়রন তো ওঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

—বলেন কী?

—বলছি তো ছোট মা, ওঁর মধ্যে একটা নিষ্ঠা ছিল, সততা ছিল, যা ওকে বড় করেছিল। অঘোরনাথ একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, শুধু বদমাইশি আর চালিয়াতি করে ওঁর নাতি-নাতনীরা সব ধ্বংস করে দিল।

—ওঁর ছেলেমেয়েরা ব্যবসা নষ্ট করেননি?

—না, না, ওঁর ছেলেরা কিছু নষ্ট করেননি ; ওঁর নাতি-নাতিরাই সব উড়িয়ে দিল।

—তবে যে শুনি, বনবিহারী দত্ত'র এক ছেলে বাঈজী-বাড়িতেই পড়ে থাকতেন!

অঘোরনাথ একটু মুচকি হেসে বলেন, শ্মশানে যাঁরা পড়ে থাকেন, নেশা করেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজন তো তান্ত্রিকও থাকতে পারেন।

—সে তো একশ'বার।

—বনবিহারী দত্ত'র ছোট ছেলে শুধু বাঈজীবাড়ি যেতেন না, বাড়িতেও বাঈজী নিয়ে আসতেন ; তবে তিনি চরিত্রহীন ছিলেন না। গান-বাজনার জন্যই বাঈজী বাড়ি যেতেন, গান-বাজনা শোনার জন্যই তাঁদের মজলিশ বসতো এই দত্তবাড়ির ছাদে।

উনি একটু থেমে বলেন, তবে বনবিহারী দত্ত'র ছেলেরা ইন্টারেস্টিং মানুষ ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের পক্ষে যত সর্বনাশেরই হোক, বনবিহারী দত্ত এই যুদ্ধের কৃপায় রাজা হয়ে যান। শুধু অর্থই না, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য বড় বড় ইংরেজ আমলাদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। বনবিহারী সম্রাটের যুদ্ধ তহবিলেও মোটা টাকা দান

করেছিলেন বলে স্বয়ং লাটসাহেব ওঁকে ধন্যবাদ জানান। পরের বছরই উনি রায়বাহাদুর খেতাব পান।

এই রায়বাহাদুর খেতাব পাবার পরই উনি একটু বদলে যান। ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে নতুন মোটরগাড়ি কিনলেন। ছেলেদের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার দিয়ে নিজে সাহেব-সুবাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন। শুধু তাই নয়। দেশি পোশাক ছেড়ে সাহেবি পোশাক ধরলেন। তবে হ্যাঁ, ছেলেরা কে কী করছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কোথায় কী হচ্ছে, তার উপর ষোল আনা নজর রাখতেন রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্ত।

বনবিহারী পাঁচটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে ছিল। এ ছাড়া তিনটি সন্তান শৈশবেই মারা যায়। পাঁচটি মেয়ের ও তিনটি ছেলের বিয়ে আগেই দিয়েছিলেন। রায়বাহাদুর খেতাব পাবার পর চতুর্থ পুত্রের বিয়ে দেন। সে এক এলাহি ব্যাপার! বিয়ের এক মাস আগে ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের সব চাইতে দামী রং দিয়ে পুরো বাড়ি নতুন করে রং করা হলো। পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছাড়াও কলকাতা শহরের প্রত্যেকটি গণ্যমান্যবরেণ্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করলেন রায়বাহাদুর। তারপর বিয়ের ক'দিন আগে রটে গেল, স্বয়ং লাটসাহেব আসবেন বৌভাতের নেমন্তন্ন খেতে। পরের দিন থেকেই পুলিশ আর কর্পোরেশনের বড়কর্তাদের আসা-যাওয়া শুরু হলো। লাটসাহেবের সম্মানে ভবানীপুরের সুন্দর রাস্তাগুলোকে আরো সুন্দর ঝকঝকে করে তুলল কর্পোরেশনের লোকজন। লাটসাহেবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কোচবিহার-কাশিমবাজার-নাটোর-দীঘাপতি প্রভৃতির রাজারাও ঠিক করলেন, রাযবাহাদুরের পুত্রের বৌভাতে উপস্থিত থাকবেন।

হ্যাঁ, সেই উৎসবের দিনে ওঁরা সবাই রায়বাহদুরের বাড়িতে এসেছিলেন।

ঐ উৎসবের বাড়িতেই লাটসাহেব এ কথা-সে কথার পর বনবিহারী দত্তকে বললেন, বাই দ্য ওয়ে রয় বাহাদুর, আপনি তো তিন জেনারেসন ধরে বহু বিখ্যাত ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মেসিনারি বিক্রি করছেন আর এখানে নিজেও অনেক জিনিস তৈরি করছেন।

—আপনার আশীর্বাদে ইয়েস ইওর একসেলেনসি!

—আজ গভর্নমেন্ট হাউসে একটা মিটিং-এ ঠিক হয়েছে আমরা অল ওভার বেঙ্গল কয়েকটা ব্রিজ তৈরি করব।

—ইওর একসেলেনসি, ভেরি গুড ডিসিসন।

লাটসাহেব একটু মাথা দুলিয়ে বললেন, সো আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং আপনার মত এক্সপিরিয়েন্সড ফার্ম যদি দু'চারটে ব্রিজ তৈরি করে তাহলে তো ভালই হয়। হিজ একসেলেনসি এক মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলেন, সো-কল্ড কন্ট্রাকটরকে দিয়ে আমি এই ব্রিজ তৈরি করাতে চাই না।

সকৃতজ্ঞ রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্ত একগাল হাসি হেসে সবিনয়ে নিবেদন করলেন,

হিজ একসেলেনসি দয়া করে যে দায়িত্ব দেবেন, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব।

বনবিহারী দত্ত রায়বাহাদুর খেতাব পাবার পর সাহেবি পোশাক পরে মোটরগাড়ি চড়ে সাহেব-সুবা রাজা-মহারাজাদের পার্টিতে যেতেন বলে কত লোক হাসাহাসি করেছে। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে অনেকেই বলাবলি করতেন, এবার চালিয়াতি করেই বনবিহারী দত্ত সব উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ওঁরা জানতেন না, বনবিহারী দত্ত'র রক্তের মধ্যে ব্যবসা ছিল। উনি শয়নে-স্বপনেও শুধু ব্যবসার কথাই ভাবতেন।

উনি মারা যাবার পর ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তির খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ওঁর সম্পর্কে নানা কাহিনী সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ বলতেন, উনি ফুলশয্যার রাত্তিরে স্ত্রীকে নিয়ে শুতে যাবার আগে বিয়ে-বৌভাতের খরচপত্তর হিসেব করতে বসেছিলেন।

এ কাহিনীর সত্যাসত্য কেউ সঠিকভাবে বলতে না পারলেও একথা সর্বজনবিদিত ছিল যে হিসেব নিকেশ না করে বোধহয় বনবিহারী দত্ত হাঁচি-কাশিও দিতেন না।

একবার নাকি ওঁর স্ত্রী মানদাসুন্দরী স্বামীর কাছে আর্জি পেশ করেছিলেন, ভগবান তো আপনাকে এত দিচ্ছেন, বাড়িতে একটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করুন না।

বনবিহারী বুঝি জবাব দিয়েছিলেন, গিন্নি, বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলে আমার শুধু খরচই বাড়বে, কোনো আয় হবে না। তার চাইতে দুর্গাপূজা করো। এমন দু'পাঁচশ লোককে নেমন্তন্ন করা যাবে, যাঁরা আমার ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেও সাহায্য করবেন।

—আপনি জানেন না, আমাদের চোদ্দপুরুষ রাধাকৃষ্ণের চরণাশ্রিত? মানদাসুন্দরী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমি কি শক্তিপূজা কবার কথা বলতে পারি?

সরকারবাড়ির বড় গিন্নিমা কুসুমকুমারী দাসী ছিলেন মানদাসুন্দরীর সই। খুব ভাব ছিল দু'জনের। রোজ একবার করে দু'জনের দেখা না হলে রাত্তিরে কারুরই ঘুম আসতো না। সে সময় একবার নাকি দু'তিনটে খারাপ গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে সারা বাংলাদেশে প্রবল বন্যা হয়েছিল। সাহেব-মেমসাহেবরা পর্যন্ত চৌরঙ্গিতে নৌকো চড়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশেষ করে একদিন এমন দুর্যোগ দেখা দিল যে সেদিন দত্তবাড়ি থেকে সরকারবাড়ি যাওয়া অসম্ভব অকল্পনীয়। মাঝরাত্তিরে মানদাসুন্দরী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বড় ছেলের কাছে এসে বললেন, বড়, আজ সারাদিনে একবারও তোমার সইমার মুখ দেখতে পাইনি বাবা। তুমি যেভাবেই পারো আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে চলো।

মানদাসুন্দরীর মৃত্যুর বহু বছর পর কুসুমকুমারী নাতি-নাতনীদের কাছে সে রাত্তিরের গল্প করতে করতে একগাল হাসি হেসে বলেন, জানিস সে রাত্তিরে সই কীভাবে আমার কাছে এসেছিল?

—কীভাবে?

সরকারবাড়ির বড় গিন্নি হাসতে হাসতে বলেন, দত্তবাড়ির পশ্চিমী দারোয়ানদের ঘর থেকে একটা চৌকি বার করে তার উপর সইকে বসিয়ে ছাতি নিয়ে ওর ছেলে পাশে বসেছিল। তারপর চারজন পশ্চিমী লোক সে চৌকি মাথায় করে নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে।

—বলো কী ঠাকুমা?

—ওরে হ্যাঁ, ঐভাবেই ও এসেছিল। আমাকে না দেখলে কি ওর ঘুম হতো? নাকি না দেখে আমি ঘুমুতে পারতাম? কুসুমকুমারী লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, শুধু সই' এর জন্যই তো আমি মরতে পারিনি।

নাতি-নাতনীদের মধ্যে কে একজন বলল, তার মানে?

না, কুসুমকুমারী ওদের কিছু বলেননি। বলতে পারেননি। হাজার হোক স্বামীর নিন্দা কি করা যায়? কথায় বলে, পতি দেবতা। স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ ভগবান! তার নিন্দা করলে জিভ খসে পড়বে না! উনি কোনোদিন কাউকেই কিছু বলেননি। পতিদেবতার নিন্দা নয়, নিজের মনের দুঃখের কথা উনি শুধু সইকেই বলতেন। না বলে থাকতে পারেননি। মানুষ তার সুখ-দুঃখের কথা কাউকে না কাউকেই বলবেই। না বলে থাকতে পারে না।

—জানিস সই, দুঃখের কথা তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব? ফিসফিস করে কুসুমকুমারী বলেন, কর্তা কাশীতে যে বাঈজীকে নিয়ে থাকেন, সে আসলে আমার বড় বউয়ের বড় বোন।

—সেকি সই? মানদাসুন্দরী চমকে ওঠেন।

—তবে আর বলছি কী সই? কুসুমসুন্দরী একবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমি আর কর্তা গিয়েছিলাম শ্রীরামপুরে বড়ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে। মেয়েটির রূপ-গুণের কথা অনেক দিন ধরেই আমরা শুনেছিলাম কিন্তু মেয়েটিকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে আমরা একেবারে থ!

—কেন?

—ওর যে রূপ-গুণের কথা শুনেছিলাম, তার চাইতে হাজার গুণ ভাল ওকে দেখতে। গুণের কথা আর কী বলব সই?

মানদাসুন্দরী চোখ বড় বড় করে বলেন, ও এত সুন্দরী?

—হ্যাঁ সই। লক্ষ্মী-সরস্বতী তো দূরের কথা, স্বয়ং মা দুর্গাও ওর রূপের কাছে হার মানবেন। কুসুমকুমারী ঠোঁট উল্টে বলেন, আর কি গড়ন ভাই! সারা অঙ্গ দিয়ে মধু ঝরছে।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? ওকে দেখে তো কর্তার মাথা ঘুরে গেল।

—ইস! কী কেলেঙ্কারি!

কুসুমকুমারী সইয়ের মুখে পান দিয়ে নিজেও একটা পান মুখে নেন। তারপর দোক্তা মুখে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলেন, অত রূপ-গুণ থাকলে কী হয়, শুধু অভাবের জন্য মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছিল না ওর বাপ!

—তাই নাকি?

—গরিব না হলে কি ওর বাপ কর্তার খপ্পরে পড়তো?

—তা ঠিক। মানদাসুন্দরী একবার পানের পিক ফেলে একটু মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, তারপর কর্তা কী করে মেয়েটিকে হাত করলেন?

—কর্তা ওর বাপকে বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না। আপনার এ মেয়ের সঙ্গে আমি ডেপুটির বিয়ে দেব ; তবে থাকে পশ্চিমে। হয়তো মেয়েকে ওখানে নিয়ে গিয়েই বিয়ে দিতে হবে কিন্তু তার জন্য ঘাবড়াবেন না। আমি বিয়ের সব খরচপত্তর দেব। আর আপনার দ্বিতীয়া কন্যাকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। তার জন্যও আপনাকে এক পয়সা ব্যয় করতে হবে না।

মানদাসুন্দরী অতি দুঃখেও একটু না হেসে পারেন না। জিজ্ঞেস করেন, তারপর কর্তা কী করে মেয়েটিকে হাত করলেন?

কুসুমকুমারী একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, আগে নিজের ছেলের বিয়ের দিন-টিন স্থির করে আশীর্বাদপর্ব চুকিয়ে ওর বাপের হাতে কয়েক হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে একদিন ঐ বড় মেয়েটাকে নিয়ে পশ্চিমে রওনা হলেন পাত্রপক্ষকে দেখাবার কথা বলে।

—তারপর?

আর তারপর! কর্তা একা ফিরে এসে বললেন, মেয়েটিকে ওদের এতই পছন্দ হলো যে তিন দিনের মধ্যে গোধূলি লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, ওরা আপনাদের জন্য প্রণামী পাঠিয়েছে।

এইবার মানদাসুন্দরী একটু ম্লান হেসে হাসি হেসে বলেন, এই বলে বুঝি ওই গরিব লোকটার হাতে আরো কিছু তুলে দিলেন?

—তবে কী?

—মেয়েটি তারপর আর বাপের বাড়ি আসেননি?

কুসুমকুমারী এবার একটু জোরেই হাসেন। বলেন, কর্তার কথা আর বলো না। এই ঘটনার মাসখানেক পরই ওদের বাড়িতে একটা তার এলো, হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে মেয়েটি হঠাৎ ডুবে মারা গেছে। ব্যস! আর কী চাই?

সারা ভবানীপুর পাড়ার কেউ বনবিহারী দত্ত'র ছেলেদের নাম জানতেন না। জানার দরকারও হতো না। দুনিয়ার সবাই ওঁদের জানতেন দত্তবাড়ির বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু, ন'বাবু ও ছোটবাবু বলে। এমন কি বাড়ির বউ-ঝিরাও ঐ বলেই কথাবার্তা বলতেন। অপরিচিতদের কানে খটকা লাগতো। অনেকে ঠাট্টা করে বলাবলি করতেন, ও বাড়ির বউ-ঝিরাও বোধহয় বনবিহারী দত্ত'র কোনো না কোনো কোম্পানির কর্মচারী। পাড়ার দু'চারজন রসিক লোক পিতৃভক্ত এই পাঁচ ভাইকে পঞ্চপাণ্ডব বলে উল্লেখ করতেন। এই পিতৃভক্ত পুত্ররা যেভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন, তা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যান। শোনা যায়, একশ' একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করেছিলেন। নিয়মভঙ্গের দিন কত হাজার লোককে যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তার হিসেব নাকি কেউ জানতেন না।

যাই হোক, এই সব মিটে যাবার কয়েক দিন পর বড়বাবু একদিন সকালে সব ভাইদের ডেকে বললেন, পিতৃদেব ঠাকুর্দার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কী পেয়েছিলেন, তা তোমরা সবাই খুব ভাল করেই জানো এবং আমাদের পিতৃদেব আমাদের জন্য কী রেখে গেছেন, তা তোমাদের বলি....

চার ভাই অবাক হয়ে বড় ভাইয়ের দিকে তাকান।

অনেক দলিল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্তরের মাঝখানে বসে বড়বাবু চোখে চশমা লাগিয়ে একটা কাগজ তুলে নিয়ে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের চারটি কোম্পানির খবর তোমরা সবাই জানো এবং মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি কোম্পানি থেকেই বছরের সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। অর্থাৎ বছরে পৌনে দু'লাখ।

সবাই চুপ।

বড়বাবু এবার অন্য একটা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে বলেন, অগ্রদ্বীপের সম্পত্তির কথা বাদ দিয়ে পিতৃদেব স্থাবর যে সম্পত্তি রেখে গেছেন তা হচ্ছে, ভবানীপুরের এই বাড়ি, স্ট্রান্ড রোডে আড়াই বিঘে জমির উপর গুদামঘর, মানিকতলায় সাড়ে তিন একর জমি, মধুপুর-গিরিডিতে মোট সাত বিঘে জমি ও ছোট্ট ছোট্ট দু'টি বাড়ি।

বড়বাবু এবার হাতের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলেন, এইসব সম্পত্তির দলিল ও খাজনা-ট্যাক্সের রসিদ সবই ঠিক আছে। তবে কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছি, পুরীতে দু'বিঘে জমির উপর একটি দোতলা বাড়ির জন্যও বাবা একজনকে বছর পাঁচেক আগে পাঁচ হাজার এক টাকা অগ্রিম দেন কিন্তু সেই অগ্রিম দেবার রসিদ ছাড়া আর কোনো কাগজপত্র এখনও পর্যন্ত পাইনি। এ বিষয়ে একটু খোঁজখবর নিতে হবে ; কারণ বাবা অগ্রিম দিয়ে চুপ করে বসে থাকার মানুষ ছিলেন না।

চার ভাই নীরবেই সম্মতিতে মাথা নাড়েন।

বড়বাবু এবার অন্য একটি কাগজ হাতে তুলে নিয়ে বলেন, আমাদের চারটি কোম্পানির নামে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে যে চারটি অ্যাকাউন্ট আছে, তাতে এখন মোট জমা আছে সড়ে তিন লাখের কিছু বেশি। এই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কেই বাবার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে আছে পাঁচ লাখ এবং আমাদের প্রত্যেক ভাইয়ের নামে বাবা রেখে গেছেন পঞ্চাশ হাজার করে।

এতক্ষণ পর ভাইদের মধ্যে প্রথম কথা বলেন মেজকর্তা। উনি একটু খুশির হাসি হেসে বললেন, বাবা যে আমাদের এক একজনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেছেন, তা তো আগে জানতে পারিনি।

বড়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, আরো দু'একটা খবর আছে, যা আমরা আগে জানতে পারিনি।

সেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সেও কি বিষয়-সম্পত্তির...

বড়বাবু ওঁর কথায় কান না দিয়েই বলেন, খবরগুলি গুরুতর। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার সাহেবকে বাবা লিখিতভবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টের পাঁচ লাখ টাকা থেকে এক লাখ পাবেন মানিকতলার জগত্তারিণী দাসী, এক লাখ টাকা দিতে হবে মিসেস উইলিয়ামস্‌কে...

দু'তিন ভাই প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করেন, এরা কারা?

—আগে আমাকে সব কথা বলতে দাও ; তারপর তোমরা প্রশ্ন করো।

না, কোনো ভাইয়ের মুখে আর একটি কথা নেই।

বড়বাবু বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ প্রকাশ না করে বলে যান, ঐ জগত্তারিণী দাসীর দুই কন্যার বিবাহের জন্য এক লাখ দিতে হবে এবং বাকি দু'লাখ মানিকতলার জমিতে জগত্তারিণী দাসীর বাড়ি তৈরি হবে।

এইবার উনি ভাইদের দিকে তাকিয়ে বলেন, বলো, কী জানতে চাও।

মেজবাবু আর সেজবাবু প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করেন, কে এই জগত্তারিণী দাসী?

ন'বাবু একটু মুখ টিপে হেসে প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করেন, নিশ্চয়ই আমাদের খুব আপনজন!

বড়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, জগত্তারিণী দাসী বাবার রক্ষিতা ছিলেন এবং দুই কন্যার জন্মদাতাও তিনি।

বড় ভাইয়ের কথা শুনে অন্য ভাইদের হৃৎপিণ্ডের ওঠানমা বন্ধ হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। কারুর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় না। তারপর মেজবাবু জিজ্ঞেস করেন, আপনি এই জগত্তারিণী দাসীর খবর আগেই জানতেন?

বড়বাবু জবাব দেন, হ্যাঁ, জানতাম।

—এ খবর তো আগে কোনোদিন আমাদের বলেননি!

—বাবার রক্ষিতাকে নিয়ে আলোচনা করার রুচি হয়নি। উনি একটু থেমে বলেন, বাবা নিজের জীবিতকালেই যদি এইসব টাকা ওদের দিয়ে যেতেন, তাহলে আজকে আমাকে এই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হতো না।

এবার ন'বাবু হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আচ্ছা বড়দা, এই ইংরেজ মহিলাটিও কি পিতৃদেবের রক্ষিতা ছিলেন?

—আংশিক।

বড়বাবুর উত্তর শুনে সব ভাইরা একসঙ্গে হেসে ওঠেন। ওঁদের হাসির জন্য বড়বাবুও একটু না হেসে পারেন না।

সেজবাবু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেন, আংশিক মানে?

—কেন তোমরা আমাকে এইসব অপ্রিয় প্রশ্ন করছ? দু'দিন পর তোমরা নিজেরাই সবকিছু জানতে পারবে। বড়বাবু খুব জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, ওসব কথা বাদ দাও। এখন তোমরা আমাকে একটি কথার জবাব দাও।

সবাই গম্ভীর হয়ে বড়বাবুর দিকে তাকান।

—এখন সব চাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি যৌথ পরিবার থাকবো নাকি আলাদা হবো? আমরা সবাই মিলেমিশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবো, নাকি তাও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে আলাদা করে নেব?

ন'বাবু প্রশ্ন করেন, হঠাৎ আলাদা হবার কথা বলছেন কেন? কেউ কি আলাদা হতে চেয়েছে?

আরো দু'এক ভাই বললেন, আলাদা হবার কথা উঠছে কেন?

বড়বাবু বললেন, আমি তোমাদের আলাদা হতে বলছি না বা আমি নিজে আলাদা হতে চাইছি না। উনি একটু থেমে বললেন, তবে একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে বাবা আর বেঁচে নেই। তিনি থাকতে সবকিছুই তাঁর ইচ্ছামত হয়েছে এবং আমরা মেনে নিতেও বাধ্য হয়েছি।

একই নিঃশ্বাসে উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, অবশ্য একথা হাজার বার মানতে হবে পিতৃদেব সংসার ও ব্যবসার অকল্পনীয় উন্নতি করছেন।

মেজবাবু বললেন, সে তো একশ বার।

—তবুও তো তোমরা স্বীকাব করবে বাবার বহু কাজ আমরা মেনে নিতে পারিনি। তখন বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছি কিন্তু এখন তো আর সেই বাধ্যতা থাকছে না।

অন্য সব ভাই চুপচাপ করে থাকলেও ছোটবাবু বললেন, বাবা যখন নেই তখন আপনিই সব সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আপনার সিধান্ত মেনে নিতে তো আমাদের আপত্তি থাকতে পারে না।

—তুমি আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও সবাই মানবে কেন? প্রত্যেকেরই তো নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে। তাছাড়া এ বিষয়ে বৌমাদের সঙ্গেও তোমাদের পরামর্শ করা উচিত।

সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে বড়বাবু মনে মনে একটু হেসে বলেন, আজ এখনই তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে বলছি না কিন্তু সাত দিন, দশ দিন বা বড়জোর মাসখানেকের মধ্যে একটা কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের নিতেই হবে।

সব শেষে উনি বললেন, আর হ্যাঁ, ঐ পাঁচ লাখ টাকা বাবা কাকে কীভাবে দিতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা দশ জনে জানলে বোধহয় আমাদেরই ক্ষতি হবে।

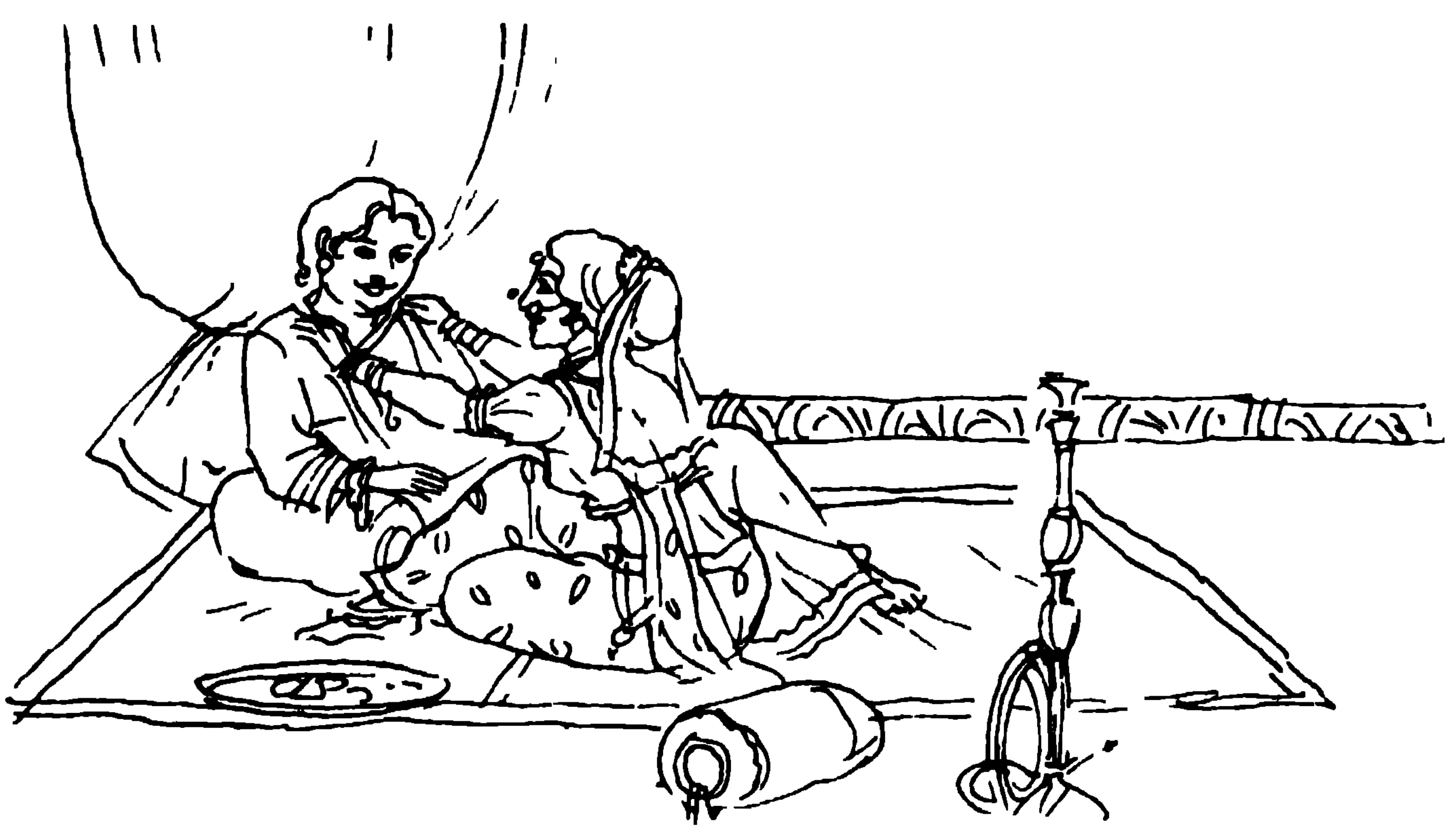

তিন

সব শুরুরই শেষ আছে ; কিন্তু সব শেষেরও তো শুরু আছে।

কলকাতার মাটিতে জোব চার্নক পা দেবার সময় ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে বসাক আর শেঠদের খ্যাতি থাকলেও বাংলাদেশে সচ্ছল ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের আগে বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলমান ও আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও আরব, পারস্য, তুরস্ক ও তিব্বতে সুতি ও সিল্কের কাপড়, চিনি, লবণ, সোরা ও আফিম বিক্রি করে শত শত কোটি টাকা আয় করতেন।

ঢাকাই মসলিনের চাহিদা তো তখন সারা পৃথিবীতে। মুর্শিদাবাদ সিল্কের জন্য হাহাকার করতেন সমগ্র ইউরোপ ও জাপানেব বিত্তবান নারী-পুরুষরা। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা বাংলা থেকে কোটি কোটি টাকাব সুতি ও সিল্কের কাপড় কিনে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেতেন নানা দেশে। নবাব আলিবর্দি খাঁ'র রাজস্ব বিভাগের হিসেবের খাতায় দেখা যায় শুধু মুর্শিদাবাদ থেকে যে সিল্কের কাপড় ইউরোপে রপ্তানি হয়, তার জন্য শুল্ক বাবদ আয় হয় সত্তর লক্ষ টাকা। বাংলার ঘরে ঘরে তখন সত্যি গোলা ভরা ধান।

পলাশীর যুদ্ধের পব কয়েক বছরের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। হবে না? সিরাজের মৃত্যুর পর মীরজাফর ও মীরকাশিম নিজেদের গদি বাঁচবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের কিছু কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর হাতে পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের সমতুল্য অর্থ ও সোনা-রূপা তুলে দেন। নানা নথিপত্র বিচার-বিবেচনা করে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী তেইশ বছরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে তিন শ' আশি লক্ষ পাউন্ড ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্বে শুরু হলো জুয়াচুরি। বার্ষিক তিন হাজার টাকা দেবার বিনিময়ে বাংলার গভর্নব যুবরাজ সুজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে শুল্ক মকুব করেছিলেন, তার ষোল আনা অপব্যবহার করে কোম্পানি যে কত লক্ষ লক্ষ টাকার শুল্ক ফাঁকি দেয়, তার ঠিকঠিকানা নেই।

তৃতীয় পর্বে শুরু হলো বাংলার তাঁতিদের উপর অত্যাচার। তাঁতিদের মারধর করে কোম্পানির সাহেবরা আসল দামের চাইতেও কম দামে মাল কিনতে শুরু করে। ফলে বাংলার অসংখ্য তাঁতি তাঁত বোনা ছেড়ে মাঠে নামলেন লাঙল নিয়ে।

তারপর আরো কত কী হলো! বাংলার সমস্ত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন শেষ হতে না হতেই ম্যাঞ্চেস্টারে কাপড়ের কল চালু হলো। একদিন যে বাংলার কাপড় পৃথিবীর দিকে দিকে রপ্তানি হতো, সেই বাংলাদেশেই জাহাজ বোঝাই বিলেতি কাপড় আমদানি শুরু হলো।

ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস চলে গেলেন ১৭৮৫'এর শুরুতেই অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হলেন স্যার জন ম্যাকফারসন। স্যার জনের পরেই এলেন কর্নওয়ালিশ। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'ও চালু করলেন এবং শুরু হলো জমিদারদের দ্বারা প্রজা শোষণ। দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ, তার উপর এই শোষণ! বাংলা ও বাঙালিকে শেষ করার কী অপূর্ব ব্যবস্থা!

এই পরিস্থিতিতেও শুরু হলো নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য বিলিতি জিনিস বিক্রি। জাহাজ বোঝাই জিনিসপত্র আসতো কলকাতার গঙ্গায়। স্ট্রান্ড রোডের ধারের বড় বড় গুদামে রাখা হতো সে সব জিনিসপত্র। তারপর ঠেলা আর নৌকা বোঝাই করে সে-সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়তো শহর কলকাতার বাজারে আর গ্রামবাংলার অসংখ্য গঞ্জে।

পরনে আট হাতি মোটা ধুতি, গায় ফতুয়া, গলায় চাদর ও হাতে ছাতি নিয়ে নরোত্তম মল্লিক ঘরে ঢুকেই করজোড়ে নমস্কার করতেই ম্যালকম সাহেব এক গাল হাসি হেসে বললেন, গুড মর্নিং নড়োটম!

—ভেরি গুড মর্নিং স্যার!

সামনের চেয়ার দেখিয়ে সাহেব বললেন, সিট ডাউন নড়োটম।

কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে নরোত্তম বলেন, নো সিট ডাউন স্যার।

—হোয়াই? কেনো বসিবে না?

—স্যার, আপনি মালিক, আপনি রাজার জাত। আপনার সামনে কি আমার মতো অধম বসতে পারে।

ম্যালকম সাহেব হো হো করে হেসে ওঠেন কিন্তু মনে মনে খুশি হন। তারপর নরোত্তমের দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, ইফ আই অর্ডার ইউ — যদি হামি টুমাকে অর্ডার কড়ি, টাহা হইলে বসিবে?

লজ্জা, ভক্তি, শ্রদ্ধায় নরোত্তম আর সাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেন না। মুখ নিচু করে বলেন, স্যার হুকুম করলে কুকুরের পেচ্ছাব পর্যন্ত খেতে পাবি।

ম্যালকম সাহেব মুখ বিকৃতি করে বলেন, ও! ডোন্ট বি সিলি। নাউ টেক ইওর সিট। জরুরি কথা আছে।

সত্যি, জরুরি কথার জন্যই সাহেব ওকে তলব করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালই চলছিল কিন্তু লর্ড কার্জন বঙ্গবঙ্গের সিদ্ধান্ত নিতেই এক দল শিক্ষিত ভদ্রলোক সাধারণ মানুষকে এমন খেপিয়ে তুলতে শুরু করেছে যে এম্পায়ার টেক্সটাইল কোম্পানির লন্ডন অফিস পর্যন্ত চিন্তায় পড়েছে। ওরা ক'দিন আগেই ম্যালকম সাহেবকে তার পাঠিয়ে বলেছে, এই সঙ্কটের মোকাবিলা কীভাবে করা যায় সত্বর জানাও।

—নড়োটম!

—ইয়েস স্যার!

—স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ফেমাস ব্যারিস্টার মিস্টার আনন্ডমোহন বাসু থেকে শুরু করে টুমাডের ফেমাস পোয়েট টেগোর পর্যন্ত এক জোট হয়ে ঠিক করেছেন, আমাদের দেশে টৈরি কাপড় টুমাডের পরতে দেবেন না।

নরোত্তম মল্লিক অধোবদনে সাহেবের কথা শোনেন।

ম্যালকম সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বলেন, হোয়াট ইজ ইওর ইনফরমেশন?ও সম্পর্কে তোমরা ব্যবসাদাররা কিছু শুনেছ?

লজ্জায় দুঃখে নরোত্তম মুখ নিচু করেই উত্তর দেন, হ্যাঁ স্যার, শুনেছি বৈকি! উনি

এক মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, স্যার, আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না, এই সব বিলেতফেরত শিক্ষিত ও বনেদী পরিবারের মানুষরা কী করে এই রকম ভুল কাজ করতে পারেন।

—আই অলসো কান্ট ড্রিম। আমি ভাবতে পারি না বাট দে আর ডুয়িং।

—ইয়েস স্যার।

—এই বিষয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে — আই মিন তোমরা যারা বিলাইতি কাপড়ের মেন ডিস্ট্রিবিউটার — কোনো আলাপ-আলোচনা করেছ?

এবার নরোত্তম মুখ তুলে বলেন, হ্যাঁ, স্যার, করেছি বৈকি।

ম্যালকম সাহেব মুখে কিছু বললেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকান।

—স্যার, আমার আর কেদার দত্ত'র ধারণা এইসব ফালতু হইচই করে বিলিতি কাপড় বিক্রি বন্ধ করা যাবে না।

—হোয়াই?

নরোত্তম মল্লিক এক গাল হাসি হেসে বলেন, স্যার, বিলিতি কাপড় ছাড়া লোকে পরবে কী? দেশি কাপড় কি শহুরে মানুষ পরে?

—দ্যাটস রাইট বাট এতগুলো ফেমাস লোক যখন মুভমেন্ট করছেন, তখন আমাদের ক্ষতি হতে তো বাধ্য।

মুহূর্তের মধ্যে ঝানু ব্যবসাদার নরোত্তম মল্লিক মনে মনে হিসেব-নিকেশ করে বলেন, তবে স্যার, যদি অনুমতি করেন, তাহলে দু'একটা কথা বলি।

ম্যালকম সাহেব পাইপ ধরাতে ধরাতে বলেন, ইয়েস ইয়েস, সে হোয়াট ইউ লাইক।

—স্যার! নরোত্তম মুখ কাঁচুমাচু করে শুরু করেন, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এই আন্দোলনের দ্বারা বিলেতি কাপড় বিক্রি বন্ধ করা যাবে না কিন্তু এতগুলো বিখ্যাত লোক যখন উঠে পড়ে লেগেছেন, তখন কিছু গণ্ডগোল হবেই।

—অব কোর্স! ম্যালকম এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, গণ্ডগোল যে হবে, সে বিষয়ে শুধু আমরা ইংরেজ ব্যবসাদাররা না, গভর্নমেন্টের মনেও কোনো সন্দেহ নেই।

—তাই বলছিলাম স্যার, আমাদের যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে দয়া করে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করবেন নয়ত....

ম্যালকম সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে বলেন, লুক হিয়ার নড়োটম, তোমাকে আমি সোজাসুজি বলে দিচ্ছি, এই মুভমেন্টের জন্য তোমাদের যে ক্ষতি হবে, তার ষোল আনা ক্ষতিপূরণ তোমরা পাবে।

সাহেব পাইপে একটা টান দিয়ে বলে যান, শুধু তাই নয়, তোমরা যাতে আরো ভাল করে ব্যবসা করতে পারো, তারজন্যও শুধু আমরাই না, স্বয়ং গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়ও চেষ্টা করবেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে নরোত্তম হতবাক হয়ে সাহেবের দিকে তাকান। তারপর কোনমতে

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলেন, স্যার, এত বড় সৌভ্যাগের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

ম্যালকম সাহেব যেন আপন মনেই বিড়বিড় করেন, এই মুভমেন্ট যারা করছে, তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্যই তোমাদের সাহায্য করতেই হবে।

সাহেবকে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে নরোত্তম মল্লিক বিদায় নেন এবং মনে মনে বলেন, এই শালা ইংরেজ জাতটা হচ্ছে হাড় কেপ্পনের জাত। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার না, একেবারে গ্র্যান্ড-ফাদার-গ্র্যান্ড-মাদার! এই শালা ম্যালকমকে কত বছর ধরে বলছি, স্যার, আপনি আমাদের বাপ-মা, দয়া করে একটু কমিশন বাড়িয়ে দিন, কিন্তু না, কিছুতেই করল না। কখনও বলেছে, হ্যাঁ দেখছি; আবার কখনও বলেছে, বিলেতে চিঠি লিখেছি....

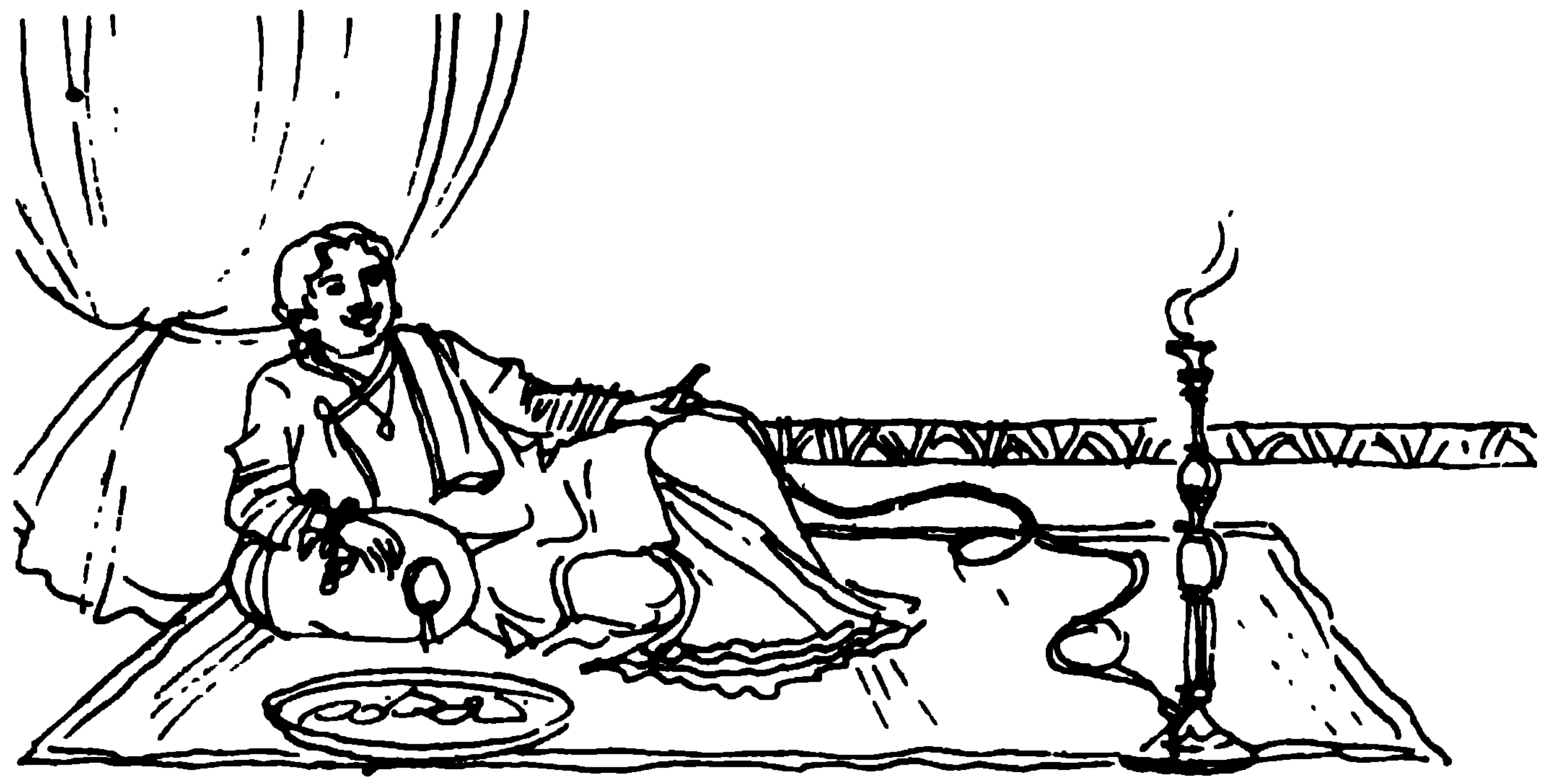

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ঘোড়ার গাড়ি বৌবাজারে পৌঁছে যায়। বাহান্ন বছরের নরোত্তম মল্লিক আনন্দে খুশিতে প্রায় বাচ্চা ছেলের মতো সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে সুহাসিনীর ঘরে ঢুকেই ওকে দু'হাতে জাড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করেন। সুহাসিনী কোনো মতে পানের পিক গিলে বলে, কিরে মিনসে, কার সব্বোনাশ করে আবার কী সম্পত্তি করলি?

নরোত্তম এবার নাচ থামিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসি হেসে বলেন, ওরে মাগী, এবার আর কোনো বোস-ঘোষ-মিত্তির বা বাঁড়ুজ্যে-চাটুজ্যে না, একেবারে ম্যালকম সাহবকে কুপোকাত করব।

—ওরে মিনসে, তুই কি আজ দিনে-দুপুরে গাঁজা টেনেছিস?

না' নরোত্তম মল্লিক গঞ্জিকা সেবন করে আসেনি। এবার ও গম্ভীর হয়ে বলে, সত্যি, সুহাস, ম্যালকম সাহেব এমন প্যাঁচে পড়েছে যে...

—সাহেব প্যাঁচে পড়ল কেমন করে। ওরা রাজার জাত। ওরা কি কাঁচা কাজ করে?

সুহাসিনীকে নরোত্তম সত্যি ভালবাসে। ভালবাসবে না কেন? সারাটা দিন সংসার-ধর্ম টাকাকড়ি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কত ঝামেলা যে ওকে সহ্য করতে হয়, তার ঠিকঠিকানা নেই। এক একদিন অসহ্য মনে হয়। মুহূর্তের জন্য মনে হয়. সব ছেড়েছুড়ে কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু না, নরোত্তম পালিয়ে যায় না, যেতে পারে না। সন্ধ্যের পর গদি থেকে বেরিয়ে হাজার দুঃশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ও প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে আসে বৌবাজার।

তারপর?

এক ঝি পাখার বাতাস করে, আরেক ঝি পা ধুইয়ে শুকনো গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিতে না দিতেই সুহাসিনী এক গেলাস শরবত আর এক থালা জলখাবার নিয়ে হাজির হয়।

—আজ আর কিছু খাবো না।

—কেন?

—ইচ্ছে করছে না।

—ইচ্ছে করছে না বললেই কি হয়? সুহাসিনী পাশে বসে নিজে হাতে পাখার বাতাস করতে করতে বলে, সেই সাত সকালে বড়গিন্নির হাতে দু'মুঠো নাকে-মুখে দিয়েই তো গদিতে গিয়েছ। তারপর সারাদিন তো আর মুখে কিছু দাওনি।

নরোত্তম তবু বলেন, সত্যি সুহাস, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

—তাই কি হয়, এই পরিশ্রমের পর পেটে কিছু না পড়লে শরীরটা থাকবে কী করে?

এইটুকু বলেই সুহাসিনী চুপ করে থাকে না। নিজে হাতে ওঁকে খাইয়ে দেয়। নরোত্তম ওকে বাধা দেন না ; বরং খুশি হন।

তারপর সুহাসিনীর বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে উনি সব দুঃশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পান।

সমগ্র বাংলাদেশের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের ধার, চট্টগ্রামের অরণ্য-পর্বত থেকে বীরভূমের লাল মাটি আর বাঁকুড়ার কাঁকুরে মাটিতে হঠাৎ এক চাঞ্চল্যর ঢেউ অবাক করে দিল শুধু কার্জন সাহেবকে না, বিলেতের ভারত-ভাগ্য বিধাতাদেরও। সবাই বিস্মিত হতভম্ব! সমস্ত বঞ্চনাকে যারা

ভাগ্যের পরিহাস বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, সেই বঞ্চিত বুভুক্ষু গভীর নিদ্রামগ্ন বাঙালির ঘুম ভাঙল কী করে? শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদেরই না, সমস্ত ইংরেজকে যে বাঙালি জাতি দেবদূত বলে তাদের প্রত্যেকটি হুকুম নিঃশব্দে তামিল করেছে, সেই বাঙালিই কি মন্ত্রবলে তাদের উপেক্ষা করল? কী আছে ঐ 'বন্দেমাতরম' কথাটির মধ্যে?

ম্যালকম সাহেব তো ভেবেই পেলেন না, বিলেতে তৈরি অত সুন্দর কাপড়ের পরিবর্তে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে তৈরি মোটা কাপড়গুলো ব্যবহার করার কী আনন্দ বা সার্থকতা থাকতে পারে?

কর্নেল লংম্যানের পার্টিতে সব সাহেবের মুখেই এক কথা, এক আলোচনা।

—জাস্ট টেল মি টড, প্রিন্স দোয়ারকা নাথ টেগোরের গ্র্যান্ডসন হয়ে পোয়েট টেগোর কী করে নাখোদা মস্কের মুসলিমদের এমব্রেস করলেন? হুইস্কির গেলাসে চুমুক দেবার আগেই মিঃ ফ্রিম্যান প্রশ্ন করেন গভর্নর জেনারেলের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অন্যতম কর্ণধার মিঃ টডসনকে।

টডসন উত্তর দেবার আগেই পাশ থেকে মেজর মার্শম্যান চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, নট ওনলি দ্যাট, পোয়েট টেগোর খালি পায় ক্যালকাটার ডার্টি রাস্তায় প্রসেশন করেছেন একদল ছোটলোককে সঙ্গে নিয়ে।

টডসন সাহেব হুইস্কির গেলাসে সামান্য একটু চুমুক দিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়েই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, পোয়েট টেগোর বিখ্যাত জামিদার বাড়ির লোক হয়ে এইসব কী করে করলেন, তা সত্যি সারপ্রাইজিং।...

—অ্যান্ড শকিং টু! পাশ থেকে মন্তব্য করলেন এক মেমসাহেব।

—ইয়েস অব কোর্স! মেমসাহেবের দিকে মাথা নেড়ে বললেন টডসন। তারপর একটু থেমে বলেন, ব্যানার্জিকে আই-সি-এস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি হয়তো হতাশা বা রাগে অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু হোয়াই ফেমাস ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বাসু বা পোয়েট টেগোর? সব ব্যাপারটাই খুব সিরিয়াসভাবে ভেবে দেখা হচ্ছে।

ওদের গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝখানে আই-সি-এস ক্লিফটন সাহেব যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা কেউ খেয়াল করেননি। টডসনের কথা শেষ হতেই উনি বললেন, সব চাইতে বড় কথা, এই লোকগুলো কোন সাহসে ক্রাউনের বিরুদ্ধে শুধু নিজেরাই হই হই করল না, বেঙ্গলের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কমনম্যানকে খেপিয়ে তুলল?

যাই হোক, অসন্তোষের আগুন তখনও চারদিকে ছড়িয়ে থাকলেও দাউ দাউ করে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা একটু থামতেই তখন আলাপ-আলোচনা, হিসেব-নিকেশের পর্ব চলছে সর্বত্র। নরোত্তম মল্লিক একদিন হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ম্যালকম সাহেবের কাছে হাজির।

—হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার নড়োটম? এত কাঁদছ কেন?

নরেত্তম মল্লিক সোজা সাহেবের দুটি পা জাড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, স্যার, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—এনি বডি ইন ইওর ফ্যামিলি মারা গিয়েছেন?

—স্যার, বাড়ির কেউ মারা গেলে কি এত চোখের জল পড়তো? নরোত্তম অশ্রুপ্লুত দুটি চোখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, তার চাইতে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—আচ্ছা! আচ্ছা! আর কাঁদতে হবে না। কী হয়েছে, তাই বলো।

—স্যার, নরোত্তম এবার উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে বলে, স্যার, আমার সেকেন্ড ওয়াইফ-এর ফার্স্ট ছেলে পুরুষোত্তম ইস্ট বেঙ্গলের থেকে আজই...

ম্যালকম সাহেব কোনো মতে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করেন, নড়োটম, তোমার ক'টা ওয়াইফ?

—স্যার, ওনলি টু ওয়াইফ অ্যান্ড....

—অ্যান্ড?

নরোত্তমের ঐ অন্ধকার মুখ মুহূর্তের জন্য একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে স্যার, অ্যান্ড সুহাসিনী দাসী মাই কেপ্ট!

—আই সি! ম্যালকম সাহেব এবার আর না হেসে পারেন না।

—স্যার, সুহাসিনী ভেরি বিউটিফুল ; ভেরি গুড গার্ল। ও না থাকলে আজ আমি ঠিকই আত্মহত্যা করতাম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ স্যার!

ম্যালকম সাহেব আবার একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, আই অ্যাম হ্যাপি টু নো ইট। তুমি আত্মহত্যা করলে তো আমি হাজার সমস্যায় পড়তাম।

সাহেব এখানেই থামেন না। বলেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, মহিলাটি সত্যি ভাল এবং বুদ্ধিমতী।

সাহেবের কথা শুনে নরোত্তম মনে মনে আত্মহারা হয়ে যায়। বলে, স্যার, সুহাসিনী ইজ টনিক, সুহাসিনী ইজ গন্ধরাজ!

ওর কথা শুনে সাহেব হো হো করে হেসে ওঠেন।

না, নরোত্তম মল্লিক তার আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায় না। বলে, স্যার, সেকেন্ড

ওয়াইফ'এর ফার্স্ট সনের কাছে যখন শুনতে পেলাম, এই হতচ্ছাড়া বন্দেমাতরমওয়ালারা আমার কাপড় বোঝাই দশ-বারোটা নৌকা শুধু পদ্মা আর মেঘনাতেই ডুবিয়ে দিয়েছে...

—রিয়েলি?

নরোত্তম আবার কাঁদতে শুরু করে।

—ডোন্ট ক্রাই। কী কী ক্ষতি হয়েছে, তাই বলো।

নরোত্তম ধুতির এক কোনা দিয়ে চোখের জল মুছে বলে, স্যার, বন্দেমাতরমওয়ালারা ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট-ময়মনসিং আর বরিশালের পনের আনা কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া যশোর-খুলনা রংপুর-বগুড়া রাজশাহীতে দোকান পোড়ানো ছাড়া দোকানদারদের খুব মারধর করেছে।...

ম্যালকম সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, হ্যাঁ, মিঃ টডসন বলছিলেন, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টেও এই ধরনের খবর এসেছে।

—স্যার, এদিকে কলকাতা আর ব্যারাকপুরের দুটো গুদামই তো....

—লুঠ হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, স্যার।

—ইয়েস দ্যাট আই নো। ম্যালকম সাহেব এবার পাইপ ধরিয়ে একটা টান দিয়ে যেন আপনমনে বলেন, দ্য হোল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোলাপসড্!

—স্যার, আমাকে কিছু বললেন?

—ইয়েস নড়োটম, তোমার যেখানে যা ক্ষতি হয়েছে, তার পুরো হিসেব আমাকে চটপট দাও। কেডার ডাট্টা অ্যান্ড আদার ডিস্ট্রিবিউটরদেরও বলো, আমাকে পুরো হিসেব দিতে।

—ইয়েস স্যার! তবে আমার মতো ক্ষতি আর কারুর হয়নি।

—দ্যাট আই নো।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সত্যি বহু বিলেতি কাপড়ের ব্যবসাদারদের ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে হাটেবাজারে যেসব দোকানদাররা বিলেতি কাপড় বিক্রি করতেন, তাঁদের অধিকাংশ দোকানই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু জায়গায় লুটপাটও হয়। ক্ষতি হয়েছিল নরোত্তম মল্লিকেরও ; তবে সে ক্ষতি অতি সামান্যই।

নরোত্তম অতীব ঝানু ব্যবসদার। আন্দোলন শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগেই সে সমস্ত গুদাম থেকে পনের আনা কাপড় অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়। তাছাড়া খাতাপত্তরে লিখে রাখে, বিশ-বাইশটা নৌকো বোঝাই কাপড় নানা জেলায় পাঠিয়েছে। তারপর একদিন সুরেন বাঁড়ুজ্যের এক চেলার সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করে, কিহে মিত্তির

মশাই, তোমরা নাকি আমাদের কাপড়ের ব্যবসা করেতে দেবে না?

—না, বিলেতি কাপড় আর বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।

—হবে না মানে?

আমরা সব বিলেতি কাপড় পুড়িয়ে দেব। মিত্তিরমশাই একটু থেমে বলেন, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের অনুষ্ঠানের পর স্বেচ্ছাসেবকরা বিলেতি কাপড়ের দোকানে আর গুদামে আগুন দিতে শুরু করবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মল্লিকমশাই! নেতারা স্পষ্ট করে কিছু না বললেও স্বেচ্ছাসেবকরা এই রকম ঠিক করেছে।

নরোত্তম বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তাহলে তো যথেষ্ট চিন্তার কথা।

মিত্তিরমশাইয়ের সঙ্গে নরোত্তম মল্লিকের পরিচয় বহুদিনের। তাই মিত্তিরমশাই একটু ভেবে বলেন, শুনছি, কেউ কেউ কাপড়-চোপড় সরিয়ে ফেলছেন। আপনিও সরিয়ে ফেলুন।

—কোথায় সরিয়ে ফেলব বলুন? একি দু'একটা কাপড় যে গিন্নির বাক্স-প্যাঁটরায় লুকিয়ে রাখব?

—তা ঠিক কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—আপনার সব গুদামই তো বড় বড় রাস্তায়। ওগুলো কি বঁচাতে পারবেন?

এবার নরোত্তম একটু হেসে বলে, গুদামে আগুন লাগলে আমাকে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসা ধরতে হবে। ব্যবসা ছাড়া আমি তো আর কিছু বুঝি না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্য ব্যবসাই ধরুন।

শুধু ইংরেজ সরকার না, ইংরেজ ব্যবসাদারদের সেই মহা দুর্দিনে ম্যালকম সাহেবকে বোকা বানিয়ে নরোত্তম মল্লিক কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েক লাখ টাকা কামিয়ে নেয়। ঢাকাই মসলিন, কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদের সিল্ক, তাঁতের কাপড়, লবণ, সোরা, আফিম ইত্যাদি রপ্তানির ব্যবসা বন্ধ হলেও নতুন কিছু বাঙালি ব্যবসাদার ইংরেজদের কৃপায় নতুন করে ধনী হন। নরোত্তম তাঁদেই একজন। বাঙালির সর্বনাশের দিনেই এদের পৌষ মাসের শুরু।

হঠাৎ কিছু টাকা পেয়েই কেদার দত্ত'র মাথায় টাকা ওড়াবার নেশা চেপে ধরল। শুরু হলো দুর্গাপূজা আর কাঙালি ভোজন দিয়ে কিন্তু তারপরই হঠাৎ উনি সঙ্গীতরসিক হয়ে উঠলেন। এমন রসিককে রস-সাগরে ভাসবার জন্য বন্ধুর অভাব হলো না। কেউ

খবর দেন, রামপুরের বাঈজী নান্নু বাঈ'এর গজল শুনে নাকি জয়পুরের মহারাজা ঠিক করেছেন, জীবনে আর কোনো বাঈজীর গান শুনবেন না। বাগবাজারের নিত্য চাটুজ্যে সে খবর শুনে হেসেই আটখান। কেদার দত্ত অবাক হয়ে বলেন, কিরে নিত্য, হাসছিস কেন?

পিকদানিতে পানের পিক ফেলেই নিত্য চাটুজ্যে বলে, হাসব না? জয়পুরের মহারাজা আবার গানের সমঝদার হলেন কবে?

—তুই কী বলছিস নিত্য? জয়পুরের মহারাজা গানবাজনার সমঝদার না?

—আজ্ঞে না। নিত্য চাটুজ্যে মাথা নেড়ে বলে, জয়পুরের মহারাজা ঘোড়ার ডিম গানবাজনা বোঝেন।

—যাঃ! তাই হয় নাকি?

—ওরে বাপু, জয়পুরের মহারাজা পৃথিবীবিখ্যাত শিকারী কিন্তু...

কেদার দত্ত দুটো চোখে বড় বড় করে বলে, তাই নাকি?

—তবে বলছি কী? নিত্য এবার সোজাসুজি কেদার দত্ত'র চোখের উপর চোখ রেখে বলে, জয়পুরের মহারাজা বছরের ছ'মাস থাকেন অফ্রিকার জঙ্গলে আর ছ'মাস থাকেন বিলেতে।

—উনি জয়পুরে থাকেন না?

—দু'চার বছর পর দু'চারদিনের জন্য আসেন। নিত্য একটু ঢোক গিলে বলে, গানবাজনার ব্যাপারে ওঁর আগ্রহও নেই, সময়ও নেই।

এবার কেদার দত্ত একগাল হাসি হেসে বলে, শালা নুটু ঘোষ গুল মেরেছে।

কেদার দত্ত'র কথা শুনে নিত্য চাটুজ্যে খুশি হয়। মনে মনে ভাবে, টোপ গেলাতে পেরেছে। কিন্তু মনের কথা মনে রেখেই গম্ভীর হয়ে বলে, যদি সত্যি গজল শুনতে হয়, তাহলে লাহোরের বিখ্যাত বাঈজী রেশোনারা বাঈ'এর কাছে যেতে হবে।

কেদার দত্ত গানবাজনার কচু বোঝে কিন্তু ম্যালকম সাহেবের কৃপায় ফালতু লাখ খানেক হাতে আসার পর দু'চারজন বাঈজীর মজলিসে যাতায়াত করেই এমন ভান দেখায় যে ও গানবাজনার কত বড় সমঝদার। তাই তো রোশোনারা বাঈ'এর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর কথা ওস্তাদ বদরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে বহুবার শুনেছি।

নিত্য চাটুজ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটে, রোশেনারা বাঈ'এর নাম বড় বড় ওস্তাদদের কাছেই শুনবে। নুটু হারামজাদা ওর নাম জানবে কেমন করে?

নিত্য একটু থেমে একবার আড়চোখে কেদার দত্ত'কে দেখে নিয়ে বলে, যারা জন্ম থেকে শ্যালদা স্টেশনের কুলিদের ঢোল পিটিয়ে গান করা শুনে আসছে, তারা এইসব বাঈজীদের কদর বুঝবে কেমন করে?

—ঠিক হ্যায়! চলিয়ে লাহোর!

এই করেই কেদার দত্ত শেষ হয়ে যায় কিন্তু নরোত্তম মল্লিক অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ম্যালকম সাহেবকে বোকা বানিয়ে বেশ কয়েক লাখ টাকা পকেটে পুরলেও কাউকে বিশেষ কিছু বুঝতে বা জানতে দিল না। বন্দেমাতরমওয়ালাদের হই-হুল্লোড় একটু ঝিমিয়ে পড়ার পর বিলেতি কাপড়ের ব্যবসা আবার চালু হলে বড় গিন্নির অনুরোধে একদিন শনি-সত্যনারায়ণ পূজা হলো, ছোট গিন্নির আবদারে দুই বউকে দু'খানা বেনারসী আর সুহাসিনীর জুটল একটা বিছে হার। সবাইকেই এক কথা বলল নরোত্তম মল্লিক, ভেবেছিলাম আরো কিছু করব কিন্তু তা আর পারলাম না। আমরা যদি ডালে ডালে চলি, তাহলে সাহেবরা চলে পাতায় পাতায়। তাছাড়া শালারা সত্যি কথা বলে না।

সুহাসিনী অবাক হয়ে বলে, সেকি গো! রাজার জাত হয়েও ওরা মিথ্যে কথা বলে?

নরোত্তম মুখ বিকৃত করে বলে, আমাদের মতো ও শালাদের কি ধম্মো-অধম্মো জ্ঞান আছে? হাজার মিথ্যে কথা বলে ও শালারা শুধু কাজ হাসিল করে নেয়।

—তুমি যে আগে ম্যালকম সাহেবের কত পোসংসা করতে?

—গণ্ডগোল শুরু হবার আগে শালার কত বড় বড় কথা! হ্যানো করেঙ্গা, ত্যানো করেঙ্গা! নড়োটম, ডোন্ট বদার! তোমাদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তার ষোল আনা ব্যবস্থা আমি করব।

এবার নরোত্তম একটু ম্লান হেসে বলে, যেই গণ্ডগোল থামল, অমনি শালা বেমালুম সব ভুলে গেল।

শুনে সুহাসিনী সত্যি দুঃখিত হয়, হতাশ হয়। তবু জিজ্ঞেস করে, তুমি কিছু বললে না?

—কী বলব সুহাস? আমাকে তো ব্যবসা করে খেতে হবে। তারপর খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জলে বাস করে কি কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায়?

সুহাসিনী মাথা নেড়ে বলে, সে তো একশ'বার।

সুহাসিনীর কাছে পরীক্ষায় পাশ হবার পর নরোত্তম মনে মনে খুশি হয়। একটু হাসে। দু'হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলে, মাগী, তুই যদি আমাকে প্রাণভরে আনন্দ দিতে পারিস, তাহলে ব্যবসা কাকে বলে, তা আমি দেখিয়ে দেব। তুড়ি মেরে লাখ লাখ টাকা আয় করব।

সুহাসিনী একটু ঢল ঢল ভাব করে বলে, তখন কি আর আমাকে ভাল লাগবে? আরো

ডাগর-ডোগর কোন মাগী...

নরোত্তম এক গাল হাসি হেসে দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়েই টানতে টানতে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, তোর চাইতে ডাগর-ডোগর মাগী হয় নাকি?

—সত্যি?

—সত্যি বলছি ; তোকে ছুঁয়ে বলছি।

—ছোটবউকে বেশি ভালবাসিস, নাকি আমাকে?

নরোত্তম হো হো করে হেসে উঠে বলে, বউকে আবার কেউ ভালবাসে?

ম্যালকম সাহেব ভাবেন, নরোত্তম মল্লিকের মতো সৎ ও ইংরেজ ভক্ত ব্যবসাদার হয় না ; সুহাসিনী ভাবে, ওর মতো বাবু হয় না। কিন্তু নরোত্তম নিজে জানে, সে কী। সে ম্যালকম সাহেবকে বলল, সেকেন্ড ওয়াইফ' এর ফার্স্ট সন পুরুষোত্তম ইস্ট বেঙ্গল ঘুরে সব রিপোর্ট এনেছে কিন্তু সাহেব তো জানে না, সেকেন্ড ওয়াইফ'র কোনো ছেলেমেয়েই এখনও পর্যন্ত হয়নি। হবে কেমন করে? এইতো সেদিন বিয়ে করল। তাছাড়া ক'দিন ও স্বামীর সোহাগ ভোগ করেছে? শ্বশুরমশায়ের বুড়ো বয়সের কচি মেয়ে। দেখেই মনটা গলে গেল। সঙ্গে দু'শ-আড়াইশ' ভরি সোনা আর মানিকতলার ঐ দোতলা বাড়ি সমেত সাড়ে পাঁচ বিঘে জমি! এ সুয়োগ ছাড়ার মতো কাঁচা পাত্র নরোত্তম মল্লিক না।

খবরটা শুনে বড়বউ'এর চোখে জল এসেছিল। নরোত্তম ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, হা ভগবান! তুমি কাঁদছ?

—তুমি আমার সব্বোনাশ করতে যাচ্ছো আর আমি কাঁদব না?

—আমি তোমার সব্বোনাশ করতে যাচ্ছি? নরোত্তম অবাক হয়ে বড়বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে।

—তুমি আমার ঘরে সতীন আনবে আর....

নরোত্তম হেসেই আটখান। ঐ হাসতে হাসতেই বলে, দূর বোকা! এ ছুঁড়িকে বিয়ে করছি তোমার সব্বোনাশের জন্য?

—তবে কি আমার মরার পর সঙ্গে বাতি দেবার জন্য?

এবার নরোত্তম অত্যন্ত ধীর স্থির হয়ে বলে, শোনো বড়বউ, ঐ বুড়ো নগেনের কচি মেয়েটাকে ঘরে আনছি তোমারই ভালর জন্য।

—ঘরে সতীন আনছ আমারই ভালর জন্য?

নরোত্তম মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বড়বউ, আমার বয়স কত হলো?

—পুরো পঞ্চাশ।

—তোমার বয়স কত?

—এই সাঁইত্রিশে পড়েছি।

—কত বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে?

—পঁচিশ বছর।

—তোমাকে আমি ভালবাসি না?

—আমি কি তাই বলেছি? বড়বউ মুখ নিচু করে বলে, তোমার সোহাগের দয়াতেই তো আমি শাঁখা-সিঁদুর পরে হাসি মুখে দিন কাটাচ্ছি।

বড়বউ এবার হেসে বলে, আমি তো আমার সই'কে বলি, আমি যা স্বামীর সোহাগ পাই, তা বোধহয় কোটি কোটি মেয়ের কপালে জোটে না।

হাসে নরোত্তমও। বলে, তবে? তবে? সেই আমি তোমার সব্বোনাশ করব। এবার ও বড়বউকে বোঝায়, সত্যি বলছি, রাধাকৃষ্ণের নামে দিব্যি করে বলছি, এই কচি মেয়েটাকে ঘরে আনছি তোমার আর তোমার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে। তুমি তো খাটতে খাটতে মরে গেলে। রাধাকৃষ্ণের সেবা করা থেকে সংসারের হাজার ঝুট-ঝামেলা এক হাতে সামলানো কি সহজ ব্যাপার?

বড়বউ চুপ করে স্বামীর কথা শোনে।

নরোত্তম বলে যায়, এ ছুঁড়ি তোমার দাসী হয়ে সংসারে থাকবে। তোমার সেবা-যত্ন কাজকর্ম...

—আহাহা! সে করবে কেন?

—না করলে লাথি মেরে দূর করে দেব না! নরোত্তম মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তাছাড়া আরো ব্যাপার আছে।

—কী?

—কলকাতা কী করে বাড়ছে দেখেছ? আমাদের চোদ্দ পুরুষ ভাবেনি, কালীঘাটের চারপাশে, আদি গঙ্গার দু'দিকে কোনোদিন ভদ্দরলোক বাস করবে। আর এখন?

বড়বউ ওর কথার কোন মাথামুণ্ডু বোঝে না। শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকে।

নরোত্তম থামে না, বলে যায়, তোমার ছেলেরা যখন বড় হবে, তখন মানিকতলার ঐ সাড়ে পাঁচ বিঘে জমির দাম হয়তো সাড়ে পাঁচ কোটি টাকায় পৌঁছবে।

নরোত্তম একবার কোনো মতে নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, দু'চার বছর যেতে না যেতেই হয়তো দেখবে, নতুন কারখানা করার জন্য সাহেবরা ঐ জমি কিনতে আমার বাড়িব দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বড়বউ কিছুই বোঝে না। তবে এটুকু জানে, এই সব.ব্যাপারে তার স্বামী কোনো ভুল করার মানুষ না। তবুও বড়বউ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সবই বুঝলাম কিন্তু সতীন তো সতীনই হবে।

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বডবউ, যদি এই হতভাগী কোনো অশান্তি করে, তাহলে আমি তাকে ত্যাগ করব।

বড়বউ মানুষটি সত্যি ভাল। বড় শান্তিপ্রিয় আর স্বামীর প্রতি তার অগাধ ভক্তি। ক'বছর আগে সুহাসিনীকে রক্ষিতা রাখার সময়ও বড়বউ কান্নাকাটি করেছিল। তখন নরোত্তম বলেছিল, বড়বউ, আমি তোমারই থাকব। শুধু সন্ধেবেলায় দু'এক ঘণ্টা ওখানে কাটিয়ে চলে আসব।

—তুমি ঠিকই ওখানে রাত কাটাবে।

—বড়বউ, আমি জীবনেও ওখানে রাত কাটাবো না। সংসার আর ব্যবসা নষ্ট করার পাত্তর নরোত্তম মল্লিক না।

—এখন তো অনেক কথাই বলবে কিন্তু ঐ ডাইনীর হাতে পড়লে কি এইসব কথা মনে থাকবে?

—বড়বউ, ও মাগী যদি বুনো ওল হয়, তাহলে আমিও বাঘা তেঁতুল।

নরোত্তম সত্যি কথা রেখেছে। ঝড়-বৃষ্টি-প্লাবন যাই হোক, নরোত্তম মল্লিক তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন সন্ধের পর সুহাসিনীর কাছে যাবেই। না যেয়ে পাবে না। কিন্তু দু'এক ঘণ্টা সোহাগ-ভালবাসার খেলাধূলা করেই বলে, সুহাস, আজ উঠি।

—এখনই? এরই মধ্যে উঠবে?

—হ্যাঁ। নরোত্তম খুব জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কত কাজ ফেলে তোর কাছে আসি জানিস?

—তোমার যে কাজ অনেক, তা আমি ভাল করেই জানি।

গলায় চাদর, পায়ে পাম্পশ্যু জুতো দিয়ে বারান্দায় পা দিয়েই নরোত্তম সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, এই দু'এক ঘণ্টা তোর সঙ্গে খেলাধূলা করে মনটাকে একটু তাজা করে নিয়ে আবার কাজে বসি।

স্বামী রক্ষিতা রেখেছে বলে এখন বড়বউ-এর সত্যি কোনো দুঃখ নই। যদি এই বিষয়ে ওকে কেউ কখন কিছু বলে তাহলে তাকে বড়বউ শুনিয়ে দেয়, তোমাদের গগন ঘোষাল যে তাস খেলেই বউ-ছেলেমেয়েকে পথে বসাচ্ছে,তা দেখতে পাও না? কেন, কেষ্ট ভটচাজ যে গলায় পৈতে দিয়ে সোনাগাছিতে পড়ে থাকে, তাও কি কারুর চোখে পড়ে না? হারু দত্ত তো চব্বিশ ঘণ্টা বোতল নিয়ে পড়ে থাকে। সে বেলায় কারুর মুখে কোনো কথা নেই। যত দোষ এই নন্দ ঘোষের ; তাই না?

বড়বউ কোনোমতে একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, ওরে বাপু, আমার মতো স্বামী পেতে হলে জম্মো জম্মো তপস্যা করতে হবে।

ম্যালকম সাহেবের জাহাজ তখনও বোধহয় খিদিরপুর জাহাজঘাট থেকে ছাড়েনি। নরোত্তম মল্লিক ফুলের তোড়া, এক বোতল শ্যাম্পেন আর একটা বিরাট কেক নিয়ে ডেকস্টার সাহেবের বাংলোয় হাজির—স্যার, ভেরি গুড মর্নিং! আই নরোত্তম মল্লিক।

—আই সি! ডেকস্টার করমর্দনের জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েই একটু হেসে বললেন, হামি বিলাটে বসে টুমার কথা শুনেছে।

—স্যার, সে আপনার কৃপা আর আমার চোদ্দপুরুষের সৌভাগ্য।

—টুমি ইম্পিরিয়্যাল টেক্সটাইলের গ্রেট ডিস্ট্রিবিউটার। টুমার কথা বিলাটের অফিসের সবাই জানে।

—স্যার, আপনারা রাজার জাত। আপনারা দেবতা। তাই আমার মতো কীট-পতঙ্গকেও স্নেহ করেন।

মিঃ ডেকস্টার সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, টেল মি মিঃ মালিক, কীভাবে আমাদের কোম্পানির কাপড় আরো বিক্রি হতে পারে? অ্যান্ড অলসো টেল মি আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

—স্যার, এককথায় জবাব দেব?

—ইয়েস, ইয়েস।

—স্যার, আমাকে বেঙ্গলের সোল ডিস্ট্রিবিউটার করে দিলেই...

—টুমি পারিবে?

—স্যার, আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই পারবো।

—লাখখানেক টাকা সিকিউরিটি জমা রাখতে পারবে?

—স্যার, দরকার হলে দুই বউয়ের গহনা বিক্রি করেও ঐ টাকা জমা দেব।

—অল রাইট! ইউ উইল গেট ইট।

চার

ইংরেজদের দোষ অনেক। ওদের মতো স্বার্থপর, লোভী, রক্ষণশীল ও আত্মকেন্দ্রিক জাতি পৃথিবীতে আর নেই ; কিন্তু ওদের একটি গুণ। ওরা কথার খেলাপ করে না। ডেকস্টার সাহেবও তাঁর কথার খেলাপ করেননি। নরোত্তম মল্লিকও তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। ওর নিষ্ঠা আর উদ্যমে ইম্পিরিয়্যাল টেক্সটাইল কোম্পানির কাপড় ছড়িয়ে পড়ল কটক থেকে তিনসুকিয়া-ডিব্রুগড়, পাটনা-মুঙ্গের-ভাগলপুর থেকে চট্টগ্রাম, রাজশাহী-রংপুর-বগুড়া থেকে বারাসত-বসিরহাটে বাজারে।

নরোত্তম মল্লিকের বুড়ো ম্যানেজারবাবু জগদীশ ভটচাজ্ ঠিকই বলেছিলেন, শুধু মানুষের জীবনেই না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও গ্রীষ্ম-বর্ষা শীত-বসন্ত আছে। সুরেন বাঁড়ুজ্যের দলবল তো সারাজীবন ধরেই গণ্ডগোল করবে না। দু'দিন আগে বা পরে এসব বন্ধ হতে বাধ্য।

জগদীশ ভটচাজ্ বড়বউয়ের বাপের বাড়ির পুরোহিত এবং ও বাড়ির সবারই খুব শ্রদ্ধার পাত্র। ভদ্রলোকের দুটি ছেলের অকালমৃত্যু হবার পর উনিও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। অনেকের অনেক অনুরোধ-উপরোধেও কেনো ফল না হওয়ায় জগদীশবাবুর স্ত্রী ছুটে আসেন নতুন জামাই নরোত্তম মল্লিকের বাড়ি। উনি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মল্লিক মশায়ের স্ত্রীর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, বড় খুকি, তুমিই তো আমাদের বড় মেয়ে মা! তোমার অন্নপ্রাশন, তোমার নামকরণ, হাতে খড়ি থেকে বিয়ে তো উনিই দিয়েছেন। তুমি ওঁকে বাঁচাও মা! তা নইলে চারটি মেয়েকে নিয়ে আমাকে

আত্মহত্যা করতে হবে।

জগদীশ ভটচাজ্ পুরোহিত হলেও সত্যি বড় খুকিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাইতো বড় খুকীর কান্নাকাটি দেখে উনি শেষ পর্যন্ত মল্লিকবাড়িতে না এসে পারলেন না। পিতৃহীন নরোত্তমও ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো এবং আস্তে আস্তে টুকটাক দায়-দায়িত্ব দিতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই নরোত্তম বুঝতে পারে, জগদীশ ভটচাজের শাস্ত্রজ্ঞানের চাইতে ব্যবসায়িক বুদ্ধি অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, মানুষটি ষোল আনা সৎ। একেবারে খাঁটি সোনা।

জগদীশ ভটচাজের বিচার-বুদ্ধির উপর নরোত্তম মল্লিকের অগাধ আস্থা থাকলেও সুরেন বাঁড়ুজ্যে-আনন্দমোহন বসু-রবি ঠাকুর যখন কার্জন সাহেবকে হেনস্তা করার জন্য মেতে উঠেছিলেন, তখন অন্যান্য অনেকের মতো নরোত্তম মল্লিকও ভেবেছিল, হয়তো এ দেশে আর বিলিতি কাপড় বিক্রি হবে না। তবে নরোত্তম মল্লিক মনের কথা মনেই রাখতো। এ আশঙ্কার কথা কাউকে বলতো না। বরং সব সময় মুখে বলতো, অন্য জিনিসপত্তর বিক্রি হবে কি না বলতে পারি না কিন্তু বিলিতি কাপড় বিক্রি হতে বাধ্য। দেশী তাঁতিরা ক'টা কাপড় বানাবে। মানুষের পেটে ভাত থাক আর নাই থাক, পরনে একটুকরো কাপড় চাই-ই।

মুখে এসব কথা বললেও আন্দোলন যখন জমে উঠেছিল, তখন মল্লিমশায়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন জগদীশ ভটচাজ্ ওঁকে বার বার বলেন, কিচ্ছু চিন্তা করো না বাবাজীবন। চাকা ঘুরতে বাধ্য। কিন্তু চাকা যে এমন বনবন করে ঘুরতে শুরু করবে, তা এই বুড়ো ম্যানেজারবাবু স্বপ্নেও ভাবেননি।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও পরিচিতরা জানলেন, নরোত্তম মল্লিকের ব্যবসা বেশ ভালই চলছে, আয়ও বেড়েছে, কিন্তু ঠিক কতটা ভাল চলছে, তা শুধু জানতেন ঐ বুড়ো ম্যানেজারবাবু আর তার মালিক। একদিন সুযোগ বুঝে জগদীশ ভটচাজ্ মল্লিকমশাইকে বললেন, যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা বলতাম।

—আপনি আমার পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় এবং পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাকে সব সময় সব কিছু বলার অধিকার তো শুধু আপনারই আছে।

বুড়ো ম্যানেজারবাবু একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ বাবা, সেই অধিকারেই তোমাকে ক'টা কথা বলতে চাই।

নরোত্তমের দিকে তাকিয়ে উনি বলেন, দেখো বাবা, কথায় আছে লক্ষ্মী চঞ্চলা। তাছাড়া তুমি দেখেছ, ব্যবসা-বাণিজ্য কখনও ভাল চলে কখনও খারাপ চলে।....

সম্মতিতে নরোত্তম মাথা নাড়ে।

জগদীশ ভটচাজ্ বলে যান, মা সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় তোমার এখন সুদিন চলছে কিন্তু এমন আমদানি তো চিরকাল থাকতে পারে না বাবা।

—সে তো একশ' বার।

—দু' জাহাজের মাল ছাড়াবার মতো টাকা তো ব্যাঙ্কেই আছে। এছাড়া পূর্ব বাংলার গদিগুলোর টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই জমা পড়বে।

—ওখান থেকে কত টাকা আসবে?

—ঠিক মনে নেই ; তবে বোধহয় দু'লাখ সত্তর হাজার। বুড়ো ম্যানেজারবাবু একটু থেমে বলেন, এইসব বাদ দিয়ে আমার সিন্দুকে আছে তিন লাখ আশি হাজার, আর তোমার বাড়ির সিন্দুকে আছে ঠিক পঁচাত্তর হাজার। তাই আমার দুটো প্রস্তাব আছে।

—বলুন।

—সবার আগে লালদিঘি বা বড়বাজারের আশেপাশে তুমি অবিলম্বে কিন্তু সম্পত্তি কিনে রাখো। কারণ চোখের সামনে দেখতে পারছো, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে জমিজমার দাম বাড়ছে।

নরোত্তম গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা কী?

—কোনো একটা ব্যবসা নিয়েই মেতে থাকা ঠিক নয়। শুনেছ তো বোম্বাই রাজ্যের আমেদাবাদ শহরে কাপড়ের কল চালু হচ্ছে বলে বাজারে জোর গুজব। যদি এইসব মিল সত্যি চালু হয়, তাহলে ওদের কাপড়ও তো এখানকার বাজারে আসবে।

—আসবে ঠিকই কিন্তু বিলিতি মিলের কাপড়ের সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পারবে?

বুড়ো ম্যানেজারবাবু মুখ তুলে একবার চশমাটা ঠিক করে বলেন, বাবাজীবন, খদ্দেররা কখন কী পছন্দ করবে তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আগে থেকে বলতে পারবেন না।

নরোত্তম একটু চিন্তিত হলেও ঈষৎ হাসেন। মাথা নেড়ে বলেন, তা ঠিক।

—শুধু তাই না। সব খদ্দেরদেরই তো এক পছন্দ না।

নরোত্তম সব শোনার পর বলে, ভটচাজ্‌মশাই, আমাকে দুটো দিন ভাবতে দিন।

—দু'দিন কেন, তুমি দশ দিন চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও, কিন্তু বেশি দেরি করো না।

হ্যাঁ, ঠিক দু'দিন পরই নরোত্তম মল্লিক বুড়ো ম্যানেজারবাবুকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, হ্যাঁ ভটচাজ্‌মশাই, আপনার দুটো প্রস্তাবই আমি মেনে নিলাম। সম্পত্তির ব্যাপারে আপনি খোঁজখবর করুন ; আমি দেখছি, নতুন ব্যবসা কী করা যায়।

চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি যে পাঁচতলা বাড়িটা আজও দক্ষিণের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ঐটাই নরোত্তম মল্লিকের বাড়ি। তবে এই সম্পত্তির পিছনে একটা কাহিনী লুকিয়ে আছে।

তখনও চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিট তৈরি না হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই অঞ্চলটি তখন কিছু আর্মেনিয়ান সাহেব বেছে নেন। বহু আর্মেনিয়ান তখন এই অঞ্চলে

বসবাসও করেন। এইসব আর্মেনিয়ান সাহেবরা ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও বাংলাদেশের মানুষদের তাঁরা হেয় জ্ঞান করতেন না। শুধু তাই নয়। বাংলাদেশের উপর প্রভুত্ব করার বাসনাও এঁদের মনে কোনোদিন আসেনি। নানা কারণে আর্মেনিয়ানরা দু'চোখে ইংরেজদের দেখতে পারতেন না। তাই তো সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের হটিয়ে দেন, তখন কলকাতাবাসী আর্মেনিয়ানরা তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। দুঃখের বিষয়, পরের বছরই পলাশীর মাঠে সিরাজের পরাজয় হয়। তারপর থেকে বাঙালিদের সঙ্গে সঙ্গে আর্মেনিয়ানদেরও দুর্দিনের শুরু।

ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর্মেনিয়ানদের ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিতে শুরু করে। কিছু কিছু ইংরেজ আবার আক্রোশবশত প্রায় জোর করে ওদের সম্পত্তি দখল করে। আজকের চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিটের মোড়ের আড়াই বিঘা জমিও এইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সাহেবের দখলে এসে যায়। তারপর নানা কারণে হাত বদল হতে হতে এই সম্পত্তি চলে আসে কাশিমবাজারের এক দেওয়ানের হাতে এবং এই জমিরই এক অংশে একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করেন, কিন্তু বাকি জামিটা বিক্রি করে দেন এক দেন এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেবকে।

যাই হোক, জগদীশ ভটচাজ্ যখন এই জমিটি পছন্দ করে খোঁজখবর শুরু করেন, তখন উনি জানতে পারেন, সাবিত্রীবালা দাসী নামে এক মহিলা এই জমিটির অধেক অংশ কেনার জন্য জনৈকা মিসেস শিলটনকে পাঁচহাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছেন। জগদীশ ভটচাজ্ যখন ঐ সত্তর বছরের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বুড়ির কাছে হাজির হলেন, তখন উনি বললেন, পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছি ঠিকই এবং রসিদও দিয়েছি কিন্তু কী জন্য ঐ টাকা নিয়েছি তা কিছু লিখিনি।

—কেন মেমসাহেব?

মিসেস শিলটন একটু হেসে বললেন, মিঃ ভট্টাচার্জি, মাই গ্রান্ডফাদার প্রিন্সও ছিলেন না, জমিনডারও ছিলেন না, বাট হি ওয়াজ রিয়েলি এ রিচ ম্যান। ধরমতল্লা-লালবাজার অঞ্চলে এগারটা বাড়ির মালিক আমরা। এছাড়া কত জমি আছে আমাদের।...

—এ তো অত্যন্ত খুশির কথা মেমসাহেব।

মেমসাহেব ওঁর কথায় কর্ণপাত না করেই বললেন, ডে আফটার টুমরো মানডে। ঐদিনের মধ্যে যদি মিসেস ডাসি পুরো টাকা পেমেণ্ট না করে, তাহলে ঐ জমি অন্য কাউকে বিক্রি করে দেব।

—কিন্তু...

—নো ইফস্ অ্যান্ড বাটস্ মিঃ ভট্টাচার্জি। বুড়ি মাথা নেড়ে বললেন, ওরা যদি অন্য

কোথাও জমি কিনতে চায়, ভেরি গুড। নয়তো সঙ্গে সঙ্গে টাকা ফেরত দেব।

—ম্যাডাম, আমি সোমবার সকালে আসব?

—ইয়েস ইউ ক্যান কাম কিন্তু আটটার আগে না। তাছাড়া যে দাম বলেছি, তার এক পয়সা কম দামে আমি বিক্রি করব না অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু পে ইন ক্যাশ।

জগদীশ ভটচাজ্ সবিনয়ে বললেন, হ্যাঁ, মেমসাহেব, পুরো টাকাই একসঙ্গে দেব কিন্তু দামের ব্যাপারে যদি একটু দয়া করেন...

মিসেস শিলটন মাথা নেড়ে বললেন, নো দয়া-টয়া। বিজনেস ইজ বিজনেস। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার হোল ফ্যামিলিকে আমি তিন দিন ডিনার খাওয়াবো বাট জমির দাম এক পয়সা কম নিতে পারব না।

সোমবার সকালে ঘড়িতে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ ভটচাজ্ নরোত্তমকে নিয়ে মেমসাহেবের বাড়ি হাজির। মেমসাহেব ওদের দেখেই প্রশ্ন করলেন, পুরো টাকা সঙ্গে এনেছ?

জগদীশ ভটচাজ্ বললেন, হ্যাঁ, মেমসাহেব।

—ভেরি গুড!

মেমসাহেবের দুই ছেলে টাকা গুনে নিতেই মেমসাহেব কাগজে সই করে দিলেন। শুধু তাই না। মেমসাহেব বললেন, ধরমতল্লায় আমরা বড় বড় দুটো বাড়ি বানাচ্ছি। তাই আমরা লালবাজারের সামনের একটা বাড়ি বিক্রি করব।....

নরোত্তম প্রশ্ন করে, কতটা জমি আছে মেমসাহেব?

—অর্ধেক জমি ক'দিন আগেই খান বাহাদুর আবদুল রসিদ চৌধুরীকে বিক্রি করে দিলাম। এখন জমি আছে লিটল ওভার হাফ বিঘা।

নরোত্তম বলে, ইয়েস মেমসাহেব, আপনি দয়া করে ওটাও আমাদের দিন।

—অল রাইট। সামনের সানডে সকালে এইরকম সময় এসো। আমার এক ছেলে ঐ জমি আর বাড়ি তোমাদের দেখিয়ে দেবে।

—ভেরি গুড মেমসাহেব। তবে দয়া করে এই লালবাজারের সম্পত্তির ব্যাপারে এখন আর কারুর সঙ্গে কথা বলবেন না।

—নো, নো ; আমি এককথার মানুষ।

যাই হোক, মিসেস শিলটনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই মেয়েটিকে

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে দেখেই নরোত্তম থমকে দাঁড়ায়। খুব চেনা চেনা মনে হয় কিন্তু ঠিক মনে পড়ে না কোথায় দেখা হয়েছে। মেয়েটি পান চিবুতে চিবুতেই এক গাল হাসি হেসে বলে, কিগো মল্লিকবাবু, অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন? যেন চিনতেই পারছো না।

—চিনতে পেরেছি কিন্তু ঠিক...

ওর কথা শুনে মেয়েটি হেসেই আটখান। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, হা আমার কপাল! আগে ছোট শালী বলে কত ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছ আর এখন...

মেয়েটির হাব-ভাব, চাল-চলন দেখেই নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য জগদীশ ভট্টাচার্য বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছেন। যাই হোক, মেয়েটিকে পুরো কথা শেষ করতে হয় না। এবার নরোত্তম একগাল হাসি হেসে বলে, ও! তুই সাবিত্রী! তা এতো মোটা হয়েছিস যে...

—সরকারবাবুর যত্নে সত্যি একটু মোটা হয়েছি।

—কোন সরকারবাবু?

সাবিত্রীবালা ভুরু নাচিয়ে বলে, তোমার মতোই পাকা রুই। ভবানীপুরে থাকে। তুমি ওকে চেনো না?

নরোত্তম মাথা নেড়ে বলে, না। মল্লিকমশাই সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, তা তুমি এখানে? এই সাত সকালে?

সাবিত্রীবালা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, জমি কিনতে গো! জমি কিনতে! তারপরই একটু চাপা গলায় বলে, পরিবারের লোকজনকে জানাবে না বলে সরকারবাবু জমিটা আমার নামে কিনছে।

—ও!

—তা তুমি একদিন এসো ছোট শালীর ওখানে।

—আসব কিন্তু তুমি এখন থাকো কোথায়?

—ঐ বৌবাজারের বাড়ির যে-কোনো ঝিকে বললেই দেখিয়ে দেবে। একদিন এসো কিন্তু!

—হ্যাঁ আসব।

সাবিত্রীবালা মিসেস শিলটনের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও পিছিয়ে এসে একটু হেসে নরোত্তমকে বলে, একেবারে খালি হাতে ছোট শালীর কাছে আসতে নেই, তা জানো তো?

নরোত্তম হাসে। মুখে কিছু বলে না।

—তুমি খালি হাতে না এলে আমিও খালি হাতে ফিরিয়ে দেব না। সাবিত্রীবালা মুখ টিপে হেসে বলে, তবে একটু বেলা থাকতে থাকতে এসো।

—আচ্ছা! একটু চাপা হাসি হেসেই নরোত্তম জবাব দেয়।

মাসখানেক পর নরোত্তম মল্লিক সত্যি একদিন সাবিত্রীবালার আস্তানায় হাজির। সাবিত্রীবালা কিছু বলার আগেই মল্লিকমশাই ওর গলায় সাড়ে সাত ভরির একটা হার পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিগো ছোট শালী, পছন্দ হয়েছে?

—কি যে বলো মল্লিকমশাই! তোমার জিনিস আমার পছন্দ হবে না? সাবিত্রীবালা ওর কোলের উপর ঢলে পড়ে বলে, তোমাকে যে কত পছন্দ করি, তা তো তুমি জানো না?

—সত্যি নাকি?

—মা কালীর দিব্যি দিয়ে বলছি, ঐ সরকারবাড়ির বড়কর্তার চাইতে তোমাকে আমার হাজার গুণ ভাল লাগে।

—কেন? বড়কর্তা কী দোষ করল?

—সে কথা শুনে কী করবে? সাবিত্রীবালা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার পোড়া কপাল বলে তুমি কোনোদিন নজর দিলে না। কী পাও ঐ মুটকি সুহাসিনীর কাছে?

ওর কথা শুনে নরোত্তম মল্লিক একটু না হেসে পারে না। বলে, আমার জন্য যে এত পিরিত তোর মনের মধ্যে জমা আছে, তা জানব কেমন করে?

—একটু নজর দিলেই জানতে পারতে। সাবিত্রীবালা একটু থেমে বলে, বাড়িতে যদি একটা বুড়ি আর একটা ছুঁড়ি বউ রাখতে পারো,তাহলে দুটো মাগী রাখতে অসুবিধে কোথায়?

—তোকে পুষলে আমার কী লাভ?

মল্লিকমশায়ের দু'হাতের বন্ধন থেকে হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সাবিত্রীবালা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, দু'চোখ দিয়ে একবার আমাকে ভাল করে দেখো। এমন রূপ-যৌবন কটা মাগীর দেখেছ?

মল্লিকমশাইকে কিছু বলতে না দিয়েই সাবিত্রীবালা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমার আগে সুহাসিনী কোনো ভাল ব্যবসাদার ধরতে পেরেছে? ও তো চিরকাল শ্যালদা বাজারের কিছু দোকানদারকে নিয়েই থেকেছে।

নরোত্তম চুপ করে ওর কথা শোনে।

—আর আমি? সাবিত্রীবালা বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলে, আমি কোনোদিন চুনোপুঁটি ছ্যাঁচড়া দোকানদারদের কাছে আমার দেহ দিইনি। আমি রুই-কাতলা ছাড়া শিকার করি না।

নরোত্তম একটু মুচকি হেসে বলে, ওরে মাগী, তাতে আমার কী লাভ?

সাবিত্রীবালা অত্যন্ত রুক্ষদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, সব শালা ব্যবসাদারদের টিকি কেটে নেবার পর তবে আমি নিজেকে দিয়েছি।

—আমারও টিকি কেটে রাখবি?

সাবিত্রীবালা এক গাল হাসি হেসে দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি মানুষকে ভালবাসতে জানো, তাদের সুখ- দুঃখ বুঝতে পারো। তাই তোমাব টিকি কেটে রাখার দরকার হবে না। আমরা বাজারের মেয়ে বলে কি মন বলে কিছু নেই?

মল্লিকমশাই ওর ভাবান্তর দেখে অবাক।

সাবিত্রীবালা খুব জোরে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এই ছোটলোকগুলো কী করে লাখপতি হচ্ছে, তা আমার জানতে বাকি নেই, কিন্তু আমি যে কারুর উপকার করব, তার সুযোগই বা পেলাম কোথায়? এ দুনিয়ায় কেউই তো আমাদের বিশ্বাস করে না।

—আমি তোকে বিশ্বাস করি।

—সত্যি?

—তোকে ছুঁয়ে বলছি।

এক মুহূর্তের জন্য সাবিত্রী মনে মনে কী যেন হিসেব-নিকেশ করেই বলে, পরশু দিন একটু বেশি রাত্তিরে আসতে পারবে?

—বেশি রাত্তির মানে?

—সামনের গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলেই সরকারবাড়ির বড়কর্তা চলে যান। তুমি তার একটু পরে আসবে।

—কী দিবি আমাকে?

সাবিত্রী হেসে বলে, একটা রাত আমার কাছে কাটিয়েই দেখো না কী পাও। যদি লোকসান হয় তাহলে আর কোনোদিন এসো না।

—ঠিক আছে, আসব।

—কিন্তু দেখো, কেউ না জানে।

—না, না, কেউ জানবে না।

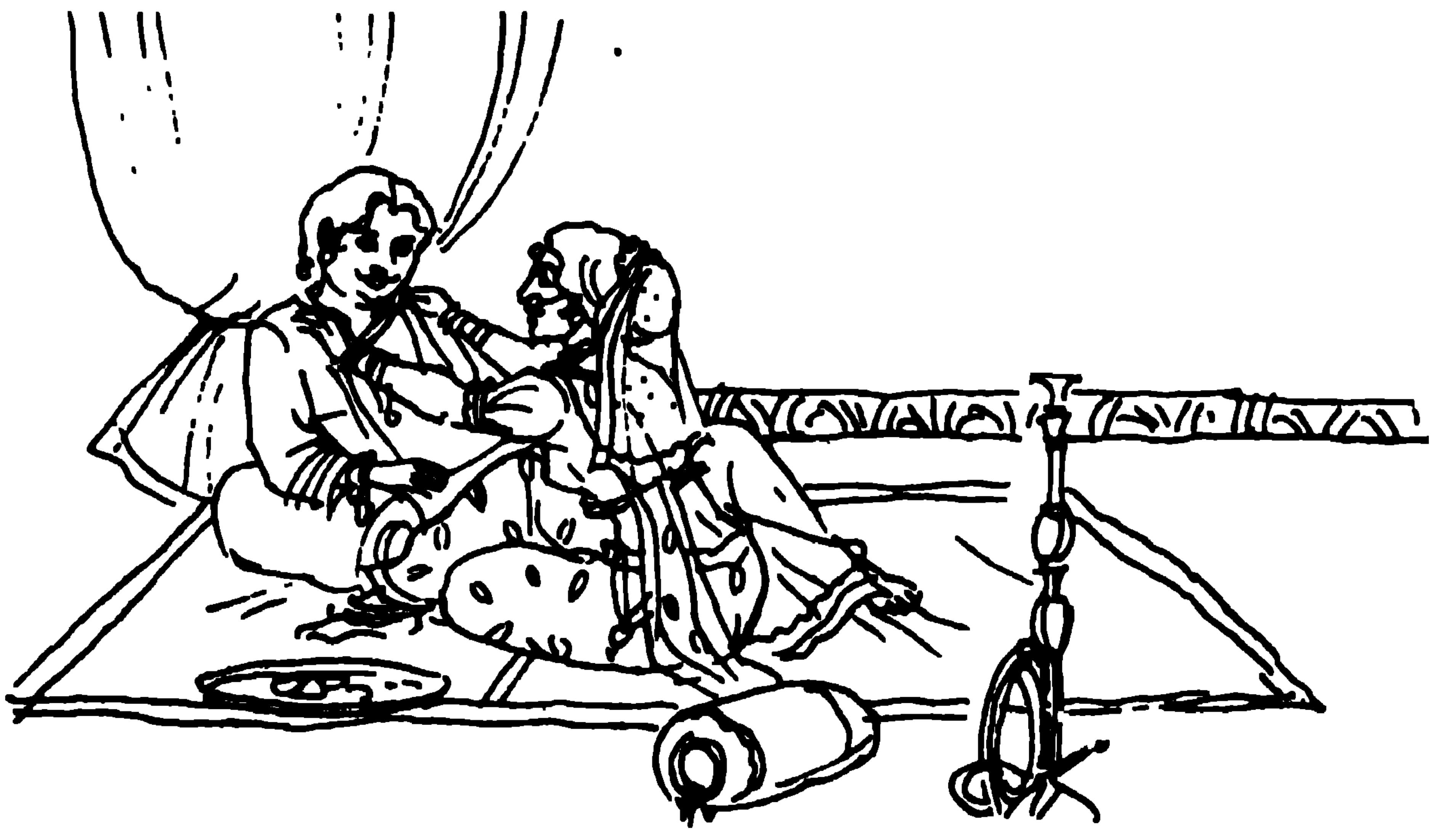

হ্যাঁ, সেদিন রাত্রে মল্লিকমশাই গিয়েছিল, না গিয়ে পারেনি। কেউটে সাপকে মানুষ ভয় পায়, কিন্তু তবু কেউটে সাপের খেলা না দেখে কোনো মানুষই থাকতে পারে না। শৈশবে, কৈশোরে,যৌবনে। এমনকি বার্ধক্যেও। সাবিত্রী বারবণিতা। দুর্বল কামার্ত মানুষকে বশ করে, খুশি করেই তার জীবিকা নির্বাহ হয় এবং তা লুকিয়ে চুরিয়ে হাফ-গেরস্ত বাড়ির বউ-ঝিয়ের মতো না। প্রকাশ্যেই সে আদিমতম পেশা চালায় কিন্তু তবু কী যেন একটা মোহ, একটা রহস্য ঘিরে আছে এই মেয়েটাকে। সে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও কী যেন নিজের কাছে লুকিয়ে রাখে। বোধহয় সেই রহস্য আবিষ্কারের লোভেই সেদিন রাতের অন্ধকারে মল্লিকমশাই সাবিত্রীর কাছে হাজির হয়।

সাবিত্রী এক গাল খুশির হাসি হেসে বলল, তাহলে মল্লিকমশাই, সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে রাত কাটাতে এলে?

মল্লিকমশাইও হেসে জবাব দেয়, কী করব বল? তুই বললে যে আমি গঙ্গায় ডুবে মরতে পারি, তা তো জানিস না।

সাবিত্রী মুখ নাড়িয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, আহা হা! আমার কি ভাগ্যি গো! এমন মিনসে যে এ জগতে আছে, তা যদি আগে জানতাম!

—আগে না জানলেও এখন তো জানলি।

যাই হোক, সাবিত্রী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে আদর-আপ্যায়ন করল। নিজেকে উজাড় করে দিতেও ত্রুটি রাখল না। কত হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব হলো। তারপর হঠাৎ সব হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করে সাবিত্রী জিজ্ঞেস করল, মল্লিকমশাই, নতুন ব্যবসা করবে?

—কীসের ব্যবসা?

—বিলেতি যন্ত্রপাতির ব্যবসা।

—কীসের যন্ত্রপাতি?

—অত-শত কি আমি বুঝি? সাবিত্রী একটু থেমে বলে, যদি তোমার গুদাম থাকে আর গর্ডন সাহেবের অফিসে শনিবারের মধ্যে নগদ লাখ টাকা জমা দিতে পারো, তাহলে বোধহয় বছর বছর লাখ টাকা কামাতে পারবে।

—তোকে কে বলল।

—অত-শত খবরে তোমার কী দরকার? দেরি না করে কালই গর্ডন সাহেবের অফিসে চলে যাও।

নরাত্তম একটু চিন্তিত হয়ে বলে, কালই?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালই। দেরি হলে হয়তো ফসকে যাবে কিন্তু দোহাই তোমার, দুনিয়ার কেউ যেন টের না পায়।

—ব্যাপারটা একটু খুলেই বল না!

—আগে গর্ডন সাহেবের সঙ্গে দেখা করো। তারপর সব বলব। নরোত্তম একটু ভেবে বলে, কিন্তু গর্ডন সাহেবকে খুঁজে বার করতেও তো দু'একদিন সময় লাগতে পারে।

সাবিত্রী একটু হেসে বলে, ওরে বাপু, গর্ডন সাহেব খুব নামকরা লোক। শুনেছি কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন। যে কোনো সাহেবী অফিসে খোঁজ করলেই বোধহয় ওঁর খবর পেয়ে যাবে।

—আচ্ছা দেখি।

ভোরবেলায় নরোত্তম চলে যাবার আগে সাবিত্রী বলল, কী হয় আমাকে জানিও।

—হ্যাঁ, জানাবো।

গর্ডন সাহেব প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, আমরা যে এজেন্ট রাখব, এ খবর তুমি জানলে কী করে?

—স্যার, আমার এক ফ্রেন্ড!

সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, দেখছি, তোমার ফ্রেন্ড তো ব্যবসা-বাণিজ্য দুনিয়ার অনেক গোপন খবর রাখে।

—হ্যাঁ, স্যার। নরোত্তমও হেসে জবাব দেয়। কিন্তু মনে মনে ভয় পায়, যদি এই বন্ধুর ব্যাপারে সাহেব আরো কিছু জানতে চান, তাহলে কী উত্তর দেবে।

যাই হোক, গর্ডন সাহেব পাইপ ধরিয়ে একটা টান দিয়েই বললেন, মিঃ মালিক, তোমাকে আমি এবার যেসব প্রশ্ন করব, তার জবাবে মিথ্যে কথা বলবে না।

—স্যার, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমি কখনই মিথ্যে কথা বলি না। কারণ মিথ্যে কথা বলে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি দিন চালানো যায় না।

—ভেরি গুড।

এবার প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সাহেব ওকে জেরা করলেন । হাজার রকমের প্রশ্ন। সব শেষে সাহেব বড়বাবুকে ডেকে বললেন, বড়াবাবু, মিঃ মালিককেই আমরা এজেন্ট

নিয়োগ করব। কাল সকাল ঠিক দশটায় উনি কাগজপত্র টাকাকড়ি নিয়ে আসবেন।

বড়বাবু বললেন, অল রাইট স্যার। আমি সবকিছু করে দেব।

—আর হ্যাঁ, এগ্রিমেন্ট সই হবার পরই আপনি ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে আর ই-বি-আর-এর চিফ এঞ্জিনিয়ারকে জানিয়ে দেবেন, ওঁরা যেন এবার থেকে মিঃ মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

—অল রাইট স্যার!

পরের দিন চুক্তি সই হবার পর গর্ডন সাহেব হাসতে হাসতে নরোত্তমকে বললেন, মিঃ মালিক, যদি ঠিক মতো ব্যবসা করতে পারো তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে কোটিপতিও হবে, রায়বাহাদুর উপাধিও পাবে।

নরোত্তম ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাত কচলে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, স্যার, আপনার কৃপা ছাড়া আমার আর কিছু কাম্য নেই।

তখন এমন একটা সময় যখন ভাল ছুঁচ পর্যন্ত বিলেত থেকে আসতো ; রেলের যন্ত্রপাতি তো দূরের কথা। তাই চুক্তি সই করার আগেই নরোত্তম মল্লিক জানতো, বছরে কয়েক লাখ টাকার মাল বিক্রি হবেই। কমিশন শতকরা দশ ভাগ থেকে খরচপত্তর বাদ দিয়েও বেশ মোটা টাকা লাভ থাকতে বাধ্য। কিন্তু নরোত্তম ভাবতে পারেনি, রেল কোম্পানিগুলো এত টাকার যন্ত্রপাতি কেনে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে থেকেই প্রথম চেক আসে। এক লাখ সত্তর হাজার তিনশ' আঠাশ টাকা বারো আনা। সেইদিন রাত্তিরেই একটা লাল টুকটুকে বেনারসী আর হীরের নাকছাবি নিয়ে নরোত্তম সাবিত্রীবালার ওখানে হাজির।

সাবিত্রী এক গাল হাসি হেসে বলল, কিগো মল্লিকমশাই, আমাকে বিয়ে করবে নাকি?

—তোর সঙ্গে তো আমার বিয়ে অনেক আগেই হয়ে গেছে।

—তাই নাকি?

—তবে কী?

—তবে কি আজ নতুন করে ফুলশয্যা হবে?

—এবার থেকে যেদিনই আসব, সেদিনই আমাদের ফুলশয্যা হবে।

—এত পিরিত সহ্য হবে তো?

হঠাৎ নরোত্তম গম্ভীর হয়ে বলে, দ্যাখ সাবিত্রী, আমি বেইমান না। তোর জন্যই আমি এই ব্যবসা করতে পারছি। সুতরাং এই ব্যবসা যত দিন চলবে, তোর কোনো চিন্তা নেই।

—তুমি যে বেইমানি করতে জানো না, তা আমি ভাল করেই জানি ; আর সেই জন্যই তোমাকে গর্ডন সাহেবের খবরটা বলেছিলাম।

সাবিত্রী একটু চুপ করে থাকার পর বলে, দেখো মল্লিকমশাই, তোমরা অনেক কিছু জানো কিন্তু পুরুষমানুষের আসল স্বভাব-চরিত্র শুধু আমরাই জানতে পারি।

—সে তো একশ বার।

—কম বড়লোক তো দেখলাম না! সেই তেরো বছর বয়স থেকে একটা না একটা বড়লোক নিয়েই এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম।

সাবিত্রী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি জানি, সরকারবাড়ির বড়কর্তা এই ব্যবসা করার সুযোগ পেলেও বেশিদিনও চালাতে পারতেন না।

—কী করে জানলি?

সাবিত্রী একটু মুচকি হেসে বলল, আমরা বাজারের মেয়ে। আমাদের না হয় ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান নেই। পয়সা পেলেই আমরা নিজেদের বিলিয়ে দিই, কিন্তু যে হারামজাদা নিজের বাড়ির সব বউ আর ঝি'দের পর্যন্ত সর্বনাশ করেছে সে আবার ব্যবসা করবে?

—তুই কী করে জানলি?

সাবিত্রী এবার একটু জোরেই হাসে। বলে, পুরুষদের মতো বোকা জাত আছে নাকি? দু'গেলাস মদ গিলিয়ে দেবার পর আমরা একটু বুকের কাছে টেনে নিলেই সব পুরুষের গলা দিয়ে সব কথাই বেরিয়ে আসে কিন্তু সকালবেলায় ঘুম ভাঙলে কোনো পুরুষই রাতের কথা মনে রাখতে পারে না।

—আর তোরা সব মনে রাখিস?

—একশ'বার রাখি। তোমাদের দুর্বলতা না জানলে এই ব্যবসায় টিকে থাকা যায়?

এবার নরোত্তম ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, সত্যি মাগী তোর বুদ্ধি আছে।

চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিটের মোড়ে নরোত্তম মল্লিকের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবার কিছু দিন পরই একদিন ভবানীপুরের সরকার বাড়ি বড়কর্তা ওর গদিতে এসে হাজির। হাতের ছড়িটা পাশে রেখে উনি দু'হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার মল্লিকমশাই।

—নমস্কার! মল্লিকমশাই অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়েই বলে, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।

—আমার নাম নরনারায়ণ সরকার ; থাকি ভবানীপুর, আর সামান্য ব্যবসা করি চীনেবাজারে।

—কীসের ব্যবসা?

—তেমন বলার মতো কিছু না, সামান্য কাগজের ব্যবসা করি। সরকার বাড়ির বড়কর্তা একটু হেসে বলেন, আপনি এক লরি বোঝাই যন্ত্রপাতি রেল কোম্পানিতে

সাপ্লাই দিলে নিদেন পক্ষে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করতে পারেন আর আমি এক লরি কাগজ বোঝাই করলে, তার দাম পনের-বিশ হাজারও হয় না।

এবার মল্লিকমশাই হেসে বলে, আপনি রোজ দশ-বিশ লরি মাল সাপ্লাই দেন আর আমি হয়তো মাসে দু'এক লরি মেসিনপত্তর রেল কোম্পানিতে বিক্রি করি। হরে-দরে একই ব্যাপার।

বড়কর্তা এক গাল হাসি হেসে বলে, না, না, তাই কি হয়?

গদির পুরনো দারোয়ান গড়গড়াটা বড়কর্তার হাতের কাছে দিতেই উনি বললেন, আমার এইসব নেশাটেশা নেই হে।

নরোত্তম মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ওরে রামলাল, ভবানীপুরের বড়লোকেরা কি এইসব সস্তার নেশা করেন? ওটা নিয়ে যা।

বড়কর্তা আবার হেসেই বলেন, সত্যি আমার কোনো নেশাটেশা নেই।

রামলাল গড়গড়াটা নিয়ে যেতেই মল্লিমশাই একটু ঝুঁকে ফিস ফিস করে বলে, নেশাটেশা তো নেই বললেন, কিন্তু মনটাকে এত সতেজ রেখেছেন কী করে?

বড়কর্তা হো হো করে ওঠেন। বলেন, মনে হচ্ছে, আপনিও বেশ রসিক ব্যক্তি!

—সবই আপনাদের আশীর্বাদ!

বড়কর্তা এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু চাপা গলায় বলেন, আজ সন্ধের পর আমার সঙ্গে চলুন। দু'জনে মিলে একটু আমোদ-আহ্লাদও হবে, আবার কথাবার্তাও বলা যাবে।

মল্লিকমশাই চাপা হাসি হেসে জবাব দেয়, আপনি হুকুম করলে কি আমি না শুনে থাকতে পারি?

দু'জনেরই সে কি হাসি!

সমবয়সী না হয়েও সেদিন থেকে ওঁরা বন্ধু হয়ে গেলেন। নিত্যনৈমিত্তিক না হলেও প্রায়ই ওঁদের দেখাশুনা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ঘর-সংসার থেকে শুরু করে এমনকি সাবিত্রী-সুহাসিনীকে নিয়েও ওঁদের কথাবার্তা হয়।

—আরে এসো, এসো নরোত্তম, তোমার কথাই ভাবছিলাম। হাতের ফাইলটা পাশে রাখতে রাখতে বড়কর্তা ওকে অভ্যর্থনা জানান।

—তুমি খুব ব্যস্ত না তো?

—কাজ তো সারাদিনই আছে কিন্তু সব সময় কি কাজ করতে ভাল লাগে? নরনারায়ণ সরকার এক মুহূর্তের জন্য একটু থেমেই বলেন, তুমি আজ না এলে কাল সকালেই আমি তোমার কাছে যেতাম।

—কেন? কোনো কাজ আছে?

বড়কর্তা এবার কোনো ভূমিকা না করেই বলেন, নরোত্তম, তোমার জন্য একটা জমি দেখেছি।

কোথায়?

—আমাদের ভবানীপুরেই।

—ওখানে জমি নিয়ে আমি কী করব?

—কী আবার করবে? একটা বাড়ি বানাবে।

—বাড়ি তো আমার আছেই।

—সেকি আমি জানি না? কিন্তু ভবানীপুরে কীভাবে জমির দাম বাড়ছে, তার খবর রাখো?

নরোত্তম সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বড়কর্তার দিকে তাকায়। বড়কর্তা একটু হেসে বলেন, যে জমি আগে পাঁচশ টাকায় বিক্রি হতো না, সেইসব জমি এখন তিন থেকে পাঁচ হাজারে পাওয়া কঠিন।

—সারা কলকাতাতেই জমির দাম বাড়ছে। নরোত্তম একটু হেসে বলে, কী বলব বড়কর্তা, বাগবাজারের খালের উত্তরেও এখন দোতলা-তিনতলা বাড়ি হয়ে গেছে। আমি তো ওখানে থাকার কথা ভাবলে শিউরে উঠি।

—আরে আমাদের ওদিকে কালীঘাট পর্যন্ত খালি জমি বিশেষ চোখে পড়ে না। তাই বলছিলাম, সস্তায় যখন জমিটা পাওয়া যাচ্ছে, তখন তুমি নিয়েই নাও।

—জমিজমা কিনতো আমার আপত্তি নেই কিন্তু জমিজমায় টাকা আটকে রাখলে আমাদের মতো ব্যবসাদারদের অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে।

—তেমন অসুবিধে হলে আমাকে বলো। কিন্তু পঞ্চাশ হাজারে দেড় বিঘে জমি হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বড়কর্তা একটু থেমে বলেন, ভদ্রলোক পুরো জমিটা একসঙ্গে একজনকে বিক্রি করবেন বলেই এত সস্তায় দিচ্ছেন।

নরোত্তম একটু ভেবে বলে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, তখন ঐ জমিতে একটা বাড়ি বানিয়েই ফেলব। ছোট বউ'এর ছেলেপুলে হলে...

বড়কর্তা এক গাল হাসি হেসে বলেন, এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা!

কলকাতার চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিট তখন এইসব দত্ত-সরকার-মল্লিক-দে আর কিছু বোস-ঘোষ-মিত্তিরদের একচেটিয়া। ক্লাইভ স্ট্রিটের অর্ধেক সাহেবদের দখলে থাকলেও বাকি অর্ধক এদেরই দখলে। গঙ্গার ধারে পর পর সাহা আর কুণ্ডুদের গুদাম। বড়বাজারের অসংখ্য দোকানদাররাও এইসব সাহা-কুণ্ডু বা দত্ত-সরকার-মল্লিকদের কোনো না কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এছাড়া সারা কলকাতা শহরের সব বাজারের বারো আনা দোকানদারও বাঙালি। ধর্মতলা-চৌরঙ্গির চোদ্দ আনা ব্যবসাই তখন বাঙালি

আর পশ্চিমী মুসলমানদের দখলে।

দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ আর মোহনবাগানের আই-এফ-এ শিল্ড জেতার পর বাঙালির ঘরে ঘরে উৎসব আর আলোচনা।

—ওরে বাপু, সারা দেশ কি এমনি বাঙালিদের খাতির করে? না করে উপায় নেই। হাইকোর্টের জজ্ কে? বাঙালি। বিখ্যাত অধ্যাপক কারা? বাঙালিরা। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কারা? বাঙালি। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কারা? তিলক-গোখলে-লাজপত রায়কে বাদ দিলে আর সব নেতাই তো বাঙালি। ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার-উকিল-মোক্তার থেকে সব বড় বড় সরকারি অফিসারও তো বাঙালি।

পাশের ভদ্রলোক নাকে নস্যি দিয়েই বলে, এককথায় বলে দাও, ছোট দারোগাবাবু আর শ্যালদা স্টেশনের টিকিটবাবু থেকে শুরু করে ভাইসরয় কাউন্সিলের মেম্বার পর্যন্ত সবই বাঙালি।

—ঠিক বলেছেন মশাই।

—এবার আই-এফ-এ শিল্ড জিতেও আমরা দেখিয়ে দিলাম, ফুটবল খেলাতে বাঙালি বেস্ট!

—একশ' বার আমরা বেস্ট!

পারুল রেস্টুরেন্টে আড্ডা যখন পুরোদমে জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় পরিপাটি সেজেগুজে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গোপাল মুখুজ্যে ঢুকতেই সবাই হই হই করে উঠলেন। হই হই করে ওঠার অবশ্য কারণ ছিল।

গোপালবাবুর বাড়ি হাওড়ার কালীবাবুর বাজারে পিছনে। ওখানেই ওঁর সংসার। চাকরি করেন ভবানীপুরের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। তবে এই ব্যাঙ্কের মাইনে দিয়ে ওঁর সংসার চালাতে হয় না। কবিরাজ দাদুর মকরধ্বজ চ্যবনপ্রাশের কৃপায় সংসার ভালভাবেই চলে। এছাড়া দু'টো বস্তির আয় আছে। সুতরাং দাদুর স্নেহধন্য গোপাল ভবানীপুরের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের টাকাটা এই ভবানীপুরের পারুল রেস্টুরেন্টেই দিয়ে যান। বন্ধুবান্ধব ইয়ার-দোস্তরা ওঁকে ভালবাসবেন না কেন?

আজকে হই হই করার আরো কারণ আছে। গোপালের শ্বশুরমশাই শুধু দিল্লিবাসীই না, হোম ডিপার্টমেন্টের আপার ডিভিসন ক্লার্কও। সুতরাং ওঁর রাজভক্তি সম্পর্কে স্বয়ং ভাইসরয় পর্যন্ত ওয়াকিবহাল এবং খুশি। বছরের অর্ধেক সময় দিল্লি, অর্ধেক সময় সিমলায় কাটান। ভাইসরয় গরমকালে সিমলা গেলে হোম ডিপার্টমেন্টের এই চির অনুগত জীবটিকেও তাঁর অনুগমন করতে হয়। একি কম সম্মান ও সৌভাগ্যের কথা? এ হেন প্রাতঃস্মরণীয় শ্বশুরের বাড়িতে মাস খানেক কাটিয়ে গোপালবাবু আজই প্রথম এই আড্ডায় আসরে হাজির।

নরেন ঘোষাল চিৎকার করে বলেন, এই পঞ্চা! গোপালদার নামে সবাইকে একটা করে ফাউল কাটলেট দে!

পাঁচ

কথায় আছে, দুঃসংবাদ হাওয়ার উড়ে আসে। ঠিক তেমনি গোপন কথাটি বোধহয় সবচাইতে বেশি প্রচারিত হয়। দত্তবড়ির বড়বাবু থেকে ছোটবাবু পর্যন্ত পিতৃদেবের রক্ষিতাদের খবর কাউকে না বললেও কী করে যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল,তা ভগবানই জানেন।

শুধু তাই না। এইসব খবর যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনেক সময়ই আসল খবরটি চাপা পড়ে যায়, হারিয়ে যায়। যাঁরা এসব খবর জেনে ও শুনে রসবোধ করেন, তাঁরা কী একটু রং না চড়িয়ে থাকতে পারেন?

সেদিন মেজবাবু ঘরে ঢুকেই অবাক। স্ত্রীকে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কি গো,তুমি যে আগেই শুয়ে পড়েছে?

মেজবউ কোনো জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকেন।

কিগো, জবাব দিচ্ছ না যে! শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

না, তবুও মেজবউ কোনো জবাব দেন না।

হাত জোড় করে ঠাকুর-দেবতার ছবিতে প্রণাম করতে করতেই মেজবাবুর কানে আসে—রক্ষিতার ছেলের আবার ভক্তি! ঢং দেখে আর বাঁচি না।

কোনো মতে ঠাকুর-দেবতার ছবিতে প্রণাম করেই মেজবাবু স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী বললে?

কী বললাম, শুনতে পাওনি?

আবার একটু শুনি।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েই মেজবউ জবাব দেন, বলছিলাম, রক্ষিতার ছেলের আবার ভক্তি!

মেজবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কে আবার রক্ষিতার ছেলে?

ন্যাকামি করো না। সব জেনে গেছি। এখন আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে লাভ নেই। মেজবউ এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

মেজবাবু তখনো ঠিক বুঝতে পারেন না। বলেন, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

এবার মেজবউ উঠে বসে স্বামীর মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলেন, কেন আমার এই সর্বনাশ করলে সেই কথার জবাব দাও। কী ভেবেছ তোমরা? আমিও কি তোমাদের মতো রক্ষিতার পেটে জন্মেছি?

কথাটা শুনেই মেজবাবুর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। উনি ঠাস করে স্ত্রীর গালে একটা চড় মেরে বলেন, হারামজাদী, আমি রক্ষিতার ছেলে! দূর হয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।

ব্যস! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। চিৎকার-চেঁচামেচি-কান্নাকাটি শুনে প্রথমে বাড়ির বউরা, পরে সেজবাবু থেকে শুরু করে ছোটবাবু পর্যন্ত ছুটে আসেন। কে কার কথা শোনে? মেজবউ তারস্বরে চিৎকার করে শ্বশুর-শাশুড়ির নামে যা তা বলে যান। বাড়ির বউরা অবাক হয়ে এক-ওর মুখের দিকে তাকায়। বড়বউ তো হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মেজ, তুই একি দুঃসংবাদ শোনালি রে?

ঠিক এমন সময় বড়বাবু হাজির হতেই সবাই চুপ। বনবিহারী দত্ত জীবিত থাকার সময়ও এ বাড়িতে বড়বাবুর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। বনবিহারী দত্তকে সবাই সমীহ করতেন, ভয় করতেন, কিন্তু বড়বাবুকে সবাই ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। শুধু এ বাড়ির ছেলেমেয়ে-বউ-ঝিরাই না, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীরাও জানেন, বড়বাবু মিথ্যা কথা বলেন না, আজেবাজে কথাও বলেন না। তাছাড়া ওঁর মতো ব্যক্তিত্ব ক'জনের হয়? কোনো আলতু-ফালতু আজেবাজে ব্যাপারেও উনি কখনই নাক গলান না। তাইতো ওঁকে দেখেই একমুহূর্তে সব চিৎকার-চেঁচামিচি-কান্নাকাটি থেমে গেল। বড়বাবু কোনো ভূমিকা না করেই বলেন, মেজবৌমা, আমাদের মা, বাবার রক্ষিতা ছিলেন না, তিনি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীই ছিলেন। বাবার রক্ষিতা ছিল ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে এ সংসারের কোনো সম্পর্ক কোনো কালেই ছিল না, এখনও নেই।

উনি না থেমেই বলে যান, যদি বাবার ঐ রক্ষিতা সম্পর্কে কিছু জানতে চাও, তাহলে কাল সকালে তোমরা সবাই আমার ঘরে এসো।

এবার উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমি জীবিত থাকতে তোমাদের কারুর কোনো অমর্যাদা হতে আমি দেব না। এখন শুতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।

হ্যাঁ, পরের দিন সকালেই বড়বাবু বাড়ির সব বউ আর ভাইদের নিয়ে বসেছিলেন। বলেছিলেন, এ সংসারে অনেক কিছু জেনেও জানতে নেই ; বিশেষ করে যাঁরা গুরুজন আর স্নেহভাজন। তাই মানিকতলার জগত্তারিণী দাসী বাবার রক্ষিতা ছিলেন জেনেও আমি ঐ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাইনি।

বড়বাবু একটু থেমে বলেন, তাছাড়া আমার কোনো প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হতো, যদি বাবা আমার মা ও আমাদের প্রতি কর্তব্য পালন না করে শুধু তাঁর রক্ষিতার জন্যই সবকিছু...

সেজবাবু হঠাৎ বললেন, বাবা কর্তব্যপালন করেননি, এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

বড়বউ বললেন, সে কথা একশ'বার সত্যি।

বড় বাবু এবার বললেন, বাবা আমাদের জন্য যে বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি ও নগদ টাকা রেখে গেছেন, তার খবর তোমরা সবাই জানো। তবে হ্যাঁ, বাবা ঐ জগত্তারিণী দাসীর জন্যও বেশ কিছু টাকা রেখে গেছেন এবং সে টাকাও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করে দেননি।

বড়বাবু এবার মেজবউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, যে মানুষটা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন, দিবারাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য আর নিজের পরিবারের কথা ভেবেছেন, তিনি কি নিজের ইচ্ছা মতন কিছুই করতে পারেন না?

না, বড়বাবু এইটুকু বলেন থামলেন না। বললেন, বাবা যদি আমাদের পথে বসিয়ে তাঁর সর্বস্ব ঐ জগত্তারিণী দাসীকে দিয়ে যেতেন, তাহলে আমরা তাঁকে দোষারোপ করতে পারতাম, আমরা চোখের জল ফেলতে পারতাম কিন্তু তার বেশি কিছু করতে পারতাম না।

বড়বাবু রুচিবান মানুষ। তাই প্রত্যক্ষভাবে বললেন না, মেজবৌমার আপন বড় জ্যেঠাই তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি রক্ষিতাকে দিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে নিঃস্ব করে রেখে যান এবং ঐ ভদ্রমহিলাকে আর পাঁচজনের দয়ায় জীবন কাটাতে হচ্ছে। তবে বড়বাবুর কথার যুক্তি ও মর্ম সবাই বুঝলেন।

সব শেষ বড়বাবু বললেন, সব সংসারেই কিছু ভাল-মন্দ থাকে। আমাদের সংসারেও আছে। সেই ভাল-মন্দকে মেনে নিয়ে সংসারকে ভাল না বাসলে সংসার করাই নিরর্থক হয়ে যায়।...

মেজবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন।

...আমি আগেই ভাইদের বলেছি, এখন সব বৌমাদেরও আমি খোলাখুলি বলছি, সংসারে সবাই ক্ষমতা চায় ; মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বও থাকতে পারে কিন্তু যৌথ

পরিবার, যৌথ ব্যবসা চালাতে হলে সবাইকেই কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হয়।

সবাই এক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

উনি বলে যান, আমি তোমাদের কোনো কিছু ত্যাগ করতেও বলতে পারি না, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে সংসারে থাকতেও বলি না। তাই বলছিলাম, আমাদের যৌথ ব্যবসা বা যৌথ পরিবারের বদলে ভাগ-যোগ করে নেওয়াই বোধহয় সবার পক্ষে মঙ্গল হবে...অন্তত তাতে অশান্তি এড়ানো যাবে।

একমুহূর্তে সবার মুখের চেহারা বদলে গেল কিন্তু অন্য কেউ কিছু বলার আগেই মেজবউ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি আর বড়দিই তো আমাকে এ বাড়িতে এনেছিলেন। আজ আপনিই বলছেন চলে যেতে?

—না, না, বৌমা, আমি...

বড়ভাসুরের কথা যেন মেজবউয়ের কানেই যায় না। উনি কাঁদতে কাঁদতেই বলে যান, আমি অন্যায় করেছি বলে আমাকে শাসন করুন কিন্তু তাই বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন? ছোট ভাইবোন-ছেলেমেয়েরা অন্যায় করলে কি...

ওঁর কান্নাকাটি দেখে প্রায় সবার চোখেই জল এসে যায়। বড়বউ তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে ওঁর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলেন, নারে মেজ, তোরা কেউ কোথাও যাবি না। আমি কাউকে কোথাও যেতে দেব না। আমি না মরলে তোরা কেউ কোথাও যেতে পারবি না।

ছোটবাবু একটু হেসে বলেন, বাঁচালে বড়বৌদি, বাঁচালে। দাদাদের রোজগারে না খেতে পারলে গানবাজনার চর্চা করব কী করে?

সেজবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, তুইও তো আমাদেরই মতো একজন পার্টনার।

আমি পার্টনার? ছোটবাবু হো হো করে হেসে উঠেই বলেন, আমাকে গদিতে বসিয়ে দেখুন না কী কেলেঙ্কারী করি! উনি এবার হাসি থামিয়ে বলেন, বড়বৌদির হোটেলে বেশ আছি। আর আপনারা আমাকে গানবাজনার জন্য টাকাকড়ি দিচ্ছেন। আমার তো আর কিছুর দরকার নেই।

এইসব টুকটাক কথাবার্তার পর বড়বাবু একটু হেসে বললেন, মেজবৌমা, তুমি যে এই সংসারের কী উপকার করলে, তা আর কী বলব! যে সামান্য পাপটুকু আমাদের মনের মধ্যে জমেছিল, তা তোমার চোখের জলে সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হলো।

মেজবৌমা মুখ নিচু করে বলেন, একি কথা বলছেন আপনি? আমি তো বরং এই সংসারটা ভাঙতেই গিয়েছিলাম।

বড়বাবু পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, মেজবৌমা, এ দুনিয়ায় কেউ রাগে বা হিংসায় চোখের জল ফেলে না। শোখে-দুঃখে, আনন্দে-অঁভিমানেই মানুষ চোখের জল ফেলে। চোখের জলের চাইতে পবিত্র কিছু হতে পারে না।

বড়বাবু একটু থেমে ওঁর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হেসে বলেন, হোটেল বা

ধর্মশালা ছাড়তে কি কেউ চোখের জল ফেলে? নিজের ঘর-বাড়ি-সংসার ছেড়ে যাবার সময়ই মানুষ চোখের জল ফেলে। তুমি এই সংসারটাকে নিজের না ভাবলেই কি...

ওঁর কথাটা শেষ হবার আগেই বড়বউ বলেন, ঠিক বলেছ।

সেই রাত্রে মেজবউ তাঁর স্বামীকে বললেন, তোমরা জন্ম জন্ম তপস্যা করে এমন বড়দা আর বড়বৌদি পেয়েছ। সত্যি, ওঁদের মতো মানুষ আমি এ জীবনে দেখিনি, দেখবও না।

মেজবাবু মুখ টিপে হেসে বললেন, এ বাড়ির মেজবাবুও সাক্ষাৎ দেবতা।

চুপ করো! তোমার মতো পেটুক আর কামুক এ বিশ্ব-সংসারে দ্বিতীয় নেই।

পেটুক হয়েছি বড়বৌদির জন্য আর কামুক হয়েছি তোমার জন্য।

তা তো বটেই!

যাই হোক নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য একটু সামলে নেবার পর বড়বাবু একদিন ভাইদের ডেকে বললেন, আমার মনে হয় এবার একদিন জগত্তারিণী দাসী আর মিসেস উইলিয়ামসকে গিয়ে ওঁদের প্রাপ্য টাকাকড়ি বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল। কারণ টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কবে কোথায় কি গণ্ডগোল দেখা দেবে, তা কিচ্ছু বলা যায় না।

ওঁর কথা সবাই সমর্থন করলেন এবং তখনই ঠিক হলো আগামী রবিবার সকালে বড় তিন ভাই গিয়ে ওঁদের সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন।

রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্তর ছেলেরা এসেছে শুনেই মিসেস উইলিয়ামস প্রায় ছুটে এসে ওদের অভ্যর্থনা করলেন, প্লিজ কাম ইন, মাই সনস্।

তারপর ড্রইংমে ওদের বসিয়েই বললেন, ইওর ফাদার ওয়াজ এ গ্রেট ম্যান! এ গুড ফ্রেন্ড অ্যান্ড এ ভেরি অনেস্ট ম্যান!

ওঁরা চুপ করে মেমসাহেবের কথা শোনেন।

মেমসাহেব বলেন, আমার উচিত ছিল তোমাদের সঙ্গে দেখা করা বাট মাই ডটার ওয়াজ হিয়ার উইথ হার কিডস্। সেজন্য আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে.....

বড়বাবু বললেন, না, না, এর জন্য এত বলার দরকার নেই।

কিন্তু কর্তব্যচ্যুতি তো অন্যায়! এবং সে অন্যায় করেছি।

মেমসাহেবের কথা শুনে ওঁরা যেন একটু অবাক হন কিন্তু কেউই কোনা কথা বলেন না।

মিসেস উইলিয়ামস একটু হেসে বলেন, তোমাদের বাবা আমার স্বামী ও আমার

দু'জনেরই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং উনিই আমাদের স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে দিতেন।

মেমসাহেবের কথা শুনে ওঁরা তিনজনেই একটু হাসেন এবং বড়বাবু বলেন, তাই নাকি?

তবে আর বলছি কী? মেমসাহেব একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, রায়বাহাদুর বহুভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং ওঁর সাহায্যের কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। বিশেষ করে আমার স্বামী মারা যাবার পর উনি যে আমার জন্য কী করেছেন, তা মুখে বলে শেষ করা যাবে না।

মিসেস উইলিয়ামস এবার বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, বন্ধু হিসেবে আমরাও তোমার বাবাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করছি।

এবার উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন স্বগতোক্তি করেন, আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, কেউ কেউ অত্যন্ত নোংরা কথাও বলেছে, কিন্তু আমি জানি, রায়বাহাদুর কত ভাল মানুষ ছিলেন।

রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্ত আর মিসেস উইলিয়ামসকে নিয়ে যে নানা মহলে সরস আলোচনা হতো, তা বড়বাবু খুব ভাল করেই জানেন, কিন্তু আজ মেমসাহেবের কথাবার্তা শুনে কেমন যেন একটু খটকা লাগে। যাই হোক, উনি মনের ভাব মনে রেখেই বলেন, আমরা একটু এসেছিলাম আপনার কাছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো কী কাজ।

বড়বাবু কোনো কথা না বলে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের একটা চিঠি ওঁর হাতে দেন। মিসেস উইলিয়ামস চিঠিটা পড়েই প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, নো, নো, আই কান্ট টেক দিস মানি।

বড়বাবু হেসে বলেন, আপনি এ টাকা না নিলে কে নেবে? বাবা তো এখন বেঁচে নেই যে...

লুক হিয়ার মাই বয়, মেমসাহেব ওঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমরা বন্ধু ছিলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি কিন্তু তার সঙ্গে টাকাকড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু...

না, না, কোনো কিন্তু না। মিসেস উলিয়ামস একটু হেসে বলেন, রায়বাহাদুর বহুবার আমাকে টাকাকড়ি দিতে চেয়েছেন কিন্তু আমি নিইনি। বন্ধুর ব্যবসায় সাহায্য করে কি কমিশন নেওয়া যায়?

এবার মেজবাবুই প্রথম কথা বলেন, বান্ধবী হিসেবে আপনি আমার বাবাকে সাহায্য করেছেন ঠিকই কিন্তু বিজনেসম্যান হিসেবে তাঁরও তো কিছু কর্তব্য আছে।

মেমসাহেব মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, তোমরা যতই আমাকে বোঝাও, আমি

একটি পয়সাও নিতে পারব না। উনি একটু গলা চড়িয়েই বলেন, তাছাড়া টাকা নিয়ে আমি কী করব? আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। পাঁচ বছর-সাত বছর পর একবার এখানে আসবে। আর আমার নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আমার আছে।

ওঁরা তিন ভাই মিলে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করার পর মেমসাহেব বললেন, ঠিক আছে, আমি এই টাকা নিয়ে তোমাদের স্ত্রীদের দিয়ে দিচ্ছি।

মেমসাহেব একটু থেমে একটু হেসে বলেন, এই টাকা থেকে তোমরা কেউ একটি পয়সা নিলে আমার কাছে বকুনি খাবে।

মেমসাহেবের কথা শুনে ওঁরা তিন ভাই হেসে ওঠেন।

হাসছ কী? আমি ঠিকই বলেছি। এই টাকা নিয়ে ওরা যা ইচ্ছে করুক কিন্তু তোমরা ওদের কিছু বলতেও পারবে না, একটি পয়সাও নিতে পারবে না।

মেমসাহেবের কাণ্ড-কারখানা দেখে ওঁরা অবাক হয়ে যান। তিনজনের মনেই সন্দেহ হয়, এই মহিলা কি পিতৃদেবের...

না, না, তা সম্ভব নয়। যার মধ্যে এই মনুষ্যত্ব, এই উদারতা আছে, তার কি চরিত্রে কোনো কলঙ্ক থাকতে পারে?

ও বাড়ি থেকে বেরুবার পরই সেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বড়দা, মেমসাহেবকে আপনার কেমন লাগল?

বড়বাবু একটু হেসে বললেন, শুধু ভাল লাগেনি, মেমসাহেবকে আমার মায়ের মতোই...

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মেজবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন! সত্যি শ্রদ্ধা করার মতো মহিলা।

সেজবাবু বললেন, আমার তো মনে হয়, এই মহিলার সঙ্গে বাবার কোনো অন্যায় সম্পর্ক কখনই ছিল না।

বড়বাবু বললেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এরপর মাসখানেক ওঁরা সবাই নানা কাজে এমনই ব্যস্ত রইলেন যে জগত্তারিণী দাসীর কাছে যাওয়া সম্ভব হলো না। বিশেষ করে রাজশাহী, রংপুর আর সিলেটের তিনটে বড় বড় ব্রিজ তৈরির ব্যাপারে কিছু ঝামেলা সামলাতে দু'ভাইকে বেশ কিছুদিন কলকাতার বাইরে থাকতে হলো। যাই হোক মাস দেড়েক পর বড়বাবু আর মেজবাবু একদিন জগত্তারিণী দাসীর ওখানে গিয়ে হাজির।

জগত্তারিণী দাসী মহাসমাদরে ওঁদের অভ্যর্থনা করে বললেন, এসো, বাবা, এসো। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই বলেন, এমন কপাল করেই জন্মেছি যে এতকাল পর

তোমরা ছেলে হয়েও মাকে দেখছ এই প্রথম।

ওর কথা শুনেই দু'ভাই একবার পরস্পর পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে পারেন না।

জগত্তারিণী ওদের দিকে না তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চড়া গলায় ডাকেন, ওরে দুর্গা, ওরে শিবানী, কোথায় গেলি তোরা? এদিকে আয়। তোদের দাদারা এসেছে।

মহিলার কথা শুনে দু'ভাই একটু অবাক না হয়ে পারেন না।

পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে আসতেই জগত্তারিণী বললেন, ওরে পেন্নাম কর। এরা তোর দাদা!

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে ওঁদের দিকে তাকাতেই জগত্তারিণী আবার বলেন, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কিরে? ওরে, তোদের তিনজনের শরীরেই একই রক্ত আছে রে! উনি প্রায় নিঃশ্বাস না ফেলেই বলেন, দুর্গা হতচ্ছাড়ি আবার কোথায় গেল?

শিবানী কোনোমতে একজনকে প্রণাম করতে যেতেই ওঁরা দু'ভাই এক সঙ্গে বলে ওঠেন, থাক, থাক, প্রণাম করতে হবে না।

কেন বাধা দিচ্ছ বাবা? সৎ ভাইবোন আর সহোদর ভাইবোনদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? জগত্তারিণী একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, সবই তো এক গাছের ফল।

ওর কথাবার্তা শুনে দু'ভায়ের গা জ্বলে যায় কিন্তু মুখে কিছু বলে না। শিবানীও একমুহূর্ত না দাঁড়িয়ে প্রায় দৌড়ে ভিতরে চলে যায়।

ওরে হারামজাদী, চলে গেলি কোথায়? বিষ্টুর মাকে বল, একটু চায়ের জল চাপাতে আর...

ওর কথাটা শেষ হবার আগেই বড়বাবু বলেন, আমরা সকালে চা খেয়েছি। এখন আর চা-টা খাব না।

তাই কি হয় বাবা? জগত্তারিণী ওদের দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, তোমরা কি আমার পর বাবা? নিজে পেটে ধরিনি বলে কি আমি তোমাদের মা না?

জগত্তারিণী দাসী শুধু বড়বাবু-মেজবাবু না, প্রায় ছোটবাবুর বয়সী। বড় জোর তাঁর চাইতে সমান্য বড়। কামনার জ্বালা মেটাবার জন্যই যে মানুষ রক্ষিতা রাখে, তা ওঁরা খুব ভালভাবেই জানেন। শুধু তাই না, কোনো বুদ্ধিমান মানুষই বয়স্কা রক্ষিতা রাখে না, তাও ওঁরা জানেন। তাই পিতৃদেবের এই রক্ষিতার মুখে মাতৃস্নেহের বুলি শুনে ওঁরা দু'জনেই মনে মনে বিরক্ত বোধ করে।

শুধু বিরক্ত কেন, ঘৃণাও বোধ হয়। কলকাতা শহরটা এখন আর অন্ধকার যুগে পড়ে নেই। সেই কোম্পানির যুগে সাহেবসুবোরা যেমন নিছক ফুর্তির জন্য একাধিক হিন্দুস্থানী রক্ষিতা পুষতেন, তেমনি তাদের স্নেহধন্য কিছু মানুষও রক্ষিতা রাখা মর্যাদার লক্ষণ বলে

বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সেই কলকাতা তো কোথায় হারিয়ে গেছে। কলকাতার রাস্তায় পালকি তো দূরের কথা, ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়িও এখন আর দেখা যায় না। আরো কত কি বদলে গেছে! বাঙালিরা যে সাহেবসুবোদের জুজুর মতো ভয় করতো, সেই বাঙালিরাই ক'বছর আগে স্বয়ং লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে লড়াই করল। এককালে সাহেবদের কিছু মুষ্টিমেয় প্রিয়পাত্র ও মোসাহেবরাই কলকাতার বাঙালি সমাজে গণ্যমান্য বিবেচিত হতেন কিন্তু এখন তাঁরা ঘৃণার পাত্র না হলেও নিশ্চয়ই সম্মানিত বা শ্রদ্ধেয় না। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙালিরা এখন উমেশ বাঁড়ুজ্যে-সুরেন বাঁড়ুজ্যে-রবিবাবুর মতো মানুষের মুখ চেয়ে থাকে। তাছাড়া সিমলে পাড়ার নরেন দত্ত দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণের পাল্লায় পড়ে কী কাণ্ডটাই করল! আরো, আরো, কত কি ঘটে গেল এই কলকাতার বুকে। আগে নাটক দেখা মানেই গোল্লায় যাওয়া মনে করতেন সবাই। আর এখন? গিরিশ ঘোষের নাটকে দানীবাবুর অভিনয় না দেখা মানেই জীবন ব্যর্থ!

বনবিহারী দত্তর ছেলেরা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করেনি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যোগ দেয়নি। তা হোক। তারা তো কলকাতাতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। এখানেই তাদের কাজ-কারবার। তাই আর কিছু না হোক, তারা কোনো মানুষেরই রক্ষিতাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না—এমনকি এই জগত্তারিণী দাসীকেও তারা মনে মনে ঘৃণাই করে, কিন্তু সেই ঘৃণার ভাব প্রকাশ না করেই বড়বাবু বলেন, আজ আমরা একটা জরুরি কাজে এসেছি। তাছাড়া আমাদের এখুনি দোকানে যেতে হবে।

কাজ তো সবারই আছে। তাই বলে কি.....

বড়বাবু ওঁর কথার জবাব না দিয়ে জমি আর ব্যাঙ্কের কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেন, বাবা আপনাকে কিছু সম্পত্তি আর কয়েক লাখ টাকা দিয়ে গেছেন। কোন টাকা দিয়ে কি কাজ করতে পারবেন, তা বাবা ব্যাঙ্ককে জানিয়ে গেছেন।

জগত্তারিণী কাগজগুলো হাতে নিয়েই বলেন, মোটে চার লাখ রেখে গেছে?

মেজবাবুর ইচ্ছা করে মহিলার গালে একটা চড় মেরে বলতে. তোমার চোদ্দ পুরুষ কোনোদিন চার লাখ টাকা চোখে দেখেছে? কিন্তু জিভের গোড়ায় এসেও কথাটা বলতে পারলেন না। তবে বললেন, বাবা যা রেখে গেছেন, তাই আপনি পেলেন। আপনার ভাগ থেকে আমরা একটা পয়সাও নিইনি।

কর্তা যে আমায় কথা দিয়েছিল, আমার জামাইরা ব্যবসার শেয়ার পাবে।

তেমন কোনো কথা তাঁর উইলে নেই।

উইলে নেই বললেই তো হবে না বাবা! তোমাদের ভাইবোনের মতো এই মেয়ে দুটোও তো তাঁরই সন্তান। জগত্তারিণী একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, সব ব্যবসা-বাণিজ্যই তোমরা ভোগ করবে, তাই কি হয়?

এবার বড়বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, বাবার উইলের কপি আপানাকে পাঠিয়ে দেব। তাছাড়া ব্যাঙ্কের কাগজপত্র তো দিয়েই গেলাম। একজন ভাল উকিলকে দেখিয়ে

নিলেই.....

শুনেছি, উইল তো জালও হয়।

সন্দেহ হলে মামলা করবেন।

ব্যস! আর একটি শব্দ উচ্চারণ না করে ওঁরা দু'ভাই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন।

সেইদিন রাত্রেই বড়বাবু সব ভাইদের কাছে সকালের ঘটনা জানাবার পর বললেন, ঐ কথাবার্তা শুনেই মনে হলো উনি কিছু গণ্ডগোল করবেনই।

মেজবাবু বললেন, ওর ন্যাকামি দেখে তো আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল।

বড়বাবু অত্যন্ত চিন্তিত ও গম্ভীর হয়ে বললেন, মনে আমাদের যত রাগ-দুঃখই থাক, এখন আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

প্রায় সবাই এক সঙ্গে বললেন, সে তো একশ'বার।

আমরা যদি সবাই এক থাকি, তাহলে কেউই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। বড়বাবু মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, একদিকে আমাদের যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ষোল আনা নজর দিতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিপদ আসার আগেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

ন'বাবু বললেন, বড়দা, আপনি যা বলবেন, আমরা সবাই তাই করব—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সেজবাবু বললেন, তবে বড়দা, আমি বলে দিচ্ছি, আমরা পথের ভিখারি হতে রাজি কিন্তু ঐ বদমাইশ মহিলার কাছে হেরে যেতে রাজী নই।

ছোটবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন সেজদা। ঐ অতখানি জমি আর চার লাখ টাকা পেয়েও যে জাল দলিলের কথা বলে, তার কাছে দত্তবাড়ির ছেলেরা কিছুতেই হেরে যাবে না।

বড়বাবু একটু হেসে বললেন, তোমাদের মনের কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু আমরা সবাই যদি একটু বেশি পরিশ্রম করি, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যও ঠিক চলবে আবার দরকার হলে কোর্ট-কাছারিও করা যাবে।

উনি একটু থেমে বলেন, যাই হোক, আমি কালই হেমেনকাকার কাছে যাব। যদি দরকার হয়, তাহলে হেমেনকাকাকে নিয়ে সোজা সি. আর. দাশকে গিয়ে ধরব আমাদের এই মামলার জন্য।

মেঝবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক বলেছেন।

হাজার হোক উনিও তো আমাদের এই ভবানীপুরেরই লোক। হেমেনকাকা আর আমি গিয়ে [illegible] উনি নিশ্চয়ই না বলতে পারবেন না।

বড়বাবুর কাছে সব শোনার পর ও সব কাগজপত্র দেখে হেমেনকাকা দু'চারটে লাল মলাটের আইনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করে বললেন, শোন দুর্গাপদ, আমার মনে হয় না জগত্তারিণী দাসী মামলা করে কিছু করতে পারবেন। তাছাড়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তো উইল ও চিঠিপত্র দেখেশুনেই এই টাকার কথা তোমাদের বলেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাছাড়া কালীপদ, শ্যামাপদ, শিবপদ বা গুরুপদও তো উইল মেনে নিয়েছে।

তারা তো মেনে নিয়েছেই।

বৃদ্ধ উকিল হেমেন সেন এবার ওঁর দিকে তাকিয়ে কললেন, তবে কিচ্ছু চিন্তা নেই। ভাল করে ব্যবসা-বাণিজ্য করো। জগত্তারিণী যদি কিছু করে, তখন এসো। যা করার তা আমিই করব।

সংসারে অক্ষম, ছোট, দরিদ্র হবার সমস্যা অনেক। বিপদ অনেক। কিন্তু দশজনের একজন হলে, ধনী হলে বা কোনোকিছু বড় করলেও কম সমস্যা ও ঝামেলা সহ্য করতে হয় না। অতি সাধারণ মানুষের ক'জন শত্রু থাকে? বড় জোর দু'চারজন, কিন্তু ধনী, রাষ্ট্রনায়ক বা রাজা-উজিরের অসংখ্য সমালোচক ও শত্রু থাকবেই। শত্রুর সংখ্যা থেকেই জানা যায়, বোঝা যায় মানুষটি সাধারণ না অসাধারণ।

যে যাই বলুক, রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্ত নিশ্চয়ই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ধন-মান-ঐশ্বর্যের অধিকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রুও নেহাত্ত কম ছিল না। স্বয়ং লেফটেন্যান্ট গভর্নর রায়বাহাদুরকে বাংলাদেশের নানা জেলায় ব্রিজ তৈরির ভার

দিতেই কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী আর সহ্য করতে পারলেন না।

আচ্ছা জগত্তারিণী, তুই আমাকে সত্যি ভালবাসিস?

কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরীর কথা শুনে জগত্তারিণী না হেসে পারে না। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সেই ষোল বছর বয়সে যে তুমি আমার প্রথম সব্বনাশ করলে, তারপর কি আমি আর কোনো পুরুষের দিকে ফিরে তাকিয়েছি?

চৌধুরীমশাই ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলেন, তুই না তাকালে কী হয়, তোর দিকে তো অনেকেরই নজর।

জগত্তারিণী ঠোঁট উল্টে বলে, আমি কি সেই কচি মেয়েটা আছি? তারপর একটু তির্যক দৃষ্টিতে চৌধুরীমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এখন এই বয়সেও যদি পুরুষরা আমার দিকে নজর না দেয়, তাহলে আর কবে দেবে?

চৌধুরীমশাই একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে জগত্তারিণী, বনবিহারী দত্তকে তোর কেমন লেগেছে রে?

কোন দত্ত?

বনবিহারী দত্ত।

সে আবার কে?

ঐ যে গতবার পুজোর পর আমি যখন তোকে নিয়ে ঘোষালদের বাগানবাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে যে লোকটা তোকে আর ঘোষালবাবুর মাগীকে একশ' টাকা করে...

জগত্তারিণী এবার মানুষটাকে চিনতে পেরেই বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

লোকটাকে তোর কেমন লেগেছিল?

তোমার আর ঘোষাল মশাইয়ের মতো বদমাইশ না, বেশ ভদ্দর...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চৌধুরীমশাই এক গাল হাসি হেসে বলেন, তুই আমাদের বদমাইশ বললি?

জগত্তারিণী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, ভুলে গেলে সে রাত্তিরের কথা? দু'জনে কি নষ্টামি-দুষ্টুমিই করেছিলে!

যাই হোক, এই কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী পাকে-চক্রে জগত্তারিণীকে বনবিহারী দত্তর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন কিন্তু নেপথ্যে ওদের দু'জনের সম্পর্ক ঠিকই থাকল। একটু বেশি বয়সে বনবিহারী দত্তর নারীপ্রীতি বেড়েছিল ঠিকই কিন্তু তার জন্য তিনি কোনোদিনই নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপেক্ষা করেননি। কাঁচা বয়সের জগত্তারিণীর কাছে নিয়মিতই যাতায়াত করতেন কিন্তু কোনোদিনই দু'এক ঘণ্টার বেশি থাকতেন না। সব কাজই উনি ঘড়ি ধরে হিসেব-নিকেশ করে করতেন।

মাঝে মাঝে জগত্তারিণী কত ন্যাকামিই করতো! বনবিহারী দত্ত মাসোহারার টাকা দিলেই বলতো, থাক, থাক, আমাকে টাকা দিতে হবে না। মথুরাপুরের ঘোষবাড়ির মেয়ে

আমি। আমাকে নিজের সংসারে নিয়ে শাঁখা-সিঁদুর দিলেই...

বনবিহারী দত্ত একটু চাপা হাসি হেসে বলতেন, এটা কি তোমার সংসার না? তুমি যেখানে থাকবে, সেখানেই তোমার সংসার।

না, না, এটা আমার সংসার হবে কেন? তুমি যেখানে থাকো, সেখানেই আমার সংসার। জগত্তারিণী একটু থেমে বলেছিল, তোমার টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ঘর-সংসার স্বামী-ছেলেমেয়ের সব রসই বড়বউ ভোগ করবে? এইসব কিছুর উপরই কি আমার কোনো দাবি নেই?

বনবিহারী দত্ত সাফ দবাব দিয়েছিলেন, দেখো জগত্তারিণী, তোমাকে সবকিছু দেবার দায়িত্ব আমার না, এ কথা কেন ভুলে যাও?

হ্যাঁ, জগত্তারিণী দাসী শেষ পর্যন্ত রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্তের পাঁচ ছেলের নামে মামলা করে বিষয়-সম্পত্তি ব্যবসা বাণিজ্যের আট আনা অংশ দাবি করেছিল। জগত্তারিণীর উকিল বিচারককে বলেন, ইওর অনার, আমার মক্কেল শ্রীমতী জগত্তারিণী দাসী রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্তর বৈধ এবং বিবাহিত স্ত্রী।

আপনি ঠিক জানেন মিঃ রায়?

ইয়েস ইওর অনার।

আপনি কি এই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন?

বিচারকের প্রশ্ন শুনেই কোর্টরুমের অনেকেই হাসি চাপতে পারেন না।

মিঃ রায় জবাব দেন, না ইওর অনার, আমি নিজে বিয়ের সময় উপস্থিত না থাকলেও অন্যেরা তো ছিলেন।

তাদের আপনি সাক্ষী হিসাবে হাজির করবেন তো?

নিশ্চয়ই!

ভেরি গুড মিঃ রায়।

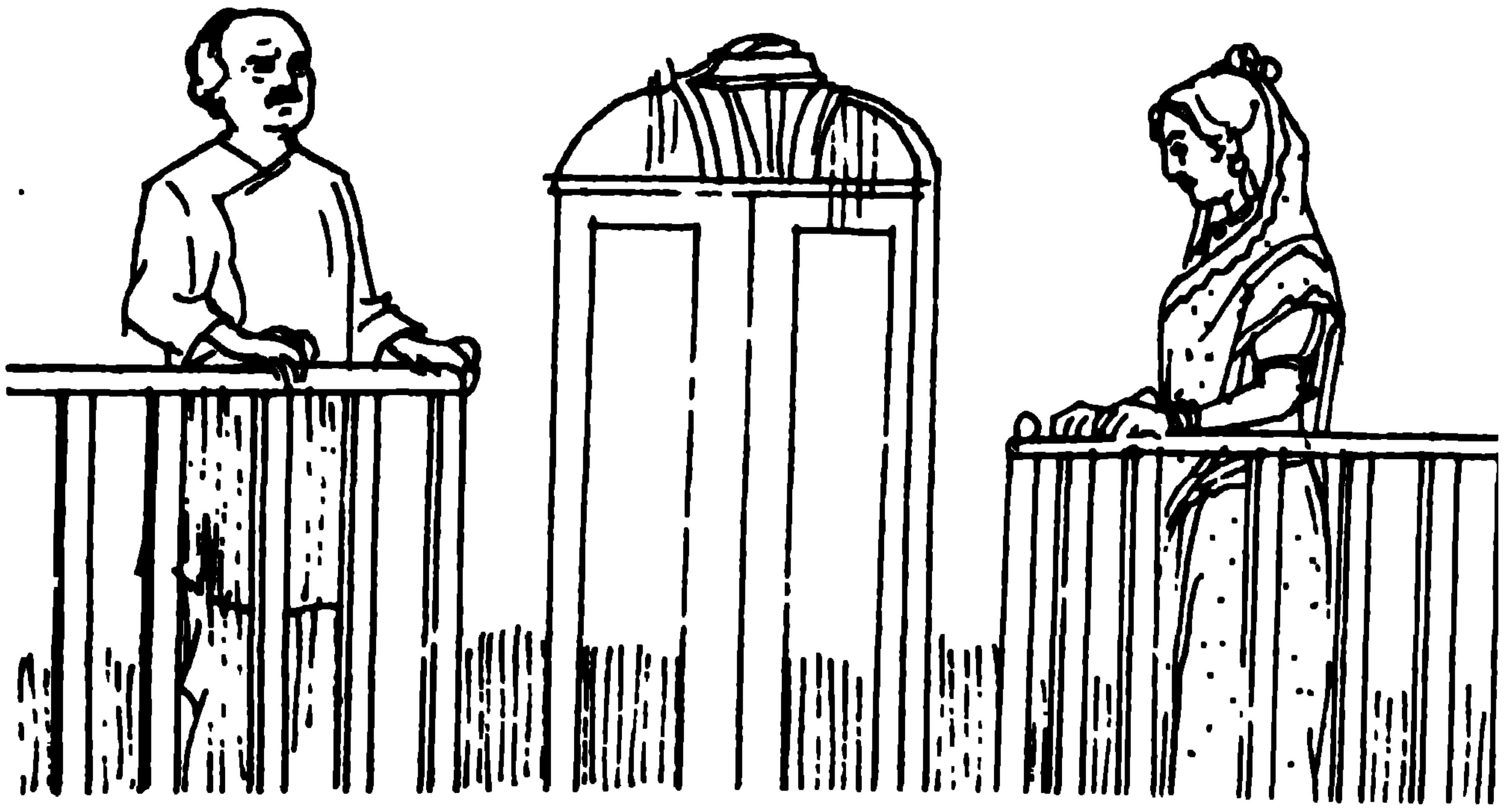

জগত্তারিণীর উকিল প্রথম যে সাক্ষী উপস্থিত করেন তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জ্ঞান ভট্চাজ। পৌরোহিত্য করাই তাঁর পেশা হলেও দু'চারজন ছাত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান। ঈশ্বরের নামে শপথ করে ভট্চাজমশাই হাকিমকে বলেন, হ্যাঁ, বনবিহারী দত্তের সঙ্গে জগত্তারিণীর বিবাহে উনিই পৌরহিত্য করেন এবং সবিস্তারে সেই বিবাহ উৎসবের বর্ণনা দেন।

জ্ঞান ভট্টাচার্জের সাক্ষ্য শুনে কোর্টরুমের কতজনের কত হাসাহাসি! চাপা গলায় কতজনের কত কটু মন্তব্য। কোর্টরুম থেকে বেরুতে না বেরুতেই কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী বড়বাবুকে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন, দুর্গাপদ, তুমি জানো আমি তোমার পিতৃবন্ধু। ভাল-মন্দ অনেক কিছুই দু'জনে মিলে করেছি। সত্যি কথা বলতে কি এই বিয়ের আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

বড়বাবু কোনো ভাবাবেগ প্রকাশ না করে ওঁর কথা শোনেন।

...তাই বলছিলাম, তোমাদের যখন কম নেই, তখন ভাগ-যোগ করে নিলেই তো সব মিটে যায়। শুধু তোমার বাবা কেন. লক্ষ লক্ষ লোকের দুটো-তিনটে বিয়ে থাকে। সেটা তো দোষের কিছু নয় বাবা!

না, বড়বাবু এবারও কোনো কথা বলেন না।

চৌধুরীমশাই বলে যান, কোর্ট-কাছারি মামলা-মোকদ্দমা মানেই কেলেঙ্কারি আর টাকার ছাদ্য! হেমেন সেনের খাঁই তো আমি জানি। কোথায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে, তার তো ঠিক নেই!

উনি একবার মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোমাদের ভাইদের কথা আমি বাদই দিলাম কিন্তু বৌমাদের কথা একবার ভেবে দেখেছ কি? এইসব মামলা-মোকদ্দমা চললে ওরা সমাজে মুখ দেখাবে কী করে?

বড়বাবু একটি কথারও জবাব দিলেন না। সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরেই উনি বাড়ির

বউদের ডেকে বললেন, বড়বউ, এবার থেকে তোমরা বউরাও আমাদের সঙ্গে কোর্টে যাবে।

বড়বাবুর কথা শুনে বউরা অবাক হন। এ-ওর মুখের দিকে তাকান। ভাইরাও চুপ।

একটু থেমে বড়বাবু বললেন, সবাইকে দেখিয়ে দেবার দরকার আমরা সবাই এক।

কেউ কোনো প্রশ্ন না করলেও সবাই বুঝলেন, কোনো বিশেষ কারণেই বড়বাবু বাড়ির বউদের কোর্টে যেতে বলছেন।

পরের দিন হাকিম এজলাসে এসে বসেই বললেন, ইয়েস মিঃ রায়, আপনি জগত্তারিণী দেবীর পক্ষে সাক্ষীদের হাজির করতে পারেন।

হাকিমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মিঃ রায় সবার আগে একজন বৃদ্ধকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করলেন। প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ শুধু সত্য কথা বলার শপথ নেবার পরই মিঃ রায় তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনার নাম?

অভিলাষচন্দ্র ঘোষ।

আপনি জগত্তারিণী দাসীকে চেনেন?

চিনব না? ও আমার একমাত্র সন্তান।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ ; তবে বয়স হয়েছে বলে সব কথা মনে নেই।

জামাই-এর নাম মনে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্ত।

এবার মিঃ রায় হাকিমকে বললেন, ইওর অনার, আমার এই সাক্ষীর অনেক বয়স হয়েছে। তাই আমি ওঁকে আর প্রশ্ন করতে চাই না। বিরোধী পক্ষের উকিল ইচ্ছা করলে জেরা করতে পারেন কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করব, বৃদ্ধকে বেশি প্রশ্ন না করাই বোধহয় সমীচীন হবে।

এবার প্রবীণ আইনজ্ঞ হেমেনবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম কী অবিনাশচন্দ্র ঘোষ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোর্টসুদ্ধ সবাই সজোরে হেসে উঠতেন মিঃ রায় উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতেই হেমেনবাবু হাকিমকে বললেন, ইওর অনার, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিসটার্বড বাই এনি ওয়ান।

হাকিম সঙ্গে সঙ্গে বলেন, মিঃ রায়, আপনি বসুন।

মিঃ রায় তবু কী যেন বলতে চেষ্টা করতেই হাকিম একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,

মিঃ রায়, আদালতের কাজে বাধা দেবেন না। বসে পড়ুন।

মিঃ রায় বসতেই হেমেনবাবু সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা অবিনাশবাবু, আপনার বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞে মথুরাপুর।

সেখানেই থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি আর আপনার স্ত্রী ছাড়া সেখানে আর কে থাকে?

আজ্ঞে আমার স্ত্রী বহুদিন হলো গত হয়েছেন।

মেয়ের বিয়ের আগেই আপনার স্ত্রী মারা যান?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা অবিনাশবাবু, মথুরাপুরে হাই স্কুলে-পোস্ট অফিস তো আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা অবিনাশবাবু, মথুরাপুর কোন জেলায়?

কী বললেন উকিলবাবু?

অবিনাশবাবু, আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনাদের মথুরাপুর কোন জেলায়?

আজ্ঞে হুগলি জেলায়।

অবিনাশবাবু, এবার বলুন, মথুরাপুর থেকে কোর্টে এলেন কীভাবে?

আজ্ঞে রেলগাড়িতে।

এবার হেমেনবাবু হাকিমকে বললেন, ইওর অনার, সাক্ষী অবিনাশচন্দ্র ঘোষকে আমি আর কোনো প্রশ্ন করতে চাই না।

মিঃ রায় উঠে দাঁড়াতেই হাকিম বললেন, আপনার পরবর্তী সাক্ষীকে হাজির করুন।

ইওর অনার, আমার প্রথম সাক্ষীর ব্যাপারে কিছু নিবেদন ছিল।

সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান শেষ হবার পর আপনার সব নিবেদন শুনব। এখন পরবর্তী সাক্ষীকে হাজির করুন।

হাকিমের মনোভাব আন্দাজ করে মিঃ রায় কোনো তর্ক-বিতর্ক না করে দ্বিতীয় সাক্ষী হাজির করলেন।

আপনার নাম?

শ্রীকৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী।

আপনি জগত্তারণী দাসীকে চেনেন?

খুব ভাল করে চিনি।

আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কী?

উনি আমার বন্ধু রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্তর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং এই বিয়ের অনেক দায়িত্বই আমাকে পালন করতে হয়।

তাহলে বন্ধুপত্নী হিসাবেই জগত্তারিণী দাসীকে আপনি চেনেন?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

বিয়ের দিনের ঘটনা মনে আছে?

দিনের আলোর মতো সবকিছু মনে আছে।

কী মনে আছে বলুন তো!

কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী গড় গড় করে বিবাহ উৎসবের বিশদ বর্ণনা শোনাবার পরই মিঃ রায় হাকিমকে বললেন, ইওর অনার, এবার বিরোধী পক্ষের উকিল জেরা করতে পারেন।

হেমেনবাবু প্রথমেই ওঁকে প্রশ্ন করেন, মিঃ চৌধুরী, আপনি কি রায়বাহাদুরের সহপাঠী ছিলেন?

না, আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব...

মিঃ চৌধুরী, এটা কোর্ট। বাচালতা করার জায়গা না। যে প্রশ্নের যেটুকু জবাব, শুধু সেইটুকুই বলবেন। তার বেশি বকবক করবেন না। আপনি সহপাঠী ছিলেন না, সেইটুকু যথেষ্ট।

কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী মনে মনে অত্যন্ত অপমানিতবোধ করলেও নীরবে তা হজম করেন।

এবার হেমেনবাবু প্রশ্ন করেন, আপনিই কি এই বিয়ের ঘটকালি করেন?

হ্যাঁ।

অর্থাৎ জগত্তারিণী দাসী পরবর্তীকালে বন্ধুপত্নী হলেও তার সঙ্গে আগে থেকেই আপনার সবিশেষ পরিচয় ছিল।

কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁ ছিল।

আপনার দেশ কোথায়?

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে।

সেখানেই লেখাপড়া করেছেন?

হ্যাঁ।

ম্যাট্রিক পাশ করেছেন?

না।

আপনি বিবাহিত?

আপনার ক'টি ছেলেমেয়ে?

চার মেয়ে।

বড় মেয়ের বয়স কত?

তা তিরিশ-বত্রিশ হবে।

বিয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ।

বড় জামাইকে কত নগদ দিতে হয়েছিল?

পাঁচ হাজার।

সব মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

তিন মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

আপনি স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে কোথায় বেশি সময় থেকেছেন?

ওরা সবাই বহরমপুরে থেকেছে। আমি কলকাতা থেকে নিয়মিত যাতায়াত করেছি এবং এখনও করি।

বহরমপুরে কে ওদের দেখাশুনা করেন?

কাকারা আছেন, তিন ভাই আছে।

আপনি কলকাতায় থাকেন কেন?

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এখানে থাকি।

আপনার দোকান বা অফিস আছে?

না।

তাহলে কীসের ব্যবসা করেন?

সাপ্লাইয়ের।

কী সাপ্লাই করেন? ঘটকালি করে জগত্তারিণী দাসীর মতো দ্বিতীয় পক্ষের বউ সাপ্লাই করেন?

হেমেনবাবুর প্রশ্ন শুনে কোর্টঘরে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠেন। এমনকি হাকিম পর্যন্ত একটু চাপা হাসি না হেসে পারেন না। হাসতে পারেন না জগত্তারিণী দাসীর উকিল আর সাক্ষী স্বয়ং।

কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, হ্যাঁ, ঘটকালি করেও রোজগার করি। তাছাড়া নানা অফিসে মালপত্র সাপ্লাই দিই।

রায়বাহাদুরের সঙ্গে জগত্তারিণী দাসীর বিয়েতে কে আপনাকে টাকা দেন?

রায়বাহাদুর।

কত টাকা দিয়েছিলেন?

আড়াই হাজার।

কোন ব্যাঙ্কের চেক দিয়েছিলেন?

নগদ দিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর আপনার বন্ধু ছিলেন এবং আপনিই তাঁর বিয়ে দেন। আপনার স্ত্রী-কন্যারা সে বিয়েতে নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন?

না।

এবার হেমেনবাবু কোটের পকেট থেকে একটা ছবি বের করে সাক্ষীর সামনে এগিয়ে ধরে প্রশ্ন করেন, ঘোষালবাবুদের বাগানবাড়িতে তোলা এই ছবিতে আপনি যে মেয়েটিকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে অর্ধশায়িত আছেন, তিনিই কী জগত্তারিণী দাসী?

প্রশ্ন শুনে সবাই চমকে উঠলেন। কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী স্তম্ভিত। জগত্তারিণীর উকিলবাবুর মুখের রক্ত কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

হঠাৎ হেমেনবাবু সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন, জবাব দিন মিঃ চৌধুরী।

হ্যাঁ, উনিই জগত্তারিণী দাসী।

এবার হেমেনবাবু বলেন, মিঃ চৌধুরী, আপনার লেখা একটা চিঠি আপনাকে দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে এই চিঠিটা মহামান্য হাকিমকে পড়ে শোনান।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরীর চক্ষুস্থির। মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরোয় না। দু'চার মিনিট কেটে যাবার পর হেমেনবাবু ওঁর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে শুরু করেন—

মাই ডিয়ার ঘোষালমশাই, দোলযাত্রা তো আসিয়া গেল। জগত্তারিণী এখন হইতেই নাচিতে শুরু করিয়াছে। না করিবার কোনো হেতু নাই। গত দুই বৎসর দোলযাত্রার সময় আমি আর জগত্তারিণী আপনার বাগানবাড়িতে যে অফুরন্ত আনন্দ ও স্ফূর্তি করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহা কি ইহজীবনে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব? আশা করি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এইবারও দোলযাত্রা উপলক্ষে জগত্তারিণী আকণ্ঠ সুরাপান করিয়া আমাকে ও আপনাকে সমান আনন্দদান করিবে।

হেমেনবাবু একটু থেমে বলেন, ইতি—কলির কৃষ্ণ কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরী।

চিঠিখানা শুনে সবার মুখেই চাপা হাসি। হেমেনবাবু চিঠিখানা হাকিমের হাতে পেশ করে বললেন, ইওর অনার, সাক্ষীকে আমার আর কিছু প্রশ্ন করার নেই।

জগত্তারিণীর পক্ষে আরও কয়েকজন সাক্ষী হাজির করা হয় কিন্তু হেমেনবাবু তাদের কাউকেই কোনো প্রশ্ন করেন না। তবে মাননীয় হাকিমের কাছে নিবেদন করেন, ইওর অনার, আমি মাত্র দু'জন সাক্ষী হাজির করব। আমার প্রথম সাক্ষী একজন বৃদ্ধা।

একজন বৃদ্ধা বিধবা সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পরই হেমেনবাবু প্রশ্ন করেন, আপনার নাম?

বাবা, আমার নাম মোক্ষদা দাসী।

আপনি কবে বিধবা হয়েছেন?

তখন বোধহয় আমার বয়স সতেরো-আঠারো হবে।

আপনার স্বামীর নাম মনে আছে?

তা থাকবে না?

কী নাম ছিল তাঁর?

অ ভ-ইকার, র-আকার আর ম।

অভিরাম?

ঠিক বলেছ বাবা।

আপনার কোনো ছেলেমেয়ে হয়েছিল?

দুঃখের কথা কী বলব বাবা, একটা মেয়ে হয়েছিল কিন্তু একটা বদমাইশের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

আপনার মেয়ের নাম কী?

জগত্তারিণী।

হেমেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা মোক্ষদা দাসী হাকিমকে বলেন, বিধবা হবার পর ভাইদের কাছেই আশ্রয় পাই। স্বামী হারাবার দুঃখের কথা বাদ দিলে ভাইদের কাছে ভালই ছিলাম। মেয়েটাও লেখাপড়া শিখছিল। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠল। বয়সের তুলনায় জগত্তারিণীকে একটু বেশি ডাগর-ডোগর দেখাতো।

তারপর?

আমার মেজ ভাইয়ের এক মেয়ের বিয়ের সময় বরযাত্রীদের সঙ্গে একটা ছোকরা এসে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এমন মেতে উঠল যে সে আর বরযাত্রীদের সঙ্গে ফিরে গেল না। দিন দশেক পর ঐ হতচ্ছাড়া আমার মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

ঐ হতচ্ছাড়ার নাম কী?

কেষ্ট! কেষ্ট চৌধুরী।

আচ্ছা এটা কত বছর আগেকার কথা?

তখন ওর বয়স ঠিক ষোল।

আপনার মেয়ে খারাপ হয়ে গেছে, এ ধারণা হলো কী করে?

বাবা, মা হয়ে মেয়ের বিষয়ে সব কথা কি বলা যায়? তবে এইটুকু শুনে রাখো, কেষ্ট আমার মেয়েকে বিয়ে করে কিন্তু তা সত্ত্বেও ও নিজের বউকে বড়লোকদের বাগানবাড়িতে পাঠিয়ে বেশ মোটা টাকা রোজগার করেছে।

আপনি প্রমাণ দিতে পারেন?

একবার তো মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছিল। তাছাড়া কেষ্টর দাদা বিনোদকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবে।

জগত্তারিণীর উকিল একে জেরা না করেই ছেড়ে দিলেন।

এবার হেমেনবাবুর দ্বিতীয় সাক্ষী রায়বাহাদুর অনাদি ঘোষাল হাজির হয়ে বললেন, জমিদারির কাজকর্ম দেখাশুনা করার পর আমি যেটুকু সময় পাই, তা আমি সঙ্গীতচর্চায় ব্যয় করি। গানবাজনা শোনার জন্যই মাঝে মাঝে বড় বড় ওস্তাদ আর বাঈজীদের নিয়ে বাগানবাড়িতে আসর বসাই। কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই সেসব আসরে হাজির থেকেছেন।

কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?

ও আমার মোসাহেবী করে কিছু টাকাকড়ি পায়।

জগত্তারিণীকে চেনেন?

হ্যাঁ, ও কেষ্টর রক্ষিতা কিন্তু...

কিন্তু কী?

রোজগার করার মতো কোনো মুরোদ কেষ্টর নেই। তাই ও মাঝে মাঝেই এক একজন বড়লোককে ধরে এনে জগত্তারিণীকে ভিড়িয়ে দিয়ে কিছু টাকা আয় করতো।

এ ধরনের দু'চারজন বড়লোকের নাম বলতে পারেন?

তার মধ্যে একজন তো আমি নিজে!

রায়বাহাদুরের উত্তর শুনে সবাই হেসে ওঠেন।

বৃদ্ধ হেমেনবাবু একটু চাপা হাসি হেসে প্রশ্ন করেন আপনি, ছাড়া আর কাবুর নাম বলতে পারেন?

রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্ত।

মিঃ রায় এই সাক্ষীকে জেরা করেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু যেসব উত্তর আদায় করেছিলেন, তার দ্বারা ওঁর মক্কেলের কেচ্ছা-কাহিনী আরো নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

জগত্তারিণী দাসী মামলা করেছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত, রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্তর যে উইলটি তাঁর ছেলেরা ওকে দেখিয়েছেন, তা জাল এবং ওকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এই জাল উইলটি তৈরি করা হয়েছে। উনি এই উইলটি মানতে রাজি নন। দ্বিতীয়ত, উনি রায়বাহাদুরের বিবাহিতা স্ত্রী এবং সেজন্য রায়বাহাদুরের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক তাঁর প্রাপ্য।

মাননীয় হাকিম যে এই দুটি বিষয়েই মামলা বাতিল করেছিলেন, তা নয়। উপরন্তু তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ইহা দিনের আলোর মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে জগত্তারিণী দাসী একজন বারবণিতা ছাড়া আর কিছুই নহে এবং কৃষ্ণবিনোদ চৌধুরীর মন্ত্রণাতেই তিনি কলিকাতা মহানগরীর একটি বিশিষ্ট পরিবারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়া এই মামলা দায়ের করেন। রায়বাহাদুরের পুত্ররা এই দুইজনের বিরুদ্ধে অবশ্যই মানহানির মামলা দায়ের করিতে পারেন।

দুর্গাপদ অত্যন্ত গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। দেখে মনে হয়, সব সময় চিন্তিত। একমাত্র ছোট ভাইদের ক'টি ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ ওঁকে হাসতে দেখেন না। তবে সেদিন কোর্ট থেকে বেরুবার সময় ভাই আর বউদের বলেছিলেন, আজ আমাদের সত্যি আনন্দের দিন। তোমরা আজ যে যা চাইবে, আমি তাই দেব।

বড়বাবুর কথা শুনে সবার মুখেই হাসি।

দুর্গাপদ এবার বললেন, হেমেনকাকা কোর্টরুমের বাইরে বেরুলেই আমরা সবাই ওঁকে প্রণাম করব।

দু'তিন ভাই প্রায় এক সঙ্গেই বলেন, হ্যাঁ, সে তো একশ' বার! বড়বউ বললেন, সবার আগে আমরা চারজনে প্রণাম করব। তারপর তোমরা পাঁচ ভাই ওঁকে প্রণাম করবে।

একে একে ওঁরা সবাই প্রণাম করতেই হেমেনবাবু খুশির হাসি হেসে বলেন, আরে, আরে, তোমরা কী করছো?

দুর্গাপদ একটু হেসে বললেন, কাকাবাবু, শুধু আপনার দয়াতেই তো আমরা বেঁচে গেলাম।

হেমেনবাবু একটু হেসে বলেন, না, না, আমি কোনো দয়া করিনি। তোমার বাবাকে আমি দাদা বলে ডাকতাম; তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। তোমার বাবার মোটরগাড়ি চড়েই আমি প্রথম দিন কোর্টে এসেছি। তোমাদের প্রতি এটুকু কর্তব্য না করে কি থাকতে পারি?

মেজবাবু কালীপদ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা কাকাবাবু, ওরা যদি হাইকোর্টে যায়?

তাতে কোন লাভ হবে না। উনি একটু থেমে বললেন, আমার মনে হয় না ওরা হাইকোর্টে যাবে।

মামলা জেতার আনন্দে সন্ধেবেলায় কাঁসারীপাড়ার শিবমন্দিরে আর কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়া হলো। পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়িতে বড়বউ হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা পাঠালেন। বড় দু'ভাই পুজোর প্রসাদ আর দু'হাঁড়ি মিষ্টি দিয়ে এলেন হেমেনকাকার বাড়িতে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা মোটরগাড়ি চড়ে ইডেন গার্ডেন বেড়িয়ে এলো। একটু বেশি রাত্তিরে ভাই আর বউদের আসর বসল।

কিগো, যা চাইব, তাই দেবে তো? বড়বউ মিটমিট করে হাসতে হাসতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

দুর্গাপদ একটু হেসে বললেন, সবার আগে ন'বৌমাকে বলতে দাও। সব শেষে তোমার চান্স আসবে।

ঠিক আছে।

দুর্গাপদ বলেন, ন'বৌমা, বল তোমার কী চাই?

বড়বাবুকে এ বাড়ির সবাই ভয়ও করে, ভক্তিও করে। ওঁর কথা শুনে ন'বৌমা একটু হেসে লজ্জায় মুখ নিচু করেন।

কী হলো ন'বৌমা? বলো, তোমার কী চাই? দুর্গাপদ মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলেন, বড় দাদার কাছে কিছু চাইতে ছোট বোনেরা কী লজ্জা করে?

বড়বউ হাসতে হাসতে বলেন, ওরে বোকা মেয়ে, এমন সুযোগ আর পাবি না। বল কী চাই।

দুর্গাপদ আবার বলেন, তাছাড়া আজ আমাদের এত আনন্দের দিন। তোমাদের কিছু দিতে পারলে আমিই সব চাইতে বেশি আনন্দ পাবো।

ন'বৌমা মুখ নিচু করেই বলেন, পুরী যাবো।

নিশ্চয়ই যাবে। দুর্গাপদ সঙ্গে সঙ্গে ন'ভাইকে বললেন, শিবু, কাল সকালেই আমি তোকে টাকা দেব। কাল-পরশুর মধ্যেই তোদের টিকিট কাটবি। টিকিট কাটা হলেই ওখানকার খরচপত্তরের টাকাও পেয়ে যাবি।

এবার উনি শিবপদর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, শোনো বৌমা, তোমার হাতখরচের জন্য যে টাকা দেব, তার একটি পয়সাও শিবুকে দেবে না।

বড়ভাসুরের কথা শুনে ন'বৌমা না হেসে পারেন না।

বড়বউ বললেন, ওকে কত টাকা দেবে, তা বলে দাও।

আমি ওকে পাঁচশ'ও দিতে পারি, পাঁচ হাজারও দিতে পারি। তোমাদের সামনে বলব কেন? বড়বাবু হাসতে হাসতে বলেন, ন'বৌমা, তোমাকে আমি কত দেব, তা কাউকে বলবে না।

ওঁর কথায় সবাই হাসেন।

দুর্গাপদ একে একে সবাইকে প্রশ্ন করেন। যে যা চায় তাকে, তাই দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সব শেষে বড়বউকে জিজ্ঞেস করেন, এবার বল তোমার কী চাই?

বড়বউ চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, আমার চার বউ মিলে ঝগড়া করে ঠিক আনন্দ পাচ্ছি না। দু'এক মাসের মধ্যেই এই বাড়িতে একটা টুকটুকে সুন্দরী ছোট্ট বউ আনতে হবে।

ওঁর কথা শুনে সবাই হেসে ওঠেন।

গুরুপদ লজ্জায় দ্বিধায় কোনোমতে বলে, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না ছোট ঠাকুরপো। বড়বউ হাসতে হাসতে বলেন, তুমি শুধু মালাবদল করবে। ফুলশয্যা হবে তো আমার সঙ্গে।

বড়দার সামনে গুরুপদ আর একমুহূর্ত থাকতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুর্গাপদ বললেন, তোমাদের সবার যদি মত থাকে, তাহলে আমি আপত্তি করব কেন?

অন্য তিন বউ প্রায় একসঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড়দা, এবার ছোট ঠাকুরপোর বিয়ে দিন।

ঠিক আছে, তোমরা মেয়ে দেখতে শুরু করো। দুর্গাপদ একটু থেমে বললেন, শুধু মনে রেখো, মেয়েটি যেন তোমাদের মতোই ভাল হয়।

ন'বৌমা হাসতে হাসতে বলেন, যে মেয়েকে আমরা পছন্দ করেছি তাকে আপনাদের সবারই...

মেজবাবু কালীপদ বললেন, মেয়ে পছন্দ করা হয়ে গেছে?

বড়বউ বললেন, তোমাদের ভরসায় থাকলে তো ছোট ঠাকুরপোকে আইবুড়োই থাকতে হবে।

সেজবাবু শ্যামাপদ বললেন, ঠিকই বলেছ বড়বৌদি।

আনন্দের বন্যায় ভেসে যায় দত্ত পরিবার। পাড়ার সবার মুখেই এক কথা, দুর্গাপদর

মতো মানুষ হয় না। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের বুদ্ধি, সেইরকম কর্তব্যপরায়ণ ও স্নেহশীল। পাড়ার বুড়িরা বলেন, সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির। এর মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রঘাত!

কোর্টের সমন পেয়েই দুর্গাপদ চমকে উঠলেন। জগত্তারিণী টাকা পাননি?

মেজভাই কালীপদ একটু বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরলেও দুর্গাপদ তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

বড়, আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, বসো। দুর্গাপদ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ব্যাঙ্কের কাগজপত্রগুলো জগত্তারিণীকে পৌঁছে দিয়েছিলে?

প্রশ্ন শুনে কালীপদ একটু যেন চমকে ওঠেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন, উনি পাননি?

তুমি পৌঁছে দিয়েছিলে কি?

কালীপদ মুখ নিচু করে বলেন, সেদিন আমি একটু ব্যস্তও ছিলাম, তাছাড়া ওখানে যেতে ইচ্ছা করছিল না বলে সরকার বাড়ির ছোটকর্তার মারফত...

দুর্গাপদ খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝেছি। তারপর একটু থেমে বললেন, জগত্তারিণী মামলা করেছে।

মামলা করেছে?

করবে না কেন? উনি এক নিঃশ্বাসে বলে যান, আমরা যদি তার প্রাপ্য চার লাখ টাকা না দিই, তাহলে তিনি মামলা করবেন না?

কালীপদ মুখ নিচু করেই থাকেন। কোনো কথা বলেন না।

পরের দিন সকালে দুর্গাপদ সব ভাইদের সামনে মামলার সমনটা রেখে বললেন, আমি খোলাখুলিভাবেই তোমাদের জানাতে চাই, একজন বেশ্যা মামলা করে বলছে যে, আমরা তার প্রাপ্য চার লাখ টাকা মেরে দিয়েছি, এটা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মামলা লড়তে চাই না এবং জোর করে লড়লেও হেরে যেতে বাধ্য।

ন'ভাই শিবপদ বললেন, ব্যাঙ্ক বলছে, টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে অথচ জগত্তারিণী বলছে, সে টাকা পায়নি, এ তো ভারি মজার ব্যাপার।

দুর্গাপদ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার স্থির বিশ্বাস সরকার বাড়ির ছোটকর্তা কাউকে জাল জগত্তারিণী সাজিয়ে টাকাটা তুলে নিয়েছেন। ভুলেও যেও না, সরকার বাড়ির ছোটকর্তাই সাক্ষী হিসেবে ব্যাঙ্কের কাগজপত্রে সই করেছেন।

সব দেখে শুনে তাই তো মনে হচ্ছে। সেজভাই শ্যামাপদ বললেন।

এবার দুর্গাপদ মেজভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, কালী, ছোটকর্তা তোমাকে কত দিয়েছেন?

মেজবাবু মুখ নিচু করে বললেন, আমার শেয়ার থেকে চার লাখ জগত্তারিণীকে দিয়ে দেবেন।

এটা যৌথ পরিবার। লাভ-ক্ষতি যাই হোক, আমরা সবাই তা ভাগ করে নেব কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলতে বাধ্য, তোমার জন্যই এই সংসারটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

মেজবাবু আর বসতে পারলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, কালই হেমেনকাকাকে খবর দেবেন। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেই আমি চলে যাবো। আর ঐ চার লাখ টাকার জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না। আমি জগত্তারিণীর কাছে গিয়ে মিটমাট করে নেব।

মিটমাট মানে?

উনি যাতে মামলা তুলে নেন, তার ব্যবস্থা করবো।

মামলা তুলে নিলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্গাপদ সোজাসুজি বলেন, দু'জন বিশিষ্ট সাক্ষীর সামনে ওকে লিখে দিতে হবে, উনি টাকাটা ও জমির দলিলপত্র ঠিক মতো পেয়েছেন।

ঠিক আছে; তাই হবে। কালীপদ আর এক-মুহূর্ত দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

দুর্গাপদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, গিরীশবাবুর মতো আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

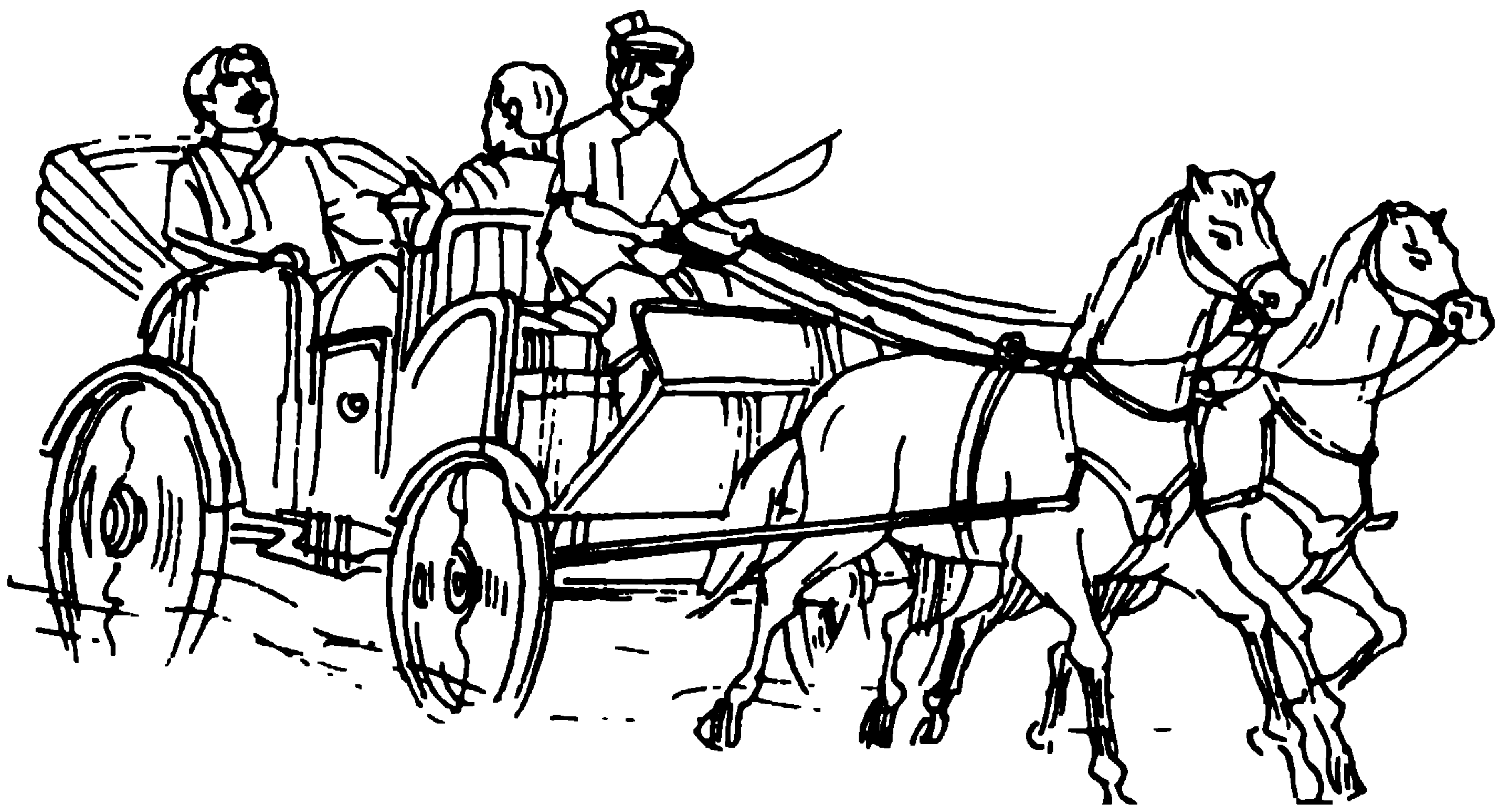

ছয়

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে অঘোরনাথকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই কণিকা জিজ্ঞেস করেন, কী হলো ছোট কাকা, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন?

বৃদ্ধ ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, দুঃখের কথা

কি জানো ছোট মা, মিষ্টি আমেই বেশি পোকা লাগে ; টক আমে কখনই পোকা পাবে না।

কণিকা চুপ করে এর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অঘোরনাথ একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, সত্যি বলছি ছোট মা, দত্তবাড়ি ভাঙছে দেখে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে।

এ পাড়ার প্রত্যেকটা পুরনো বাড়ি আর বাসিন্দাদের প্রতি আপনার খুব দুর্বলতা, তাই না ছোটকাকা?

উনি একটু এগিয়ে ইজিচেয়ারে বসতে বসতে বলেন, হ্যাঁ, ছোট মা, তুমি ঠিকই ধরেছ।

অঘোরনাথ একটু থামেন। আপন মনে কী যেন ভাবেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, হাজার হোক বিরাশি বছর আগে এই পাড়াতেই জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। এ পাড়ার প্রত্যেকটা পরিবার তো দূরের কথা, প্রত্যেকটা বাড়ির ইট-কাঠের সঙ্গেও আমার একটা সম্পর্ক আছে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে কণিকার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, আমার জীবনের সব চাইতে আনন্দের স্মৃতিগুলো তো এখানেই ছড়িয়ে আছে।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে ওঁর সামনে বসে কণিকাও একটু হাসেন। তারপর বলেন, সারাজীবন বাইরে বাইরে চাকরি করলেন কিন্তু সব আনন্দের স্মৃতিগুলো শুধু এখানেই ছড়িয়ে আছে?

হ্যাঁ, ছোট মা, সত্যিকার আনন্দের স্মৃতিগুলো শুধু এখানেই ছড়িয়ে আছে।

অঘোরনাথ একবার নিঃশ্বাস নিয়েই আবার বলেন, চাকরির জন্য পেশোয়ার-আম্বালা-দিল্লি-মীরাট বা এলাহাবোদে থাকলেও ছুটিতে সব সময় ছুটে এসেছি এই ভবানীপুরে। ছুটিতে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবতেই পারতাম না।

কণিকা বলেন, কিন্তু ছোট কাকা, অপনি এখন ভবানীপুরে থেকেও তো সব সময় মনমরা হয়ে তাকেন।

না, ছোট মা, সব সময় আমার মন খারাপ হয় না।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলে, তুমি আর নীতু আমাকে যে আদর-যত্ন-সম্মানের সঙ্গে রেখেছ, তার জন্য আমি যে কী আনন্দে থাকি, তা আমি মুখে বলে বোঝাতে পারব না।

এটা তো আমাদের কর্তব্য ছোটকাকা।

না, ছোট মা, তোমরা শুধু কর্তব্য পালন করো না।

উনি একটু থেমে বলেন, একটু আশ্রয় আর দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিয়েই তোমরা কর্তব্য শেষ করতে পারতে কিন্তু তাহলে আমি আনন্দে খুশিতে থাকতাম না।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন,আদর-যত্ন-সম্মান অনেক মিষ্টি, অনেক লোভনীয়।

মুহূর্তের মধ্যে ওঁর মুখ থেকে হাসি উবে যায়। বেদনার্ত হয়ে ওঠে চোখ-মুখের চেহারা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই মন খারাপ হয়ে যায়।

ছোটকাকা, একটা কথা বলব?

হ্যাঁ, ছোট মা, বলো।

আমাদের পাড়ার কিছু কিছু লোকের প্রতি আপনার অহেতুক দুর্বলতা আছে।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, আমি জানি, মিত্তিরবাড়ির রামপ্রসন্নকে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করলে তুমি রাগ করো কিন্তু...

ওঁর কথার মাঝখানেই কণিকা বলেন, উনি যে টাকাকড়ি পেলেই রেসের মাঠে চলে যান। তাই...

আমি জানি ছোট মা, তোমার রাগের কারণ আছে কিন্তু তবু পুরনো দিনের কথা মনে করে আমি কিছুতেই ওকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না। রামপ্রসন্নর ঠাকুমাই যে আমার নাড়ি কেটেছিলেন, সে কথা ভুলি কী করে?

মুহূর্তের জন্য একটু থেমে একবার নিঃশ্বাস নিয়েই উনি বলেন, সত্যি বলছি ছোট মা, এই পাড়াটাকেই মনে হতো নিজের সংসার, নিজের পরিবার।

কণিকা চুপ করে শুনে যান।

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এই যে চোখের সামনে দত্তবাড়ি ভেঙে ফেলছে, তা আমি সহ্য করতে পারছি না।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর কণিকা বলেন, কিন্তু ছোট কাকা, শুনেছি, দত্তবাড়ির কোনো এক মেজবাবুর জন্যই এই পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেল।

দত্তবাড়ির এই মেজবাবু একটি কুলাঙ্গার ছিলেন।...

কণিকা ওঁর মুখে ঐটুকু শুনেই একটু হেসে বলেন, সরকারবাড়ির বুড়ির কাছে সেইরকমই শুনেছি।

তুমি সরকারবাড়ির ছোটগিন্নীর কাছে যাও?

যাই মানে, শিবরাত্তির, অম্বুবাচী বা নববর্ষ-বিজয়ার সময় গিয়ে ফলমূল-মিষ্টি দিয়ে একটা প্রণাম করে আসি।

ভালই করো। ও বুড়ি সত্যি খুব ভাল মানুষ।

হ্যাঁ, কথাবার্তা শুনে তাই মনে হয়।

কণিকা একটু থেমে বলেন, উনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন।

অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, এই বুড়ি যেমন ভাল মানুষ, ওর স্বামী ছিল ঠিক ততটাই বদমাইশ। অমন চরিত্রহীন লোক বোধহয় ভূ-ভারতে জন্মায়নি।

উনি একটু থেমে বলেন, আর এই মহাপুরুষটির প্রাণের বন্ধু ছিলেন দত্তবাড়ির মেজবাবু।

হ্যাঁ, ঐ বুড়ির কাছেই শুনেছি, দত্তবাড়ির মেজবাবু ওঁর স্বামীর বন্ধু ছিলেন। ওদের দু'জনের কতা ভাবতে গেলেই রাগে, দুঃখে, ঘেন্নায় মাথা ঘুরে যায়।

দত্ত পরিবারের পরম সুহৃদ ও পরম নির্ভরযোগ্য উকিল হেমেনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, আমাকে এই কাজ করতে হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো, মামলা-মোকদ্দমা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি হবার আগেই যে তোমরা সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, ঠিকই করেছ।

অন্য কেউ কিছু বলার আগেই মেজবাবু বললেন, কাকা, আমি কোনো ব্যবসা চাই না। আমি শুধু ভবানীপুরের বাড়ি আর নগদ টাকা চাই।

হেমেনবাবু বললেন, কালীপদর এই প্রস্তাবে কারুর কোনো আপত্তি আছে?

একে একে চার ভাই বললেন, না কোনো আপত্তি নেই।

আর কারুর কিছু বিশেষ দাবি আছে

ছোটবাবু বললেন, কাকা, আমাকে আলাদা করে কিছু দেবেন না। আমি তো বড় দাদা-বড় বৌদির সঙ্গেই থাকবো।

ওর কথা শুনেই বড়বাবু বললেন, না, না কাকা, বিষয়-সম্পত্তি যাকে যা দেবার, তা আপনি ঠিক করে দিন। তারপর যার যেখানে খুশি, সেখানে থাকুক।

হেমেনবাবু বললেন, দুর্গাপদ, তুমি ঠিকই বলেছ।

উনি একটু থেমে বললেন, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারটা এখনই পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে যাক।

যাই হোক, সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কাগজপত্র আর হিসেব-নিকেশ ও তৎকালীন বাজার-দর বিচার-বিবেচনা করে হেমেনবাবু একমাস পর পাঁচ ভাইকে ভাগাভাগি করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে চাও?

উনি একটু থেমে বলেন, তোমাদের কারুর কোনো আপত্তি থাকলে আমি আবার সবকিছু ভেবে দেখব।

না, কেউই কোনো আপত্তি করলেন না। সবাই ওঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

এই ভাগ-বাটোয়ারায় মেজবাবু ভবানীপুরের বাড়ি ছাড়াও নগদ সাড়ে ছ'লাখ টাকা পেলেন। তবে হাতে পেলেন ছ'লাখ। সরকারবাড়ির ছোট কর্তার পরামর্শে জগত্তারিণীর টাকা থেকে যে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে বরানগরে গঙ্গার ধারে এক পাটকলের সাহেবের বাগানবাড়ি কিনেছিলেন, তা ওঁকে দিতে হয় বলেই হাতে পেলেন ছ'লাখ।

মেজবাবু মহাখুশি। এতদিনের সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে বলে মেজগিন্নি আগে দুঃখ করলেও শেষ পর্যন্ত ভবানীপুরের এই বিশাল বাড়ি আর নগদ ছ'লাখ টাকা স্বামীর হাতে আসায় খুসি না হয়ে পারলেন না। ওঁরা দু'জনেই কত কি স্বপ্ন দেখেন!

বুঝলে মেজবউ, ঠিক করেছি, সবার আগে মেয়ের বিয়ের জন্য পুরো এক লাখ আলাদা করে রেখে দেব।

হ্যাঁ, তা তো রাখতেই হবে।

মেজগিন্নি একটু থেমে বলেন, রাধার বিয়ের সময় তো বড়বাবু বা বড়গিন্নি নিশ্চয়ই কিছু করবেন না ; আর আমরাও কখনই ওঁদের কাছে হাত পাতবো না।

সে তো একশ'বার।

মেজবাবু একটু থেমে একগাল হাসি হেসে বলেন, আমি আর সরকারবাড়ির ছোটকর্তা এমন ব্যবসা করবো যে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মেজগিন্নি একটু হেসে বলেন, ও বাড়ির ছোটর্কতা তো আমোদ-আহ্লাদ করেই দিন কাটান। ওর দ্বারা কি ব্যবসা হবে?

ওরে বাপু, আমি তো আছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। ওকে দিয়ে কী করে কাজ করিয়ে নিতে হয়, তা কি আমি জানি না?

সবই ঠিক কিন্তু তুমিও তো এতকাল বড়বাবুর কথায় উঠেছ-বসেছ। নিজের বুদ্ধিতে তো কিছু করোনি।

স্ত্রীর কথা শুনে মেজবাবু একটু রেগে যান।

তোমার কি ধারণা, এত বছর আমরা তিন ভাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতাম আর বড়বাবু একাই এতগুলো ব্যবসা সামলাতেন?

এত কাল যা শুনে এসেছি, তাই বললাম।

ভুল শুনেছ।

মেজবাবু একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা আয় করে বড়বাবুর মাথা ঘুরিয়ে দেব। জগত্তারিণীও বলেছে, কালীপদ, আমি তোমার পিছনে আছি। কোনো চিন্তা কোরো না।

মেজগিন্নি অবাক হয়ে বলেন, তুমি ঐ নোংরা চরিত্রহীন মেয়েলোকটার সঙ্গে হাত মেলাবে?

কে কী খায় বা কে কার সঙ্গে রাত কাটায়, সেসব চিন্তাভাবনা করলে কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়?

সবই বুঝলাম কিন্তু ঐ মহিলা যে অত্যন্ত অসৎ আর বদমাইশ, সে বিষয়ে তো

কোনো সন্দেহ নেই। উনি যদি শেষ পর্যন্ত তোমাকে কোনো বিপদে ফেলেন?

আমি কি এতই কাঁচা ছেলে যে ঐ মাগী যেভাবে নাচাবে, আমি সেইভাবে নাচব?

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে মেজবাবু বলেন, মেজবউ, ভুলে যেও না, আমি রায়বাহাদুর বনবিহারী দত্তর ছেলে। তুমি দেখে নিও, ঐ মাগী আমার কথায় উঠবে আর বসবে।

মেজবউ আর তর্ক না করলেও স্বামীর কথায় বিশেষ আশ্বস্ত হতে পারেন না।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মেজবউ বললেন, এদিকে তোমার মেয়েকে নিয়ে তো আমি মহা সমস্যায় পড়েছি।

মেজবাবু অবাক হয়ে বলেন, কেন? রাধা আবার কী করল?

বড়মা আর ভাইবোনের জন্য দিনরাত কান্নাকাটি করছে।

না, না, তুমি ওর এইসব ন্যাকামি একদম সহ্য করবে না।

সহ্য করবো না বললেই তো হলো না।

মেজবউ একটু থেমে বলেন, আমি পেটে ধরলেও বড়দিই তো ওর সবকিছু করেছেন। পাশে বড়মাকে পাচ্ছে না বলে মেয়েটা রাত্তিরে ঘুমুতে পর্যন্ত পারছে না। বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছে বলেই তো মেয়েটা বড়মাকে শত্তুর ভাবতে পারে না।

শত্তুর না ভাবলেও মেয়েটাকে তো ওদের কাছে ফেলে রাখতে পারি না।

তুমি না পারলেও আমি পারি।

মেজবউ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এত কাণ্ডের পর মেয়েকে ওদের কাছে রাখবো?

উনি একটু থেমে বলেন, অসম্ভব। তা কখনই হতে পারে না।

কেন অসম্ভব?

মেয়েকে ওদের কাছে রাখলে আমার সম্মান থাকবে?

দু'এক মিনিট পর মেজবাবু বললেন, যদি ইচ্ছা করো, তাহলে রাধাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য আমার নতুন বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকতে পারো।

আমি কি তোমার বাঈজী যে বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকব? মেজবউ আর একমুহূর্ত দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। একটু পরেই বুড়ি সারদা মেজবাবুকে বলে, মেজমা বললেন, এখন তো মেয়ের ইস্কুল বন্ধ, তাই উনি আজ বিকেলে বাপের বাড়ি যাবেন। আপনি কি পৌঁছে দিতে পারবেন?

মেজবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, বিকেলে আমার জরুরি কাজ আছে। তুমি আর মহাদেব মেজমা'কে পৌঁছে দিও।

যে আজ্ঞে।

বুড়ি সারদা দু'হাত জোড় করে ওঁকে নমস্কার করে চলে যায়।

সব শোনার পর সরকারবাড়ির ছোট ছোটকর্তা মুচকি হেসে বললেন, কালী, তুই সত্যি ভাগ্যবান।

ভাগ্যবান বলছিস কেন?

শালা বউগুলোর জন্যই তো আমরা প্রাণ খুলে কাজকর্মও করতে পারি না, আনন্দও করতে পারি না।

দু'মাস ধরে টাকাগুলো নিয়ে বসে আছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই তো শুরু করতে পারলাম না।

ছোটকর্তা গম্ভীর হয়ে বলেন, দ্যাখ কালী, ভাল করে ভেবেচিন্তেই আমরা ব্যবসায় নামব। হঠাৎ দুম্ দাম করে কিছু করলে গণেশ ওল্টাতে বাধ্য।

তা ঠিক।

তাই বলছি, চল, আমরা বরানগরের বাগানবাড়িতে চলে যাই।...

ওখানে গিয়ে কী করব?

ওখানে গিয়ে আমরা দু'এক হপ্তা আলাপ-আলোচনা করে একটা প্ল্যান ঠিক করব।

ওখানে তো এক বুড়ো দারোয়ান ছাড়া কোনো ঝি-চাকর নেই। আমাদের দেখাশুনো...

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছোটকর্তা একটু হেসে বলেন, বন্ধুবর, সেসব দায়িত্ব আমার উপরই ছেড়ে দাও। আমাকে শুধু দুটো দিন সময় দাও।

দু'দিনের মধ্যেই সব লোকজনের ব্যবস্থা করতে পারবি?

আলবাত পারব।

ছোটকর্তা মুহূর্তের জন্য থেমে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, পরশু দিন সন্ধেবেলায় তুই আমার সঙ্গে বাগানবাড়ি যাবি। দু'রাত্তির থাকার পর যদি তোর মনে হয়, তেমন

সেবা-যত্ন হচ্ছে না, তাহলে চলে আসিস।

ঠিক তো?

ওরে শালা, আমার নাম জয়নারায়ণ সরকার। আমি শুধু জয় করবার জন্যই জন্মেছি। আমি যা চাই, তাই পাই।

উনি একটু থেমে বলেন, তোকে একটু সেবা-যত্ন করার ব্যবস্থা করতে যদি না পারি, তাহলে এতকাল করলাম কী?

দু'দিন পর বাগানবাড়িতে পা দিয়েই মেজবাবু সত্যি অবাক হয়ে গেলেন। দূর থেকে গাড়ি দেখেই নতুন উর্দি-পরা দারোয়ান গেট খুলে দেয়। তারপর গেট দিয়ে গাড়ি থামতেই দু'টি দাসী ছুটে এসে ওঁদের দু'জনের হাত ধরে নামিয়ে সামনের ড্রইংরুম আর নাচঘর পার করে ভেতরের ড্রংরুমে নিয়ে গিয়ে দুটো সোফায় বসিয়ে দেয়। দু'জনের পা থেকে নিউকাট পাম্পশু খুলে দিয়ে জরি-দেওয়া দুটো চটি পরিয়ে দিতে না দিতেই অন্য দুটি দাসী এসে দু'গেলাস চন্দনের শরবত দু'জনের হাতে তুলে দেয়।

তারপর?

গঙ্গার পাড়ে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসতে না আসতেই এই দাসীরাই ওদের মুখে তুলে দেয় হুইস্কির গেলাস। এক গেলাস শেষ হতে না হতেই আবার গেলাস ভরে দেয়। মাঝ-মধ্যে দু'একটা কাজু আর আখরোটের টুকরোও দাসীদের অনুরোধে ওদের খেতে হয়।

তিন-চার গেলাস পেটে যাবার পর ছোটকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে কালী, কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

কী যে বলিস শালা! মাইরি বলছি, দারুণ ভাল লাগছে।

রাত একটু গভীর হতেই মেজবাবু এক দাসীর গলা জড়িয়ে গালচের উপর শুয়ে পড়েন।

এখনই শুচ্ছেন কেন? নুচি-মাংস-রাবড়ি না খেয়ে শুতে পারবেন না।

শালা নুচি-মাংসের নিকুচি করেছে।

ছোটকর্তা ইশারা করতেই দুটি দাসী ওকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে যায়।

পরের দিন অনেক বেলায় চোখ খুলতেই মেজবাবু দেখলেন, শুধু উনি না, দুটি দাসীও ওরই পাশে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে।

সন্ধেবেলার আসর জমে ওঠার পর ছোটকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে কালী, এই ছুঁড়িরা ঠিকমতো সেবা-যত্ন করছে তো?

মাইরি বলছি, জয়নারায়ণ, আমি এই দুটো মাগীকে ছেড়ে কিছুতেই ভবানীপুর ফিরে যাব না।

ওরে শালা, শরীর আর মন চাঙ্গা করে নিয়েই তো আমাদের ব্যবসা শুরু করতে হবে।

সেসব পরে ভেবে দেখব। তবে যাই করি না কেন, আমি এই গঙ্গাতীর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।

যাব না, যাব না করেও মেজবাবু একদিন ভবানীপুর ফিরে আসেন। এ-ঘর ও-ঘর উপর-নিচ ঘুরেও মেজবউ আর মেয়েকে না দেখে চিৎকার করে ওঠেন, সারদা।

বুড়ি সারদা দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হয়।

মেজবউ কোথায়?

তা তো জানি না।

বাপের বাড়ি থেকে এখনও ফেরেননি?

হ্যাঁ, ফিরেছিলেন কিন্তু দু'চার দিন পরই আবার চলে গেলেন।

ও!

মেজবাবু দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বললেন, মহাদেব কোথায়?

নিচে আছে। পাঠিয়ে দেব?

হ্যাঁ, ওকে পাঠিয়ে দাও।

মহাদেব আসতেই মেজবাবু বললেন, ছোটকর্তাকে খবর দে. আমি এখনই ফিরে যাবো।

মহাদেব ওর হুকুম শুনেই সরকারবাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

আধঘণ্টার মধ্যেই দুই বন্ধু জুড়িগাড়ি চড়ে আবার বাগানবাড়ির দিকে রওনা হন।

এ সংসারের সব মানুষই ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। চুরি করা অন্যায়, খুন করা জঘন্য অপরাধ, শুধু টাকা-পয়সার জোরে যৌন-ব্যভিচারে মত্ত থাকা আদৌ সম্মানীয় কাজ না — এইসব কথা গরিব-বড়লোক শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই জানে।

তাই তো জুড়িগাড়ি চলে যেতে না যেতেই দত্তবাড়ির আদ্যিকালের ঝি সারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ বিকৃতি করে আপনমনেই বলে, ছি! ছি! বাপের টাকা হাতে

পেয়েছিস বলে কি দিনরাত্তির কুকুর-বেড়ালের মতো ফুত্তি করতে হয়!

মহাদেব পিছনে দাঁড়িয়ে বলে, মাসি, কুকুর-বেড়ালও হিসেব-নিকেশ করে ফুত্তি করে কিন্তু বাগানবাড়িতে যে বাঁদরামি আর অসভ্যতা হচ্ছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বাগানবাড়ির বুড়ো দারোয়ান কী বলছিল জানো?

সারদা মুখে কিছু না বলে শুধু ওর দিকে তাকায়।

মহাদেব একটু চাপা হাসি হেসে বলে, বুড়ো বলছিল, ঐ চারটে ছুঁড়ি যত বেশি অসভ্যতা করে, তত বেশি বখশিস পায়।

বৃদ্ধা সারদা একবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ওরে বাপু, বাপের পুকুর বলে কি তাতে ঝাঁপ দিয়ে মরবি!

ঠিক বলেছ মাসি।

সারদা একটু হেসে বলে, যে মরবে আপন দোষে, কী করবে তার নরহরি দাসে!

হাজার হোক বহুদিনের ঝি-চাকর। সারদা তো সেই আদ্যিকাল থেকে এই বাড়িতে কাজ করছে। ও এই বাড়িতে আসার পরের বছরই তো ন'বাবুর জন্ম হলো। আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়েই গিন্নিমা ছেলেকে ওর কোলে দিয়ে বলেছিলেন, নে সারদা, তোকে এই ছেলেটা দিলাম। এর সব দায়িত্ব তোর।

গিন্নিমা যে ছেলেটা ওর কোলে দিয়েছিলেন, তার কারণ ছিল।

মাত্র ষোল বছর বয়সে শাঁখা ভেঙে, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে সাদা থান পরেও সারদা শুধু ছোট্ট দু'বছরের ছেলেটাকে নিয়েই কোনোমতে দিন কাটাচ্ছিল, কিন্তু পোড়া কপালে ঐ সুখটুকুও সইলো না। ছেলেটাকে হারাবার পর সারদা প্রায় পাগল হয়ে গেল।

গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মোক্ষদা দিদির মেয়ে সারদার এই দুঃখের কাহিনী শুনেই

গিন্নিমা ওকে নিয়ে কলকাতা চলে এলেন।

তার ঠিক তিন মাস পরেই শিবপদর জন্ম।

বাড়ির সবাই ওকে সারদা বলে ডাকলেও শিবপদ আর গুরুপদ ওকে মাসি বলেই ডাকে।

সেজন্য সারদার গর্বের শেষ নেই।

বাড়ির অন্য ঝি-চাকররা কোনো কারণে ওকে আলতু-ফালতু কিছু বললেই ও গর্জে ওঠে — দ্যাখ, তোরা মুখ সামলে কথা বলবি। আমি তোদের মতো মাইনে করা ঝি-চাকর না। আমি ন'বাবু-ছোটবাবুর মাসি, সে কথা ভুলে যাস না।

দূরসম্পর্কের ভাইপো ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা উপলক্ষে পিসিকে নিতে এলেই সারদা বলতো, ইচ্ছে তো করে নাতি-নাতনীর বিয়েতে যাই, একটু আনন্দ করি কিন্তু এই পঞ্চ পাণ্ডবের সংসার ফেলে কী করে যাই বল।

মাখন বলে, পিসি, এ বাড়িতে অনেক কাজের লোক। তুমি দু-চারদিনের জন্য গেলে ওঁরা ঠিকই সামলে নিতে পারবেন।

সারদা আত্মপ্রসাদের একটু চাপা হাসি হেসে বলে, ওরে, তুই ঠিক বুঝবি না, আমি না থাকলে বড়মা আর ন'বাবু-ছোটবাবুর কী অবস্থা হয়।

একটু থেমে ও বলে, বিয়ে-থা মিটে যাক্। তারপর একবার ফুরসত হলেই দু'একদিনের জন্য ঘুরে আসব।

আসল কথা হচ্ছে, সারদা এই সংসারটাকেই নিজের সংসার ভাবে. এই সংসারের মানুষ-জনই ওর আপনজন, প্রিয়জন।

তার কারণও আছে।

নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল অবস্থায় মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সে যে সংসারে এসে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর কাটিয়ে দিল, সেই সংসার ছেড়ে সারদা স্বর্গে যাবার কথাও ভাবতে পারে না।

শুধু এই সংসার কেন, এই বাড়িটা ছেড়ে যাবার কথাও ও ভাবতে পারে না।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা।

সেবার পাঁচ ভাই মিলে ঠিক করলেন, প্রত্যেকবারের মতো পুজোর সময় মধুপুর না গিয়ে পুরী যাওয়া হবে।

মধুপুর-গিরিডির বাড়িতে কয়েকজন কাজের লোক আছে বলে ভবানীপুরের বাড়ি থেকে দু'তিনজন ঝি-চাকর নিয়ে গেলেই আর কোনো অসুবিধে হয় না কিন্তু পুরীতে নিজেদের বাড়ি নেই বলে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে। তাই ঠিক হলো, স্ট্রান্ড রোডের গুদামের দু'জন দারোয়ানকে ভবনীপুরের বাড়িতে রেখে সব কাজের লোকজনদেরও পুরী নিয়ে যাওয়া হবে।

সারদার একদম ইচ্ছে ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারেনি। কিন্তু হা ভগবান! দু'চারদিন পরই সারদা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বড়গিন্নিকে বলল, বড়মা, এখানে

আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। ঘুমুতে ভীষণ ভয় হয়। সত্যি বলছি বড়মা, আমি সারা রাত জেগে থাকি। তুমি বড়বাবুকে বলে আমাকে ভবানীপুর পাঠিয়ে দাও। এখানে থাকলে আমি ঠিক পাগল হয়ে যাবো।

বড়গিন্নী বললেন, আমরা সবাই এখানে থাকব আর তুই একলা একলা ভবানীপুরের বাড়িতে থাকবি, তাই কখনো হয়?

তাতে কী হয়েছে?

অত বড় বাড়িতে তোর একলা একলা থাকতে ভয় করবে না?

ওখানে ভয় করবে কেন? ওটা তো আমাদেরই বাড়ি।

এই তো বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগির সময়ও সারদা বড়গিন্নিকে বলেছিল, বড়মা, তুমি আমাকে এই বাড়ি ছেড়ে যেতে বলো না।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমার কাছে এই বাড়িই কাশী-বিন্দাবন। আমি এই বাড়িতেই মরতে চাই।

কিন্তু মেজবাবুর কীর্তি-কলাপের জন্য এই কাশী-বৃন্দাবনও সারদার কাছে নরক হয়ে উঠল।

এই মহাদেব, আমার একটা কথা রাখবি?

কী কথা, মাসি?

আগে বল, রাখবি কি না।

মহাদেব একটু হেসে বলে, তোমার কোন কথা শুনি না বলতে পারো?

আমাকে একটু মেজ মা'র কাছে নিয়ে যাবি? খুব জরুরি দরকার। মেজবাবু জানলে তো আমাকে খুন করে ফেলবে।

মহাদেব একটু থেমে বলে, মেজবাবুকে বলেছি, মেজ মা'র সঙ্গে দেখাশুনাই হয় না আর তোমাকে যদি সেখানে নিয়ে যাই, তাহলে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সারদা বলে, মেজবাবু জানবে কী করে? তিনি কী আজকাল এখানে থাকেন?

কিন্তু যখন-তখন তো এসে হাজির হতে পারেন।

সারদা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুই আমাকে সন্ধের পর নিয়ে যাবি। তখন তো মেজবাবু কখনই ঐ দুটো রাক্ষসীকে ছেড়ে আসবে না।

মহাদেব একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা তুমি ঠিকই বলেছ।

পরের দিন সন্ধের পর মহাদেব সারদাকে নিয়ে মেজবাবুর শ্বশুরবাড়ি হাজির হয়।

সারদাকে দেখে মেজবউ একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন কী গো মাসি, হঠাৎ তুমি এখানে এলে?

সারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কী করব বল মেজ মা, না এসে পারলাম না।

ও একটু থেমে বলে, ভগবান তো নিজের সংসার করার সুযোগ দিলেন না বলে তোমাদের সংসারটাকেই চিরকাল নিজের সংসার ভেবে এসেছি।

মেজবউ চুপ করে ওর কথা শোনেন।

দেখো মেজ মা, আমি মুখে কিছু না বললেও সবই জানি, সবই বুঝি। কর্তাবাবুও শখ-আহ্লাদ যথেষ্ট করেছেন কিন্তু তাই বলে তিনি সংসার-ধর্ম নষ্ট করেননি বা ছেলেমেয়ে বউকে ভাসিয়ে দেননি।

সারদা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, পুরুষমানুষ একটু এদিক-ওদিক গিয়ে শখ-আহ্লাদ করবে, তাতে আর বলার কী আছে কিন্তু মেজবাবু যা শুরু করেছেন, তা তো আর সহ্য হচ্ছে না।

মেজবাবু আবার নতুন কী করলেন?

পরশু দিন কী হয়েছে জানো?

কী হয়েছে?

হঠাৎ মাঝরাত্তিরে জুড়িগাড়ি এসে থামতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় বেরুতেই দেখি, মহাদেব আর রাখাল লাফাতে লাফাতে নিচে নামছে।

সারদা দু'হাত ঘুরিয়ে বলে, ব্যস! এরই মধ্যে মেজবাবু গাড়িতে বসে বসেই ওদের চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিতে শুরু করেছেন।

মেজবউ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মেজবাবু নিশ্চয়ই খুব নেশা করে এসেছিলেন?

সারদা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, শুধু কি মেজবাবু? সঙ্গে একটা রাক্ষসীকেও এনেছিলেন।

তারপর?

মেজবাবু গাড়ির মধ্যেই প্রায় শুয়ে রইলেন আর ঐ হতচ্ছাড়ি মাগী তোমাদের ঘরে এসে মেজবাবুর আলমারি খুলে জামা-কাপড় ও আরো কত কী নিয়ে চলে গেল।

বলিস কী রে?

তবে আর বলছি কী মেজ মা! সাধে কি আর তোমার কাছে ছুটে এলাম?

সারদা মুখ বিকৃত করে বলে, ঐ মাগীর কাণ্ড-কারখানা আর কথাবার্তা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেছি। ঐ মাগী সেদিন আমাকে যা অপমান করেছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

কেন? তুমি কী করেছিলে?

আলনা থেকে তোমার কয়েকটা ভাল ভাল শাড়ি নিচ্ছিল বলে আমি বলেছিলাম, ও গুলোয় হাত দিও না। ওসব মেজ মা'র।

আমার শাড়ি নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

সারদা মেজবউয়ের দুটো হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, জানো মেজ মা, আমি আপত্তি করেছিলাম বলে রাক্ষসী ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলল, তোর চৌদ্দপুরুষের মেজমা'কে বলিস, এ বাড়ির সবকিছু আমার।

কী বলছো মাসি?

মেজবউ প্রায় চিৎকার করেই বলেন।

কেউই বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলে না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সারদা বলে, দেখো মেজ মা, আমি তোমাদের বাড়ির ঝি হলেও তো ন'বাবু-ছোটবাবুকে মানুষ করেছি। শুধু ওরা না, তোমরাও তো আমাকে মাসি বলেই ডাকো। তাই তো হতচ্ছাড়ির কথায় বড় খারাপ লেগেছে।

খারাপ লাগারই তো কথা।

যা হোক মেজ মা, তুমি একটা কিছু বিহিত করো। তা না হলে বোধহয় মেজবাবুকে আর পাবে না।

মেজবউ উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, মাসি, তোমার মেজবাবু যেখানে নেমেছে সেখান থেকে আর কোনোদিন ফিরতে পারবে না। আর ফিরে এলেও তাকে নিয়ে ঘর করে কী শান্তি পাব?

উনি একটু থেমে বলেন, তবে মাসি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর একটা বিহিত আমি করবই। এইরকম চরিত্রহীন বদমাইশ স্বামীকে নিয়ে ঘর করার মতো মেয়ে আমি না।

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনেই একটু হেসে বললেন, ছোট মা, এই মেজবউ কী করে মেজবাবুকে জব্দ করেছিলেন তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

কণিকা অপলক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নিজের মেয়েকে বড়বাবু-বড়বউ-এর কাছে রেখে দেবার দু'চারদিন পর মেজ বউ নিজেই একদিন একটু রাত্তিরে বরানগরের ঐ বাড়িতে হাজির হয়ে সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা তামাশা করতে করতে মেজবাবুর মদে বিষ মিশিয়ে দেন।...

বলেন কী?

কণিকা একটু জোরেই বলে ওঠেন।

অঘোরনাথ মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, ছোট মা, সত্যি উনি স্বামীর মদে বিষ মিশিয়ে ছিলেন।

তারপর?

যে দুটো খারাপ মেয়েকে নিয়ে মেজবাবু ফুর্তি করতেন, তাদের একজন আবার ঐ গেলাসের অনেকটা মদ খেয়েছিল।...

ওরা দু'জনেই মারা গেল?

হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই মারা যায়।

মেজবউ-এর কী হলো?

উনি নিজেও সেই রাত্রে মারা যান।

ইস! কী কেলেঙ্কারি!

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পর বড়বাবুর কাছে মেজবউ-এর একটা চিঠি এসে হাজির।...

শ্রীচরণকমলেষু,

বড়দা, সম্পত্তি ভাগাভাগির পর আমার স্বামী নগদ ছয় লক্ষ টাকা পাওয়ায় আমি নিজেকে মহারানী ভাবিতে শুরু করিয়াছিলাম কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পারিলাম, এই বিপুল পরিমাণ অর্থের জন্যই আমার স্বামী চরম ব্যভিচারী হইয়া উঠিতেছেন। কখনও কখনও ভাবিতাম, উহার মোহ শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে এবং উনি আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবেন কিন্তু যত দিন গিয়াছে, উনি তত বেশি ব্যভিচারী হইয়া উঠিতেছেন। এইরূপ চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, বিকৃত রুচিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া আমি কখনই জীবন কাটাইতে পারিব না। তাই ঠিক করিয়াছি, আমি এই জগত হইতে বিদায় লইবো। তবে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্বে আমার চরিত্রহীন স্বামীকেও অবশ্যই শেষ করিব।

আমার কন্যা রাধা রহিল কিন্তু উহার জন্য আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই। আমি উহাকে গর্ভে ধারণ করিলেও বড়দিই উহাকে মানুষ করিয়াছেন এবং রাধাও তাহার বড়মাকে সব চাইতে আপনার মনে করে। সুতরাং ও আপনাদের নিকট সর্বতোভাবে ভাল থাকিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আপনি ও বড়দি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন এবং যদি কোনো অন্যায় করিয়া থাকি, তাহা হইলে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

ইতি
আপনার স্নেহধন্যা
মেজবৌমা

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, মজার কথা কি জানো ছোট মা, ঘটনাটা এখানেই শেষ হলো না। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছিল।

কণিকা অবাক হয়ে বৃদ্ধ শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেজবাবু আর মেজবউ দু'জনেই তো চলে গেলেন। এর পর আবার কী ঝমেলা বাধলো?

অঘোরনাথ এবার একটু জোরেই হেসে বলেন, ছোট মা, টাকাকড়ি আর সম্পত্তির লোভে মানুষ যে কত কী করতে পারে, তা তুমি-আমি ভাবতেও পারবো না।

উনি একটু থেমে বলেন, বরানগরের এক বাগানবাড়িতে তিন তিনটে মানুষের মারা যাবার খবর পেয়েই ইংরেজ এস পি একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হয়ে সরকারবাড়ির ছোটকর্তা থেকে শুরু করে দারোয়ানকে পর্যন্ত লাঠিপেটা করতে করতে থানায় পাঠিয়ে দেবার পর খাবার-দাবার, মদের বোতল, মদের গেলাস থেকে শুরু করে সমস্ত বাক্স-পেঁটরা পোঁটলা-পুঁটলি পর্যন্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন।

কী কাণ্ড!

এখনই যদি অবাক হয়ে যাও, তাহলে সব কথা শুনলে তো তুমি মূর্ছা যাবে।

অঘোরনাথ একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে যান, ওদিকে ময়না তদন্তের পর মেজভাই আর মেজ বৌমার দেহ পেয়ে সৎকার পর্ব শেষ করে বাড়ি ফিরেই বড়বাবু মেজ বৌমার চিঠি পেয়ে অবাক।

সত্যি অবাক হবার মতো ব্যাপার।

যাই হোক, বাড়ির কাউকে ও চিঠির কথা না জানিয়েই উনি ছুটে চলে গেলেন হেমেন সেন-এর কাছে।

একবার না, দু'বার চিঠিটা পড়ে হেমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, দুর্গাপদ, এই চিঠি কি তোমাদের বাড়ির সবাই দেখেছে?

না, কাকাবাবু, এই চিঠি কাউকেই দেখাইনি।

বড়বাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মেজবৌমার চিঠিটা পেয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি।

ভালই করেছ।

প্রবীণ উকিল হেমেনবাবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এই চিঠির কথা তুমি আর কাউকে বলো না। আগে দেখা যাক পুলিশ কী করে।

কাকাবাবু, পুলিশের আর কী করার আছে?

উনি একটু থেমে বলেন, এটা যদি খুন-টুনের ব্যাপার হতো, তাহলে না হয়...

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হেমেনবাবু একটু হেসে বলেন, দুর্গাপদ, পুলিশি তদন্তে কোথা থেকে কী বেরিয়ে পড়বে, তা কিচ্ছু বলা যায় না।

কিন্তু কাকাবাবু, মেজবৌমা তো নিজেই জানিয়েছেন...

আবার ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উকিলবাবু বলেন, মেজবৌমা তো স্বামীকে বিষ দিয়ে মারার পর তোমাকে চিঠি লেখেননি?

না, তা লেখেননি কিন্তু...

মেজবৌমা তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তোমাকে জানিয়েছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার মাঝখানেও তো কিছু ঘটতে পারে?

হ্যাঁ, তা পারে কিন্তু...

হেমেন সেন একটু হেসে বলেন, তোমার এই কিন্তুর জবাব পুলিশি তদন্তে ঠিকই বেরিয়ে পড়বে।

উনি একটু থেমে বলেন, দেখো দুর্গাপদ, এ সংসারে টাকাকড়ি আর নারীঘটিত ব্যাপারে কোন মানুষ যে কী করবে, তা বলা যায় না। এমনও হতে পারে মেজবৌমা কিছু করার আগেই সরকারবাড়ির ছোটকর্তা বা ঐ দুটো মেয়েছেলের যে কোনো একজন হয়ত এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে।

কী বলছেন কাকাবাবু?

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ উকিল হেমেন সেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দুর্গাপদ, বহুকাল ধরে ওকালতি করে এইটুকু জেনেছি, অনেক অভাবনীয় ঘটনা এ সংসারে ঘটে আর মানুষেই তা ঘটায়।

বড়বাবু সেদিনের মতো বিদায় নিলেও পরের দিন সকালেই আবার ছুটে যান হেমেন সেন-এর কাছে।

কী ব্যাপার দুর্গাপদ? আবার আজকে...

হেমেন সেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে না করতেই বড়বাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেন, কাকাবাবু, কালরাত্তিরে পুলিশ জগত্তারিণী আর কেষ্টবিনোদবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে।

প্রবীণ হেমেন সেন একটু হেসে বলেন, দুর্গাপদ, যা সন্দেহ করেছিলাম, বোধহয় তাই হয়েছে। দেখো, হয়তো শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

হ্যাঁ,সত্যি সাপ বেরিয়ে পড়ল।

ভয়-ভীতি, একটু-আধটু চড়-থাপ্পড়-লাঠিপেটা আর সর্বোপরি ঝানু গোয়েন্দাদের জেরার মুখে সব ফাঁস হয়ে গেল।...

সত্যি কথা বলছি স্যার, বনবিহারী দত্তর ছেলেদের সঙ্গে মামলায় শুধু জগত্তারিণী হেরে গেল না, আমিও হেরে গেলাম। তারপর থেকেই সুযোগ খুঁজছিলাম, ওদের জব্দ করার।

কৃষ্ণবিনোদ মুহূর্তের জন্য থামতেই গোয়েন্দা দপ্তরের দারোগাবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, থামছিস কেন হারামজাদা? চটপট বলে যা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, বলছি।

কৃষ্ণবিনোদ একবার নিঃশ্বাস নিয়েই আবার শুরু বরেন, স্যার, আমি জানতাম সোজাসুজি এ কাজ করা যাবে না। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা হিসেবে-নিকেশ করে ঠিক করলাম, সরকারবাড়ির ছোটকর্তাকে হাত করতে পারলেই বনবিহারী দত্তর মেজ ছেলেটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনা যাবে।

সরকারবাড়ির ছোটকর্তাকে হাতে আনলি কী করে?

বলছি স্যার, সব বলছি।

কৃষ্ণবিনোদ প্রায় না থেমেই বলেন, স্যার, নরোত্তম মল্লিক আমার দূরসম্পর্কের বন্ধু।...

দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়, দূরসম্পর্কের বন্ধু আবার হয় নাকি?

মানে স্যার, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার বন্ধুত্ব হয়।

দারোগাবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, মাঝে মাঝে বন্ধুত্ব হয় মানে? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাচ্ছিস না?

না, স্যার, সত্যি মাঝে মাঝে বন্ধুত্ব হয়।

কৃষ্ণবিনোদ মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, স্যার, আমরা দু'জনেই মাঝে মাঝে হরিদাসীর ওখানে যাই। মানে স্যার, ওর দুই মেয়ের সঙ্গে আমাদের একটু ভাব আছে। কখনও কখনও আমরা দুজনেই একসঙ্গে একটু আনন্দ-ফুর্তিও করি।

থামছিস কেন? বলে যা, বলে যা।

স্যার, ঐ নরোত্তম মল্লিকের জন্যই সরকারবাড়ির ছোটকর্তার সঙ্গে আমার ভাব হয়।

উনি একটু মুখ তুলে দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, স্যার, আমি কিছুদিন ওর সঙ্গে মেলামেশা করেই বুঝে গেলাম, মদ আর মেয়েছেলে সাপ্লাই করতে পারলে ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নেওয়া যাবে। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান করে ফেললাম।

কী প্ল্যান ঠিক করলি?

স্যার, সরকারবাড়ির ছোটকর্তার পাল্লায় পড়েই বনবিহারীর মেজব্যাটাকে দিয়ে জগত্তারিণীর টাকায় বরানগরের বাগানবাড়ি কেনাবার ব্যবস্থা করলাম।

কেন?

স্যার, মেজবাবু যদি ভবানীপুরের বাড়িতেই থাকে, তাহলে ওকে হাত করব কী করে?

ওকে হাত করবার কী দরকার ছিল?

স্যার, সম্পত্তি ভাগাভাগি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর হাতে ছ'লাখ-সাড়ে ছ'লাখ টাকা এসে গেল। তাই ঠিক করলাম, ওকেও মদ-মেয়েছেলের নেশায় জমিয়ে দিতে পারলে

অন্তত ওর অর্ধেক টাকা তো আমাদের হাতে আসবেই।

ঐ মাগী দুটোকে কে যোগাড় করেছিল? তুই?

স্যার, আমি আর জগত্তারিণী দু'জনে মিলে।

কী করে যোগাড় করলি?

স্যার, যে ঘোষালমশাইয়ের বাগানবাড়িতে আমি আর জগত্তারিণী ফুর্তি করতে যেতাম, সেখানে সুধা বলে একটা মাগী ছিল।...

তুই কি সুধাকে নিয়েও ফুর্তি করতিস?

না, স্যার, সুধাকে নিয়েই ঘোষালমশাই বাগানবাড়িতে থাকতেন।

তাতে কী হলো?

স্যার, ঐ সুধাই ওদের দেশ থেকে দুটো ছুঁড়িকে এনে ঘোষালমশাইয়ের এক ছেলে আর এক জামাইয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়।

কৃষ্ণবিনোদ একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, তাই স্যার, জগত্তারিণীর সঙ্গেও ঐ ছুঁড়ি দুটোর বেশ ভাব ছিল। তবে মাঝখানে বহুদিন ওদের দেখাশুনা না হবার পর হঠাৎ বছর দুই আগে চড়কের মেলায় ওদের দেখা হয়।...

কী গো, তুমি জগত্তারিণী মাসি না?

ডাগর-ডোগর মেয়েটা পান-জর্দা চিবুতে চিবুতে মুখ টিপে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

জগত্তারিণী অবাক হয়ে ওকে দেখে কিন্তু ঠিক চিনতে পারে না।

হা ভগবান! আমাকে ভুলে গেলে? আমি লতা গো লতা! সেই ঘোষালের বাগানবাড়িতে...

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে জগত্তারিণীর সব কথা মনে পড়ে যায়। ও সঙ্গে সঙ্গে একগাল হাসি হেসে লতাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, সব্বোনাশী, তুই কি সুন্দর হয়েছিস রে! ঘোষালমশাইয়ের জামাই তাহলে তোকে বেশ যত্নেই রেখেছে।

লতা একটু জোরে হেসে ওঠে। তারপর বলে, ও মিনসেকে কবে দূর করে দিয়েছি।

ও একটু থেমে বলে, দেখো মাসি, একবার যখন খাতায় নাম লিখিয়েছি, তখন একজনের দাসী-বাঁদী হয়ে চিরকাল থাকবো কেন?

ঠিক বলেছিস।

এখন আমি দু'চার মাস অন্তরই বাবু পাল্টাই।

এখন তোর বাবু কে?

এই তো ক'দিন আগে নগেন দাঁ-কে ছাড়লাম।

লতা একটু মুখ টিপে হেসে বলে, দু'-তিনটে রুই-কাতলা পিছনে লেগেছে। দেখি, কে বেশি দেয়।

সরস্বতীর কী খবর?

ওর খবরও খুব ভাল।

ভাল মানে?

এক জমিদারের ম্যানেজারবাবু ওকে নিয়ে মধুপুর গিয়েছেন। সামনের বুধবারই ওর ফেরার কথা।

ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়?

দেখা হবে না কেন? আমরা দু'জনে মিলেই তো দর্জিপাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়েছি।

আরো টুকটাক কথাবার্তার পর জগত্তারিণী বলে, তোরা দু'জনে একদিন আমার ওখানে আয়। খুব জরুরি কথা আছে।

ভাল মালদার পার্টি হাতে আছে নাকি?

তবে কি শুধু শুধু আসতে বলেছি?...

কৃষ্ণবিনোদ একটু চাপা হাসি হেসে দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার, লতা আর সরস্বতীকে পেয়ে সরকারবাড়ির ছোটকর্তা আনন্দে প্রায় জগাই-মাধাই-এর মতো দু'হাত তুলে নাচতে শুরু করলেন।

তারপর?

তারপর স্যার, ছোটকর্তার মাধ্যমেই মেজবাবুকে বরানগরের বাগানবাড়িতে নিয়ে ঐ দুই মাগীর খপ্পরে ফেলে দিলাম।

মেজবাবুকে খুন করার বুদ্ধিটা কি তোরই মাথায় আসে? নাকি জগত্তারিণীর?

স্যার, একদিন লতার কাছে শুনলাম,মেজবাবুর ভবানীপুরের বাড়ির চাকর মহাদেব এসে এক বাক্সভর্তি টাকা দিয়ে গেছে।

কৃষ্ণবিনোদ একটু থেমে বলেন, এই খবরটা শুনেই মনে হলো, মেজবাবু ওর ভাগের সব টাকাই নিজের কাছে রেখেছেন। তাই স্যার, ঠিক করলাম, চটপট কিছু না করতে পারলে ঐ টাকাটা আর আমাদের ভাগ্যে জুটবে না।

তারপরই বুঝি বিষ কিনে মদের বোতলে মিশিয়ে দিলি?

হ্যাঁ, স্যার।

তুই আর জগত্তারিণী দু'জনে মিলেই কি বিষ মিশিয়েছিলি?

হ্যাঁ স্যার।

তারপর লতা না সরস্বতীকে দিয়ে মেজবাবুকে ঐ মদ খাওয়াবার ব্যবস্থা করলি?

কোন বোতলের মদ কাকে খাওয়াতে হবে, তা জগত্তারিণী ওদের দু'জনকেই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মেজবাবুর বউ সেদিন যাবেন, সে খবর পেলি কী করে?

কৃষ্ণবিনোদ হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, স্যার, মা কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, মেজবৌ যে ঠিক ঐদিনই ওখানে হাজির হবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি।

সরস্বতী ঐ বোতলের মদ খেলে কেন?

তা বলতে পারবো না স্যার।

উনি একটু থেমে বলেন, বোধহয় নেশার ঘোরে ভুল করে খেয়েছিল।

নাকি লতা ইচ্ছে করেই...

না, স্যার, লতা তা করতে পারে না।

মেজবাবুর মদে বিষ মেশাবার পর আবার ওর পানে বিষ মিশিয়েছিলি কেন?

স্যার, সত্যি বলছি, পানে আমরা বিষ দিইনি।

তাহলে কে দিয়েছিল? ছোটকর্তা?

স্যার, ছোটকর্তার মদ-মেয়েছেলের রোগ থাকলেও এ ধরনের কাজ উনি কখনই করবেন না।

তবে কি লতা বা সরস্বতী?

স্যার, ওরা বেশ্যা হতে পারে কিন্তু খুনী না।

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানো ছোট মা, ষড়যন্ত্র করে মেজবাবুকে খুন করার জন্য কৃষ্ণবিনোদ আর জগত্তরিণী দু'দনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো। অন্যান্য সবাইকে জজসাহেব ছেড়ে দিলেন।

কণিকা অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, তার মানে মেজবউ বিষ দিয়ে স্বামীকে মারে নি?

না।

উনি একটু থেমে বললেন, মামলায় প্রমাণ হয়েছিল, মেজবউও একই বিষে মারা যান।

মেজবউও কি ঐ বিষ-মোশানো মদ খেয়েছিলেন?

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, নিশ্চয়ই ঐ মদ খেয়েছিলেন বা ওঁর স্বামী খাইয়েছিলেন।

ইস! কী ট্র্যাজেডি!

হ্যাঁ, ছোট মা, সত্যিই খুব দুঃখের ব্যাপার।

অঘোরনাথ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এই সমস্ত ব্যাপারে বড়বাবু এত দুঃখ, এত আঘাত পেয়েছিলেন যে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী তো ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তি

ছেড়েছুড়ে কাশী চলে গেলেন।

মেজবাবুর মেয়ে রাধার কী হলো?

হ্যাঁ, রাধাকেও ওঁরা সঙ্গে নিয়ে গেলেন

সাত

এই খুকি, এটা ধর।

সন্তোষ রসগোল্লার হাঁড়িটা ওর হাতে দিতেই খুকি জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার সন্তোষদা?

সন্তোষ ওর কথার জবাব না দিয়েই জিজ্ঞেস করে, কাকিমা কোথায়?

খুকি জবাব দেবার আগেই মালতী দেবী রান্নাঘরের ভিতর থেকে দরজার সামনে এসে বলেন, এই তো আমি। কিছু বলবে?

সন্তোষ ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেই একটু হেসে বলে, কাকিমা, আমি পাশ করেছি।

মালতী দেবী ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, খুব ভাল খবর বাবা! আমি জানতাম, তুমি ঠিকই পাশ করবে।

জানেন কাকিমা, আমাদের ফ্যামিলিতে আমিই প্রথম গ্র্যাজুয়েট হলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কাকিমা।

সন্তোষ মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, আমার বড় চাচার ছেলে ক্লাশ নাইনে-এ ওঠার পর স্কুল ছাড়তে চায়নি বলে তো তাকে মারতে মারতে বাড়ি থেকেই বের করে দেওয়া হয়।

খুকি অবাক হয়ে বলে, সত্যি বলছ সন্তোষদা?

মালতী দেবী ওকে একটু বকুনি দিয়ে বলেন, ও কি মিথ্যে বলছে?

সন্তোষ বলে, আমার বাবার একদম মত ছিল না আমি কলেজে ভর্তি হই।

আমি জানি।

মালতী দেবী একটু থেমে বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ ষোল আনা সামলেই যে তোমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে, তা আমি খুব ভালভাবেই জানি।

সন্তোষ একটু হেসে বলে, সত্যি কথা বলতে কি, আপনি ছাড়া কেউই আমাকে পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়নি।

আমি তোমাকে কি আর উৎসাহ দিয়েছি।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমি যদি সত্যি উৎসাহ দিতে পারতাম, তাহলে আমার ছেলেমেয়েরা কি এমন অপদার্থ হতো?

পরিস্থিতিটা একটু সামাল দেবার জন্যই সন্তোষ সঙ্গে সঙ্গে বলে, দুঃখ করছেন কেন কাকিমা? আমি কি আপনার ছেলে না?

মালতী দেবী ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, বাবা, তুমি নিশ্চয়ই আমার ছেলে।

সত্যি বলছি কাকিমা, আপনি ছাড়া কেউ আমাকে পড়াশোনা করতে বলেনি।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুকি এক গাল হেসে বলে, জানো সন্তোষদা, মা'র ধারণা তোমার মতো ছেলে নাকি লাখে একটা হয় না।

মালতী দেবী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ঠিকই তো বলি।

সন্তোষ হাসতে হাসতে উপরে চলে যায়।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা।

রাম মিত্তির সেদিন রাত্তিরে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই বেশ উল্লসিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, বুঝলে মালতী, তোমার মেয়ের বিয়ের টাকার ব্যবস্থা করে এলাম।

ব্যবস্থা করে এলাম মানে?

মালতী দেবী অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

রাম মিত্তির তির্যক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, শেষ পর্যন্ত রেসের মাঠের এক বন্ধুই এই ব্যবস্থা করে দিল।

মালতী দেবী একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, অত হেঁয়ালি না করে বলতে পারছো না কী করে এলে?

দোতলাটা আমার এক বন্ধুর বন্ধুকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি।

মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর রাম মিত্তির সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান

দিয়ে বললেন, ঐ গুপ্তাজিই পনের হাজার অ্যাডভান্স দেবেন।

পনের হাজার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কত টাকায় ভাড়া দিলে যে পনের হাজার অ্যাডভান্স দিচ্ছেন?

মালতী দেবী প্রায় না থেমেই বলেন, নাকি বাড়ির অর্ধেক অংশ বেচে দিতে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাম মিত্তির গলা চড়িয়ে বলেন, ওরে বাপু, বেচতে যাবো কোন দুঃখ? কাল সকালে গুপ্তাজি এলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করো।

হ্যাঁ, তাই করব।

তবে দোহাই তোমার! ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করো।

কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা মনোরঞ্জন বোসের মেয়েকে অন্তত তোমায় শেখাতে হবে না।

পরের দিন সাত-সকালেই সস্ত্রীক গুপ্তাজি এসে হাজির। ভদ্রলোকের পরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি, গায় সিল্কের পাঞ্জাবি; মুখে পান, কপালে চন্দন ফোঁটা। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। তুলনায় ওঁর স্ত্রী অনেক সাদাসিধে এবং বেশ দোহারা চেহারা। কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ। সব মিলিয়ে বেশ স্নিগ্ধ শান্ত সুন্দর চেহারা।

দোতলার ঘরদোর দেখেই গুপ্তাজি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক এই ধরনের বাড়িই আমি চাইছিলাম।

গুপ্তাজির স্ত্রী মালতী দেবীকে বললেন, ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন মুক্তারামবাবুর স্ট্রিটের দেড়খানা ঘরেই বেশ চলে যেত কিন্তু এখন তো ছেলেরা বড় হয়েছে! তাই ওখানে আর কিছুতেই কুলোচ্ছে না।

মালতী দেবী এক গাল হেসে বললেন, আপনি তো ঠিক আমাদেরই মতো বাংলা বলতে পারেন।

গুপ্তাজির স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেন, আমি তো এখানেই জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। বাংলা বলতে পারব না কেন?

এবার গুপ্তাজি একটু হেসে বলেন, আমার তিনটে ছেলেই তো একেবারি বাঙালি হয়ে গেছে। বড় ছেলে মাছ-মাংস না খেলেও অন্য দুটো তো আপনাদের মতো সবই খায়।

রাম মিত্তির ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন, কিষণচাঁদের কাছে আপনার কথা শুনেই তো আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

গুপ্তাজি বললেন, দেখুন মিত্তিরবাবু, আমার বাড়ি চাই আর আপনার বাড়ি আছে কিন্তু মেয়ের বিয়ের টাকা নেই। তাই তো আমরা হাত মেলালে দু'জনেরই উপকার হচ্ছে।

হ্যাঁ, সে তো একশ'বার সত্যি।

হাতের ঘড়ি দেখেই গুপ্তাজি বললেন, আমার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে আমাকে

দোকানে যেতে হবে ; তাই আর দেরি করবো না। সন্ধের পর আমার বড় ছেলে বা মেজ ছেলে এসে আপনাকে পনের হাজার টাকা দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে।

ওরা বেরুবার জন্য পা বাড়াতেই পা বাড়াতেই মালতী দেবী গুপ্তাজির স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, দিদি, আপনারা কি এক তারিখেই আসবেন?

আপনার মেয়ের বিয়ে তো তিন তারিখে, তাই না?

হ্যাঁ।

বিয়ের সময় তো আপনার ঘরদোর দরকার হবে।

হ্যাঁ, তা হবে ঠিকই। তবে আশেপাশের বাড়িতে বললে তারা অনেকেই বিয়ের দু' এক দিনের জন্য দু'একটা ঘর ঠিকই ছেড়ে দেবেন।

না, না, আপনার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক। আমরা বরং ক'দিন পরই আসব।

রাম মিত্তির সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাহলে তো ওখানে আবার এক মাসের ভাড়া দিতে হবে। আপনারা এক তারিখেই....

গুপ্তাজি হাসতে হাসতে বললেন, ও বাড়ি কি আমরা ছাড়ছি নাকি? আমরা আট দশ তারিখেই আসব।

মালতী দেবী বললেন, হ্যাঁ তাই আসবেন, কিন্তু আমার মেয়ের বিয়ের বিয়েতে আপনাদের আসতেই হবে।

গুপ্তাজি হাসতে হাসতে বললেন, মিত্তিরবাবু নেমন্তন্ন করলে নিশ্চয়ই আসব।

রাম মিত্তিরও হাসতে হাসতে জবাব দেন, আপনাদের নেমন্তন্ন করবো না, তাই কখনো হয়?

গুপ্তাজিরা চলে যেতেই রাম মিত্তির ওর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওঁদের কেমন লাগল?

ভালই।

মালতী দেবী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তবে ছেলেগুলো যদি বাপ-মায়ের মতো না হয়, তাহলেই.....

উনি কথাটা শেষ না করলেও ওর স্বামী হাসতে হাসতে বললেন, গুপ্তাজিরা হাতে থাকলে ছেলেদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই।

না থাকলেই ভাল।

উনি একটু থেমে বললেন, তোমার মেজমেয়েও তো কচি বাচ্চা নেই। তাই চিন্তা হয়।

রাম মিত্তির একটু হেসে বলেন, মিনুর মতো রানুকে নিয়ে তোমার ভুগতে হবে না। ও অতি হুঁশিয়ার মেয়ে।

ভগবান জানেন, আমার কপালে কী আছে।

যাই হোক সন্ধের পর পরই গুপ্তাজির মেজছেলে রমেশ এসে হাজির।

ও দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে রাম মিত্তিরকে বলে, কাকু, আমি রমেশ গুপ্তা। বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন।

এসো, এসো, ভিতরে এসো।

রাম মিত্তির মুখ ঘুরিয়ে একটু গলা চড়িয়েই বলেন, মালতী, মালতী, এদিকে এসো। গুপ্তাজির ছেলে এসেছে।

মালতী দেবী ঘরে ঢুকতেই রমেশ হাত জোড় করে নমস্কার করার পরই ব্রিফকেস খুলে নোট ভর্তি একটা মোটা খাম রাম মিত্তিরের হাতে দিয়ে বলে, কাকু, প্লিজ দেখে নিন।

কী আর দেখব? তোমার বাবা কি কম পাঠাবেন?

রমেশ একটু হেসে বলে, না, না, কাকু, প্লিজ দেখে নিন। আমাদেরও তো ভুল হতে পারে।

রাম মিত্তির একটু হেসে বলেন, কোনো ব্যবসাদারই টাকা কম দেয়ও না, নেয়ও না।

তা ঠিক; তবু দেখে নেওয়াই উচিত।

রাম মিত্তির শেষ পর্যন্ত টাকা গুনতে শুরু করতেই মালতী দেবী বললেন, রমেশ, বাবা তুমি চা খাও তো?

হ্যাঁ, কাকিমা, খুব চা খাই।

টাকা গোনা শেষ হতে না হতেই মালতী দেবী চা আর একটা প্লেটে দুটো সিঙাড়া, দুটো রসগোল্লা এনে রমেশের সামনে রেখে বলেন, নাও বাবা, খেয়ে নাও।

আবার সিঙাড়া-মিষ্টি দিলেন কেন?

সারাদিন কাজকর্ম করে এলে; শুধু চা খাবে কেন?

রমেশ সিঙ্গাড়া-মিষ্টির প্লেট হাতে তুলে নিয়েই বলে, কাকিমা, কাকু চা খাবেন না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁর চা আনছি।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই মালতী দেবী স্বামীকে চা এনে দেন।

রমেশ জিজ্ঞেস করে, কাকিমা, কোন দিদির বিয়ে?

মালতী দেবী একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ ওকে ডাকছি।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গিয়ে বড় মেয়েকে ডেকে আনেন।

মালতী দেবী বলেন, রমেশ, এই মিনুরই বিয়ে।

মিনা মুহূর্তের জন্য রমেশের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নেয়।

রমেশ হাসতে হাসতে বলে, আরে দিদি, আমার কাছে লজ্জা করার কী আছে? এখন থেকে আমরা তো একই ফ্যামিলির লোক হয়ে গেলাম।

রাম মিত্তির বললেন, নিশ্চয়ই এক ফ্যামিলির লোক হয়ে গেলে।

রমেশ হাসতে হাসতেই বলে যায়, দিদি, জামাইবাবুকে আমাদের সঙ্গেই আড্ডা দিতে হবে, সিনেমায় যেতে হবে।

ওর কথা শুনে সবাই একটু হাসেন।

এবার রমেশ মালতী দেবীব দিকে তাকিয়ে বলে, কাকিমা, আপনার অন্য ছেলেমেয়েরা বাড়ি নেই?

আমার বড়ছেলে তো দুর্গাপুরে থাকে আর ছোট ছেলে এখন বাড়ি নেই।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, অন্য দুই মেয়ে অবশ্য বাড়িতেই আছে।

রমেশ কিছু বলার আগেই রাম মিত্তির স্ত্রীকে বললেন, ওদের ডাক দাও না।

হ্যাঁ, ডাকছি।

মালতী দেবী ভিতরে গিয়ে দুই মেয়েকে ডেকে এনে রমেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, এই হচ্ছে বীণা, আর এই হচ্ছে খুকু।

রমেশ ওদের দু'জনকে একবার দেখে নিয়েই বলে, কাকিমা, বীণাকেও কি দিদি ডাকতে হবে?

না, না, ওকে আবার দিদি বলবে কেন? ও তো তোমার চাইতে অনেক ছোট।

রাম মিত্তির বললেন, ও তোমার চাইতে চার-পাঁচ বছরের ছোট তো হবেই। তুমি ওকে একশবার নাম ধরে ডাকবে।

রমেশ বলে, আমার বয়স ঠিক তেইশ বছর। বীণা নিশ্চয়ই আঠারো-উনিশের বেশি হবে না?

মালতী দেবী একটু হেসে বললেন, তার মানে তুমি ঠিক মিনুর বয়সী।

তাহলে তো ওকে দিদি বলে ডেকে ভুল করলাম।

বীণা একটু চাপা হাসি হেসে বলে, একবার যখন ওকে দিদি বলে ডেকেছেন, তখন তো আর নাম ধরে ডাকতে পারবেন না।

রমেশ ওর চোখের উপর চোখ রেখে একটু হেসে বলে, ওকে দিদি বললেও তোমাকে মেজদি বলব না।

মালতী দেবী বললেন, বীণা তোমার চাইতে ঠিক তিন বছরের ছোট। ওকে নিশ্চয়ই তুমি নাম ধরে ডাকবে।

রাম মিত্তির রমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিনুর বিয়ের দিন সকাল থেকেই তোমাদের থাকতে হবে।

কাকু, সেদিন তো দোকান-বাজার খোলা থাকবে; তাই সবাই সকাল থেকে না থাকতে পারলেও আমি নিশ্চয়ই আসবো।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে রমেশ চলে যাবার পরই রাম মিত্তির স্ত্রীকে বললেন, ছেলেটা বেশ মিশুকে আছে, তাই না মালতী?

হ্যাঁ, তাই তো মনে হলো।

খুকু বলল, মা, রমেশদাকে দেখতেও বেশ সুন্দর, তাই না?

হ্যাঁ।

নেমন্তন্নর কার্ড ছাপিয়ে আসতেই রাম মিত্তির স্ত্রীকে বললেন, মালতী, কাল সকালেই তুমি আর আমি গুপ্তাজিদের নেমন্তন্ন করতে যাবো।

সকালে মানে?

সাতটার মধ্যেই বেরুতে হবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, বেশি দেরি করলে তো গুপ্তাজি দোকানে চলে যাবেন।

মালতী দেবী বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

পরের দিন সকালে ওঁরা যেতেই গুপ্তাজি ও তাঁর স্ত্রী বেশ আন্তরিকতা ও সমাদরের সঙ্গেই ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন বড় ছেলে সুরেশ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে।

রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, রমেশ নেই?

গুপ্তাজি বললেন, ও একটু জরুরি কাজে বর্ধমান গেছে।

মালতী দেবী গুপ্তাজির স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছোটছেলেও কি বাড়ি নেই?

ও মাস্টারজির কাছে পড়তে গেছে।

রাম মিত্তির নেমন্তন্নর চিঠিটা গুপ্তাজির হাতে দিতেই উনি বললেন, আরে মিত্তিরবাবু, কার্ড দিয়ে কী হবে? আমরা ঠিকই যাবো।

মালতী দেবী বললেন, শুধু আপনারা দু'জনে গেলে হবে না। সবাইকে নিয়ে যেতে হবে।

মিত্তিরবাবু, আমরা ব্যবসাদার লোক। ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলা সামলে সবাই মিলে কোনো বিয়েবাড়িতেই যেতে পারি না।

কিন্তু রমেশকে তো সকাল থেকেই থাকতে হবে।

হ্যাঁ. তা থাকতে পারে কিন্তু আমরা দু'জনে সন্ধের পরই যাবো।

মালতী দেবী বললেন, অন্তত ছোটছেলে আর বড়ছেলের বউকে তো নিয়ে যাবেন।

গুপ্তাজির স্ত্রী বললেন, ছোটছেলেকে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু আমাদের বউ সেদিন অন্য একটা বিয়েবাড়ি যাবে।

ওঁদের মধ্যে টুকটাক আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পরই গুপ্তাজির স্ত্রী মালতী দেবীকে নিয়ে অন্য ঘরে গেলেন।

কোনো ভূমিকা না করেই গুপ্তাজির স্ত্রী ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বিয়ের সব বন্দোবস্ত মানে টাকাকড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে?

মালতী দেবী সলজ্জ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে একবার তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে বলেন,

না, দিদি, সব হয়নি; তবে চেষ্টা করছি।

শুনুন ভাই, মেয়ের বিয়ের কি ঝামেলা, তা আমি খুব ভাল করেই জানি।

উনি মালতী দেবীর একটা হাত ধরে হেসে বললেন, আপনার স্বামীর হাতে বেশি টাকা দিতে গুপ্তাজি চাননি। তাই উনি বলেছেন, আপনার স্বামীকে না জানিয়ে আপনার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিতে।

মালতী দেবী বিস্ময়-মুগ্ধ, ওঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, দিদি, টাকাটা পেলে সত্যি খুব উপকার হবে।

গুপ্তাজির স্ত্রী বললেন, আর আমি আপনার মেয়ের গলার হার দেব কিন্তু তা যেন গুপ্তাজি বা আমার ছেলেরা না জানতে পারে।

মালতী দেবী দু'হাতে দিয়ে ওঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দিদি, আপনি যে কী উপকার করলেন, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।

গুপ্তাজির স্ত্রী একটু হেসে বললেন, আমার নিজের কোনো মেয়ে না থাকলেও আমরা পাঁচ বোন। আমি তো জানি, আমাদের বিয়ের সময় বাবাকে কত ঝামেলা আর অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

উনি একটু থেমে বলেন আপনাদের সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে আর আপনার মেয়ের বিয়েতে আমরা কিছুই করব না, তাই কি কখনও হতে পারে?

দিদি, আপনার ঋণ আমি সারাজীবনেও শোধ করতে পারব না।

গুপ্তাজির স্ত্রী একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, হাজার হোক আমিও তো মেয়েমানুষ। তাই তো আপনার মুখখানা দেখেই আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আপনার মনে কত দুঃখ, কত চিন্তা জমে রয়েছে। এর পরেও কি আমি চুপ করে থাকতে পারি?

গুপ্তাজির স্ত্রী পরের দিন দুপুরেই মিত্তিরবাড়ি গিয়ে মিনার গলায় হার পরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পছন্দ হয়েছে তো?

মিনা একগাল হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে।

বীণা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, দিদি, তোকে যা সুন্দর দেখাচ্ছে না...

খুকি বলল, রিয়েলি দিদি, তোকে দারুণ দেখাচ্ছে।

গুপ্তাজির স্ত্রী একটু চাপা হাসি হেসে ওদের বললেন, বিয়ের সময় তোমাদেরও খুব সুন্দর দেখাবে।

ওদের সবার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর গুপ্তাজির স্ত্রী একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে মালতী দেবীর হাতে পাঁচ হাজার টাকাও দিয়ে দেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মিনার বিয়ে মোটামুটি ভালভাবেই হয়ে গেল। বিয়ের পরদিন মেয়ে-জামাই চলে যাবার পর কান্নাকাটির পর্ব থামলে মালতী দেবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান যে এভাবে আমাকে বিপদমুক্ত করবেন, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

এবার উনি রমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার মেয়ের বিয়েতে আমার অন্য ছেলেমেয়েরা খাটবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তুমি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছ, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

রাম মিত্তির সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক বলেছ মালতী।

রমেশ চাপা সলজ্জের হাসি হেসে বলল, মণ্টু আর ওর বন্ধুরাও তো দারুণ খেটেছে।

মণ্টু হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু ভাইয়া, তুমি আমাদের লিডার ছিলে বলেই আমরা কাজ করতে পেরেছি।

খোকা ছোটভাইকে সমর্থন করে বলে, ঠিক বলেছিস মণ্টু, রমেশ না থাকলে মিনুর বিয়ে কখনই এত ভালভাবে হতো না।

এই বিয়ের দৌলতে একদিনের মধ্যেই রমেশ এই পরিবারের সবার কাছেই আপনজন, প্রিয়জন হয়ে উঠেছে। তাই তো ও হাসতে হাসতেই বলে, এই বীণা, এই শুকনো প্রশংসা আর ভাল লাগেছে না। চটপট চা খাওয়াও।

বীণা একগাল খুশির হাসি হেসেই উঠে যায়।

চা খেতে খেতেও গল্পগুজব হয়।

খোকা বলে, মিনুর শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে বেশ ভাল লাগল কিন্তু কয়েকজন বরযাত্রী এত বদ ছিল যে...

ওর কথার মাঝখানেই মণ্টু বলে, রমেশ ভাইয়ার বদলে আমি হলে তো ওদের ঠেঙিয়ে দূর করে দিতাম।

রমেশ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়েই একটু হেসে বলে, দেখো মণ্টু, সব বিয়েবাড়িতেই দেখবে, বরযাত্রীদের মধ্যে দু'-পাঁচজন শুধু গণ্ডগোল করার জন্যই আসে কিন্তু তাই বলে কি মেয়ের বাড়ি লোকেদের মাথা গরম করলে চলে?

মালতী দেবী বললেন, ঠিক বলেছ রমেশ।

রমেশ বলে যায়, আমরা দোকানে বসেও দেখি, অধিকাংশ খদ্দের ভাল হলেও দু'চারটে খদ্দের বড্ড ঝামেলা করে কিন্তু দোকানদার মাথা গরম করলে তো ভাল খদ্দেরাও চলে যাবে।

রাম মিত্তির এতক্ষণ পর মাথা দুলিয়ে একগাল হাসি হেসে বললেন, রমেশ, তুমি তো দারুণ দামী কথা বললে।

খোকা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা রমেশ, তুমি ঐ বদমায়েশ বরযাত্রীগুলোকে ঠাণ্ডা করলে কী করে?

রমেশ হাসতে হাসতে বলে, বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। বীণা আর ওর দু'তিনজন

বন্ধুকে লাগিয়ে দিলাম ওদের দেখাশুনা করতে ; তাছাড়া কয়েকটা গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট ওদের পকেটে পুরে দিলাম।

মালতী দেবী বললেন, যাই হোক বাবা, তুমি খুব সামলে দিয়েছে ; তা না হলে যে কি কেলেঙ্কারি হতো, তা ভগবানই জানেন।

যাই হোক, মিনুর বিয়ের রাতে রমেশ কত খেটেছে, কত ঝামেলা সামলেছে, তা সবাই জানলেও কেউ জানতে পারলেন না এই এক রাত্তিরের মধ্যেই বীণার সঙ্গে ওর মেলামেশা বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।

বিয়ে-বৌভাতের সব ঝামেলা মিটে যাবার ক'দিন পর গুপ্তাজিরা মিত্তিরবাড়িতে এসে গেলেন মেজ আর ছোটছেলেকে নিয়ে। বড়ছেলে সুরেশ আর তার স্ত্রী মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়িতেই থাকল। গুপ্তাজির বড় দুই ছেলে দোকানে বেরুলেও ছোটছেলে তখন ক্লাশ নাইন-এ-পড়ে।

গুপ্তাজি মাঝে মাঝেই বলেন, জানেন মিত্তিরবাবু, তিনটে ছেলে তিনটে ব্যবসায় ঠিকমতো লেগে গেলেই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী চলে যাব।

উনি একটু থেমে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সেই বারো-তেরো বছর বয়স থেকে বাবার সঙ্গে দোকানে যাওয়া শুরু করে এখন যেন আর ভাল লাগে না।

রাম মিত্তির একটু হেসে বলেন, আইডিয়া তো ভালই কিন্তু আপনি না থাকলে কী ছেলেরা ঠিকমতো ব্যবসা চালতে পারবে?

গুপ্তাজি একটু হেসে বলেন, মিত্তিরবাবু, আমাদের রক্তে ব্যবসা। বড় ছেলে তো বাগড়ি মার্কেটের দোকান ভালই চালাচ্ছে। আর চীনাবাজারের দোকানে আমি থাকলেও রমেশই সবকিছু সামলায়।

উনি একটু থেমে বলেন, তবে ছোট ছেলেটা ব্যবসা-বাণিজ্য তত পছন্দ করে না।

মালতী দেবী পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। উনি বললেন, সন্তোষের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, বি এ-এম এ পাস না করে ও কিছুই করতে চায় না।

গুপ্তাজি হাসতে হাসতে বলেন, বহিনজি, ওসব পাশ করে কী লাভ বলুন? যখন ব্যবসাই করতে হবে, তখন শুধু শুধু হাজার হাজার টাকা আর চার-পাঁচ বছর সময় নষ্ট করে কী লাভ বলুন?

মালতী দেবী বলেন, লেখাপড়া শিখলে তো ব্যবসা-বাণিজ্য আরো ভাল করে করতে পারবে।

না না, তা হয় না।

গুপ্তাজি মুহূর্তের জন্য থেমে একটু চাপা হাসি বলেন, বি এ-এম এ পাশ করলে যদি

ভাল করে ব্যবসা করা যেতো, তাহলে তো সব ব্যবসাই আপনাদের বাঙালিদের হাতে থাকতো আর আমরা না খেয়ে মরতাম।

রাম মিত্তির সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন করে বলেন, খুব সত্যি কথা বলেছেন।

গুপ্তাজি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, মিত্তিরবাবু, আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমার বাবা ক্যানিং স্ট্রিটের বণিকবাবুদের দোকানে আঠারো বছর কুলিগিরি করার পর পাশের চীনাবাজারে মদন দাঁর দোকানের দরজায় একটা শো-কেস ঝুলিয়ে কালি-কলম-ছোট নোট বই বিক্রি করতে শুরু করেন।

সামনে চেয়ারে বসে রাম মিত্তির আর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মালতী দেবী ওঁর কথা শোনেন।

ঐ শো-কেস'এর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি কাজ করতে শুরু কবলাম বারো-তেরো বছর বয়সে।

আর আপনার বাবা?

বাব চীনাবাজার-ক্যানিং স্ট্রিট থেকে সস্তায় মাল কিনে এক একবার এক এক জায়গায় বিক্রি করতেন।

এই কলকাতায় মধ্যেই?

না, না।

গুপ্তাজি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বাবা কোনোদিন যেতেন বারাসত-বসিরহাট, কোনোদিন কালনা-কাটোয়া-নবদ্বীপ অথবা যশোর-খুলনা।

স্বামী টুকটাক প্রশ্ন করলেও মালতী দেবী অবাক হয়ে ওঁর কথা শোনেন।

জানেন মিত্তিরবাবু, এইভাবে আঠারো বছর ব্যবসা করার পর আমরা এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মদনবাবুর দোকান কিনে নিই।

তখন আপনারা কোথায় থাকতেন?

আমি আর বাবা পুরো আঠারো বছর ঐ ক্যানিং স্ট্রিটে বণিকবাবুদের দোকানের সামনের বারান্দায় থেকেছি।

খাওয়া-দাওয়া?

সকালে দোকান খোলার আগেই ঐ বারান্দায় বসেই আমরা চাপাটি-সবজি বনিয়ে নিতাম। আর রাত্তিরে তো ক্যানিং স্ট্রিটের রাস্তার উপরই উনুন জ্বালিয়ে আমাদের মতো অনেকেই রান্না করতো।

উনি একটু থেমে বলেন, মদনবাবুর দোকান কেনার পর আমরা ঐ দোকানের মধ্যেই শুতাম।

গুপ্তাজি একটু হেসে বলেন, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, আমি জীবনে কখনও বায়োস্কোপ-সিনেমা দেখিনি, বিড়ি-সিগারেট-মদ খাইনি।

রাম মিত্তির একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, বছরের পর বছর কোনোরকম আনন্দ না

করে জীবন কাটাতে ভাল লাগে?

গুপ্তাজি হাসতে হাসতেই জবাব দেন, ভালভাবে ব্যবসা করে হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা লাভ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা কি সিনেমা দেখে বা মদ খেয়ে জুয়া খেলে পাওয়া যায়?

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, তবে মনে রাখবেন, বাবা ঐরকম কষ্ট করেছিলেন বলেই আমি অনেক ভাল আছি ; আবার আমি আলতু-ফালতু খরচ না করে ব্যবসা করেছি বলেই আমার ছেলেরা অনেক ভাল আছে।

দিনে দিনে দুটি পরিবারের হৃদ্যতা বাড়ে। প্রতি মঙ্গলবার হনুমানজির পূজা করেই গুপ্তাজির স্ত্রী সিঁড়ি মাথায় দাঁড়িয়েই বলেন, এই বীণা! এই খুকু! প্রসাদ নিয়ে যাও।

বীণা ঘর থেকে বেরিয়েই লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। গুপ্তাজির স্ত্রী ওর হাতে প্লেটভর্তি মিষ্টি দিতেই ও অবাক হয়ে বলে, মাসিমা, এত মিষ্টি দিচ্ছেন কেন?

যা দিচ্ছি, নিয়ে যাও। তোমরা সবাই ভাগ করে খাবে।

শুধু কি মঙ্গলবারের হনুমানজির পুজো? উনি যে আরো কত পুজো-পার্বণ-ব্রত করতেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এইসব উপলক্ষে দোতলা থেকে একতলায় আসতো নানা রকমের ফল আর মিষ্টি। কখনও আবার শাড়ি আর কয়েকটা টাকা।

মালতী দেবী কিছু বললেই গুপ্তাজির স্ত্রী একটু হেসে বলতেন শ্বশুরবাড়ির নিয়ম মেনে চলব না?

কিন্তু প্রত্যেকবার আমাদের...

আরে ভাই, আমি যদি আপনাদের দিয়ে মনে শান্তি পাই, তাহলে আপনাদের আপত্তির কী আছে?

মালতী দেবী মুখে না বললেও বেশ বুঝতে পারেন, নিছক সাহায্য করার জন্যই উনি এইসব দেন।

এই সংসারটা যে কীভাবে চলে, তা মালতী দেবী ছাড়া আর কেউ জানেন না।

বিখ্যাত উকিল দেবীপ্রসন্ন মিত্তিরের একমাত্র পুত্রের স্ত্রী হয়ে আসার পর উনি কত স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু এখন এই সংসারই ওঁর দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। উকিল-ব্যারিস্টার হওয়া তো দূরের কথা, স্বামী রামপ্রসন্ন কর্পোরেশনের কেরানিও হতে পারলেন না। যে ছেলে বিশ-বাইশ বছর বয়স থেকেই রেস খেলে, সে সিনেমা হলের বুকিং ক্লার্ক ছাড়া আর কী হবে? তাছাড়া ঐ চাকরি করে যা মাইনে পান, তার অর্ধেকও তো সংসার চালাবার জন্য মালতী দেবীর হাতে আসে না।

সংসারের শত কাজকর্মের ফাঁকে সামান্য অবসর পেলেই মালতী দেবী দীর্ঘশ্বাস

ফেলে কত কী ভাবেন।

কত মেয়ের কপালে তো স্বামীর সুখ জোটে না কিন্তু তাদের অনেকেই তো ভাল ছেলেমেয়ের মা হয়ে সব দুঃখ ভুলতে প্যারেন কিন্তু আমার কপালে সে সুখও কেন জুটল না?

সত্যি চিন্তা করতে বসলে মাথা ঘুরে যায়।

আমার বড়ছেলে মিস্ত্রী? ছি! ছি! মা হয়ে আমারই ভাবতে ঘেন্না হয়। আমার ছোটছেলে লেখাপড়া না করে দিনরাত্তির পার্টির কাজ করে, ভাবতেও অবাক হয়ে যাই। ওরে বাপু মিছিল-মিটিং-বিক্ষোভ-বক্তৃতা দিয়ে সত্যি সত্যি দেশের কল্যাণ হতো, তাহলে এই কলকাতা শহরের সব রাস্তা সোনা দিয়ে তৈরি হয়ে যেতো। যারা যত বেশি কাজ করে, তারা তত বেশি উন্নতি করে — এই সামান্য কথাটাও কি তোরা জানিস না?

মালতী দেবী নিজের মনেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন।

ছেলে দুটো অপাদার্থ হলেও চরিত্রহীন বদমায়েশ হয়নি কিন্তু দুটো মেয়ে অত খারাপ হলো কেন? মিনু তো চোদ্দ-পনের বছর বয়স থেকেই প্রেম করতে শুরু করল। তাছাড়া কি ভীষণ সিনেমা দেখার নেশা! বাপরে বাপ! যে ছেলে সিনেমা দেখাতে চেয়েছে, দেখিয়েছে, তার সঙ্গেই ও ভিড়ে গেছে। ওরে বাপু, তুই জানিস না, যার-তার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করলে কী বিপদ ঘটতে পারে? আশে-পাশে তোর বয়সী মেয়ের তো অভাব নেই কিন্তু তাদের মধ্যে কে তোর মতো আলতু-ফালতু ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করছে বলতে পারিস?

মালতী দেবী ওকে কত বুঝিয়েছেন।

দ্যাখ্ মিনু, দু'দিন পরই তোর বিয়ে হবে। তখন স্বামীর সঙ্গে যা খুশি আনন্দ করিস। কেউ কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু এখন তুই যেরকম বেপরোয়াভাবে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করছিস, তার জন্য সারা পাড়ায় আমি মুখ দেখাতে পারি না।

তারপর উনি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কত আদর করে বলেছেন, বিশ্বাস কর মিনু, আমি দু'এক বছরের মধ্যেই তোর বিয়ে দেব। এখন একটু ভালভাবে থাক। দেখবি, তুই খুব সুখী হবি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

কথায় আছে, কপাল যার নড়া দশা, কুবুদ্ধি হয় সর্বনাশা।

মিনুরও হলো তাই।

হতভাগী হাজারটা মিথ্যে কথা বলে মাকে কোনোমতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মালাদের সঙ্গে দিঘা যাচ্ছি বলে শেষ পর্যন্ত চক্রবেড়ের ঐ বাঁদর ছেলেটার সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেল। তা সে শুভ সংবাদ আবার জানা গেল বিশ্বনিন্দুক বাঁড়ুজ্যেদের মেজবউয়ের কাছে।

কীরে মালতী, কেমন আছিস?

পান চিবুতে চিবুতে চাপা হাসি হেসে বাঁড়ুজ্যেদের মেজবউ বলে যায়, তুই যে আজকাল আমাদেরও ভুলে গেলি! কী ব্যাপার রে?

মালতী দেবী বলেন, কাউকেই আমি ভুলিনি। সংসারের কাজকম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি বলে কারোর কাছেই যেতে পারি না।

তোর কর্তার কী খবর?

কী আর খবর? যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন।

তুই নিশ্চয়ই হরদম সিনেমা দেখতে যাস?

মেজবউ মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, নিশ্চয়ই যাবি। তোর যখন টিকিট লাগে না তখন...

ওকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই মালতী দেবী বলেন, সিনেমা দেখার শখও আমার নেই, সময়ও নেই।

আচ্ছা মালতী, মেয়ের বিয়ে দিলি অথচ একটা খবরও দিলি না?

কে বলল, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি?

মেজবউ হঠাৎ একটু জোরে হেসে উঠেই বলে, তবে কি তোর মেয়ে বিয়ের আগেই চক্রবেড়ের ঐ চায়ের দোকানের ছেলেটার সঙ্গে হনিমুন করতে দার্জিলিং গেছে?

খবরটা শুনে চমকে উঠলেও মালতী দেবী কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, কে বলল আমার মেয়ে দার্জিলিং গিয়েছে? মিনু তো কাল আমার ছোট পিসির সঙ্গে কালনা গেল। ও দার্জিলিং যাবে কেমন করে?

তা তো জানি না বাপু। ঠাকুরপো আজ সকালে দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে বলল, মিনু আর ঐ ছোঁড়াটা ক্যাভেন্টার্সের দোকানে বসে চা-টা খেতে খেতে খুব হাসাহাসি ঢলাঢলি করছিল।

মেজবউ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই বলে, যাই মালতী। ঠাকুরপোকে গিয়ে বলি, আজই চোখের ডাক্তারের কাছে যাও।

রাগে দুঃখে, অপমানে মালতী দেবী সেদিন সারা রাত্তির শুধু আকাশ-পাতাল ভেবেছেন। এক মিনিটের জন্যও ঘুমুতে পারেননি। অস্বস্তিবোধ করেছেন দিনের পর দিন।

শুধু কি তাই ?

মেয়ের এই কেলেঙ্কারি চাপা দেবার জন্য ওঁর মতো মানুষকেও কতজনের কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, কিন্তু কী করবেন? না বলে তো কোনো উপায় ছিল না।

ওঁর পেটের ছেলে মেয়েরা যে কী করে এত অধঃপাতে গেল, তা নিয়েও মালতী দেবী কত কী ভাবেন!

মাঝে মাঝে মনে হয়, গ্রীষ্মের তাপ, শ্রাবণের ধারা আর মাঘের হিম না পেলে যেমন কোনো বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সুন্দর পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে না, সেইরকম প্রতি শিশুরও

চাই স্নেহ-মমতা-ভালবাসা আর সর্বোপরি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ। আমাদের ছেলেমেয়েরা কি তা কোনোদিন পেয়েছে?

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে।

শৈশব-কৈশোর পার করে যৌবনের স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমেয়েরা কত নতুন স্বপ্ন দেখে! কত নতুন আশা-প্রত্যাশায় মন ভরে ওঠে। যদি সহজ স্বাভাবিকভাবে সেসব প্রশ্ন, আশা-প্রত্যাশা পূর্ণ না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েরা আদর্শভ্রষ্ট পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। আমার ছেলেমেয়েরা তাই কি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না?

রাতের একেবারে শেষ প্রহরে মালতী দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনেই বলেন, শেষ পর্যন্ত যে মিনুকে একটা মোটামুটি ভাল ছেলের হাতে তুলে দিতে পেরেছি, সেই আমার পরম সৌভাগ্য।

গুপ্তাজিরা সবাই এই পরিবারের সবকিছু না জানলেও এই ক'মাসের মধ্যেই জেনে গেছেন, এরা নিত্য অর্থাভাবে কষ্ট পায়। গুপ্তাজির স্ত্রী আর রমেশ খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন, সামান্য কিছু খাবার-দাবার বা উপহার পেলে বীণা আর খুকু বড় খুশি হয়।

গুপ্তাজি রোজ অন্ধকার থাকতেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে পাঁচটার মধ্যেই মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে পড়েন। তারপর ফিবে এসে স্নান আর পুজো করেই খেতে বসেন। ঠিক নটায় বেরিয়ে পড়েন চীনারাজারের দোকানে যাবার জন্য ; ফিরে আসেন সাতটায়। ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

রমেশ বেরোয় দেরি করে, ফেরেও দেরি করে। দোকানের সব ঝামেলা মিটিয়ে ওর ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটা-ন'টা হয়ে যায়। কোনো কোনোদিন আরো দেরি হয়। তবে যখনই ফিরে আসুক, বেশ কিছুক্ষণ একতলায় আড্ডা না দিয়ে ও কখনই উপরে যায় না।

রমেশ যখন ফিরে আসে, তখন রাম মিত্তির থাকেন হল-এ আর মণ্টু বাড়ি থাকে না। খুকুও তখন লেখাপড়া করে। তাই রমেশ আড্ডা দেয় মালতী দেবী আর বীণার সঙ্গে।

তখন রান্নাবান্নার কাজ শেষ। হয় না বলে মালতী দেবী কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই রান্নাঘরে চলে যান। চা খেতে খেতে রমেশ বীণার সঙ্গেই গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা করে। রান্নাঘরে বসেও মালতী দেবীর কানে ওদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। উনি বেশ বুঝতে পারেন, এই সময় রমেশের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য বীণা বেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

অবশ্য না হবারও কোনো কারণ নেই। হাজার হোক রমেশ সুদর্শন সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবক। দু'হাতে টাকা রোজগার করে। তার চাইতেও বড় কথা, ছেলেটা যেমন মিশুকে, তেমনই প্রাণবন্ত। এদিকে বীণাকে দেখতে তো বেশ ভাল। তাছাড়া যৌবন।

আরো কারণ আছে।

রমেশ প্রায়ই কিছু না কিছু হাতে নিয়ে আসে।

এই বীণা, এই নাও।

প্যাকেটটা হাতে নিয়েই বীণা জিজ্ঞেস করে, প্যাকেটে কী আছে?

কেক। রমেশ একটু হেসে বলে, আমার এক বন্ধু একটা বড় কাগজের কোম্পানির এজেন্সি পেয়েছে বলে...

তা আমাকে দিচ্ছেন কেন? উপরে নিয়ে যান।

বাড়ির প্যাকেটা বাবার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

ও!

এইভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ একদিন মালতী দেবী বীণাকে বললেন, একটা কাজ করতে পারবি?

কী কাজ?

মালতী দেবী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পেলে বলেন, হাতে কিচ্ছু নেই। গোটা পঞ্চাশেক টাকা না হলে তো এ ক'টা দিন কিছুতেই চালাতে পারব না।

বীণা সঙ্গে সঙ্গে বলে, রমেশদার কাছে চাইব?

খুব গোপনে চাইতে পারবি?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ওর বাবা-মা যেন জানতে না পারেন।

বীণা একটু হেসে বলল, না না, কেউ জানবে না।

ও আধঘণ্টা পরে উপর থেকে ঘুরে এসে হাসতে হাসতে হাসতে মালতী দেবীর হাত একটা একশ' টাকার নোট দিয়ে বলল, ওর কাছে খুচরো নেই বলেই এই একশ' টাকার নোটটা দিল।

টাকাটা ভাঙিয়ে এখনই কি বাকি পঞ্চাশ টাকা ওকে দিয়ে আসবি?

না, না, এখন দিতে হবে না।

রাম মিত্তিরের সংসার চালাবার জন্য শুধু ঐ একবার না, প্রায় প্রত্যেক মাসেই দু'একবার রমেশের কাছে হাত পাততে হয়।

মালতী দেবী নিজেই ওকে টাকাটা ফেরত দিতে গেলে রমেশ হাসতে হাসতে বলে, কাকিমা, ব্যবসা করি চীনাবাজারে, এখানে না। না, না, এই সামান্য কয়েকটা টাকা

আপনাকে ফেরত দিতে হবে না।

মালতী দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা।

কথায় আছে — মানুষের কুটুম দিলে থুলে, গরুর কুটুম চাটলে চুটলে।

প্রত্যেক মাসেই যদি মেয়েকে পাঠিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে রমেশের কাছ থেকে টাকা আনতে হয় আর সে টাকা যদি কখনই ফেরত দিতে না হয়, তাহলে ছেলেটাকে কুটুমের মতো আপনজন না ভেবে কি পারা যায়?

অন্তত মালতী দেবী পারেন না।

রমেশ দোতলায় উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলে, এই বীণা, চন্দননগর দেখেছিস?

বীণা একটু হেসে বলে, চন্দননগর তো দূরের কথা, আমি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনও দেখিনি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমার দৌড় দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় মঠ। আর কিচ্ছু দেখিনি।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মালতী দেবী একটু ম্লান হেসে বলেন, ওদের বাবা কি কোনো জন্মে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথাও গেছে?

উনি একটু থেমে বলেন, আচ্ছা রমেশ, চন্দননগরের গঙ্গার ধার খুব সুন্দর, তাই না?

হ্যাঁ, কাকিমা, খুব সুন্দর।

রমেশ একটু হেসে বলে, হাজার হোক, ও শহরটা তো ফরাসিরা তৈরি করেছে! তাই অনেক কিছুই খুব সুন্দর।

বীণা রমেশের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি চন্দননগর যাচ্ছো?

হ্যাঁ।

কবে?

কাল।

রমেশ প্রায় না থেমেই বলে, দুপুরে গিয়ে রাত্তিরেই ফিরব। তুই যাবি?

বীণা ওর কথায় জবাব না দিয়ে মালতী দেবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মা, যাব?

মালতী দেবীর রমেশকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ফিরতে কি বেশি রাত হবে?

না, না বেশি রাত হবে না ; বড়জোর সাড়ে আটটা-ন'টা হবে।

তুমি নিশ্চয়ই কাজে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, কাকিমা, কাজেই যাচ্ছি।

বীণার তোমার সঙ্গে গেলে তোমার কাজের ক্ষতি হবে না?

না, না।

রমেশ একটু থেমে বলে, ও গেলে বরং ট্রেনে গল্পগুজব করে সময়টা বেশ কেটে যাবে।

মালতী দেবী বলেন, তাহলে আর আপত্তির কী আছে?

রমেশ দোকান থেকে ফিরতে না ফিরতেই গুপ্তাজিদের খাওয়া-দাওয়ার পর্ব মিটে যায়। ছেলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের দু'একটা কথা বলেই ওরা স্বামী-স্ত্রী শুয়ে পড়েন। দশটা বাজতে না বাজতেই সন্তোষও শুয়ে পড়ে। হাজার হোক ওকে ভোরে উঠে ছ'টার সময় মাস্টারজির কাছে পড়তে যেতে হয়। তাই ও আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকে না।

রমেশ দোকান থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে কিছু জরুরি কথাবার্তা বলেই স্নান করতে যায়। ইতিমধ্যে গুপ্তাজির স্ত্রী ওর খাবার-দাবার ওর ঘরের কোণের টেবিলে ঢেকে রেখে শুতে যান। রমেশ কোনোদিন বাথরুম থেকে বেরিয়েই খেতে বসে, কোনোদিন আবার পরে খায়।

তারপর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই গল্পগুজব করার জন্য বীণা এসে হাজির হয়। বাবা ফিরে আসার আগেই চলে আসে। ততক্ষণে খুকুর মাঝরাত্তির। বীণা রোজই বাবা-মা'র সঙ্গে খেতে বসে।

সেদিন বীণা যেন একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এলো।

মা, রমেশদা তোমাকে একটা কথা বলতে বলল।

কী?

বলল, আমি যে ওর সঙ্গে চন্দননগর যাচ্ছি, তা যেন আর কেউ জানতে না জানে।

আমি আবার কাকে জানাতে যাচ্ছি?

বীণা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, বাবা বা খুকু কিছু জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?

মালতী দেবী একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, যা বলার তা বলব ; তোকে ভাবতে হবে না।

মুখে যাই বলুন না কেন, উনি মনে মনে কত কী ভাবেন। না ভেবে পারেন না। হাজার হোক, বীণা আর কচি খুকি নেই ; পুরো একুশ বছর বয়স হলো। তাছাড়া যা বাড়-বাড়ন্ত শরীর! মাঝে মাঝে হঠাৎ ওর শরীরে দিকে তাকিয়ে মালতী দেবী চমকে ওঠেন। সারা শরীরে যেন যৌবনের ঢল নেমেছে। এর উপর যা কাপড়-চোপড় পরার ছিরি! উনি কতবার বলেছেন, হ্যাঁরে বাজারে কি এর চাইতে ভদ্র-সভ্য ব্লাউজ পাওয়া যায় না?

নিজের বুকের দিকে একবার তাকিয়ে বীণা বলে, এই ব্লাউজ কিনে কী অন্যায় করেছি?

অর্ধেক বুকই যদি দেখা গেল, তাহলে আর ব্লাউজ পরার দরকার কী?

তুমি কী চাও, আমি ঠাকুর-দিদিমাদের মতো সেমিজ পরে ঘুরে বেড়াই?

মালতী দেবী কিছু না বললেও বীণা বলে, আজকাল সব মেয়েই এইরকম ব্লাউজ পরে।

মালতী দেবী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলেন, এইজন্যেই তো ছেলেরা পথে-ঘাটে তোদের সঙ্গে বাঁদরামি করে।

পরের দিন এগারটা নাগাদ বীণা বেরিয়ে যেতেই মালতী দেবীর মনের মধ্যে নানা ভাবনা-চিন্তা ভিড় করে। রমেশ যত ভদ্র-সভ্যই হোক, ও তো দেবতা না। ওর সঙ্গে সারাদিন মেয়েটাকে কাটাতে দিয়ে কি ভুল করলাম? ও কি সত্যি কাজে চন্দননগর গেল? নাকি বীণাকে নিয়ে নিছক সারাদিন কাটাবার জন্য অন্য কোথাও গেল?

আবার মনে হয়, যদি দু'জনে মিলে নিছক ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, তাহলে কিছু বলার নেই। তাছাড়া যে ছেলেটা সব সময় সব রকম সাহায্য করে, তার অনুরোধ বা ইচ্ছাকে কী উড়িয়ে দেওয়া যায়?

অসম্ভব।

কিন্তু...

মালতী দেবী ভাবতে গিয়েও যেন থমকে দাঁড়ান।

রমেশের তো পয়সার অভাব নেই। তাই ও যদি চন্দননগর না গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে কলকাতাতেই কোনো একটা হোটেলে বা অন্য কোথাও সারাদিন কাটায়?

ভাবতে গিয়েও শিউরে ওঠেন।

দুপুরে খেতে বসে রামপ্রসন্ন বলেন, আচ্ছা মালতী, তুমি কী ভাবছ বলো তো!

আমার ভাবনা-চিন্তার কি শেষ আছে?

তা হতে পারে কিন্তু অন্য দিন তো ঠিক এত চিন্তিত মনে হয় না।

আমার চিন্তা-ভাবনার কথা ছেড়ে দাও। তুমি খাও।

দু'এক মিনিট পর রামপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করেন, আজ মেজখুকি এত সেজে-গুজে কোথায় গেল?

পিকনিকে।

পিকনিকে?

হ্যাঁ।

ও আবার কাদের সঙ্গে পিকনিকে গেল?

তুমি কি ওর সব বন্ধুদের জানো?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ও ওর স্কুলের পুরনো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পিকনিকে গেছে।

কোথায় পিকনিক করতে গেছে?

বারাসতের ওদিকে কি একটা গ্রামে।

ও!

খেয়ে-দেয়ে ওঠার মুখে রামপ্রসন্ন একটু জিজ্ঞেস করেন, তোমার ছোটপুত্রকে তো সকাল থেকেই দেখলাম না।

তিনি দেশ উদ্ধারের কাজে বারুইপুর গিয়েছেন।

গুড।

হাসিতে খুশিতে ভরপুর হয়ে বীণা নটা বাজতে না বাজতেই ফিরে আসে।

ওকে দেখেই খুকু ছুটে আসে।

হ্যাঁরে ছোড়দি, কেমন পিকনিক হলো রে?

ওর কথা শুনে বীণা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। একবার মুহূর্তের জন্যে মালতী দেবীর দিকে তাকিয়েই বলে, দারুণ হলো।

আমার পড়া হয়ে গেলে, সব গল্প বলবি। বুঝলি তো?

আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

খুকু ভিতরের ঘরে চলে যেতেই বীণা মাকে দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ!

ন্যাকামি করিস না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বেশ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেন, চন্দননগর কেমন লাগল?

খুব ভাল।

খেলি কোথায়?

যে ভদ্রলোকের কাছে রমেশদা গিয়েছিল, তাঁর বাড়িতেই খেলাম।

বীণা একটু থেমে বলে, ওঁরা দারুণ খাইয়েছেন।

ওখানে কী কী দেখলি?

ফরাসিদের তৈরি সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি-পার্ক আর গঙ্গার ধারের...

ও কথাটা শেষ করার আগেই মালতী দেবী জিজ্ঞেস করেন, রমেশ কোথায়?

দোকানে গেল।

আরো অনেক কথা, অনেক প্রশ্ন মনে এলেও মালতী দেবী আর কোনো কথা না বলে রান্নাঘরে চলে যান।

এর ঠিক মাসখানেক পরের কথা।

দশটা বাজতে না বাজতেই রামপ্রসন্ন বাড়ি ফিরে আসতেই মালতী দেবী একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

রামপ্রসন্নও চাপা হাসি হেসে জবাব দিলেন, তোমাকে একটু কাছে পাবার জন্য মনটা ছটফট করছিল বলে...

ঢং দেখে মরে যাই।

মালতী দেবী একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি গঙ্গায় দাঁড়িয়ে শালগ্রাম শিলা মাথায় করেও যদি বল, আমার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলে, তাও আমি বিশ্বাস করতে পারব না।

একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যেই স্ত্রীর সামনে বসেই রামপ্রসন্ন বলেন, আমাকে নিয়ে তোমার দুঃখের শেষ নেই, তা আমি জানি কিন্তু একটা কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

কী স্বীকার করতে হবে?

আমি লেখাপড়া শিখিনি, একটা থার্ড ক্লাশ চাকরি করি, রেস খেলে টাকা ওড়াই কিন্তু আমি চরিত্রহীন না।

আমি কি তাই বলেছি?

তোমার জন্য কি এনেছি, দেখেছ?

কী এনেছ?

ডান দিকে তাকিয়ে দেখো।

মালতী দেবী ঘাড় ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকিয়েই এক গাল হাসি হেসে বললেন, কী ব্যাপার? হঠাৎ দই নিয়ে এলে?

তুমি গাঙ্গুরামের দই ভালবাস না?

সে কথা তোমার মনে আছে?

মনে না থাকলে কি নিয়ে আসতাম?

হঠাৎ একটা খুশির ঝলকে মালতী দেবীর মন ভরে যায়।

দু'এর মিনিট চুপ করে থাকার পর উনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এখনই খাবে?

খুকুর খাওয়া হয়ে গেছে?

না ; এখনও পড়েছে।

মেজখুকি কোথায়?

উপরে গেছে।

ও এলে সবাইকেই এক সঙ্গে খেতে দাও।

তুমি গায় জল দিয়ে এসো। এর মধ্যেই মেজখুকি এসে যাবে।

রামপ্রসন্ন রান্নাঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই খুকু রান্নাঘরে আসে।

মালতী দেবী জিজ্ঞেস করেন, পড়া হয়েছে?

হ্যাঁ।

তাহলে উপর থেকে ছোড়দিকে ডেকে আনতো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বলবি, বাবা এসে গেছে। আমরা সবাই এক সঙ্গে খেতে বসব।

বইপত্তর গুছিয়ে রেখে যাচ্ছি।

যাই হোক, খুকু উপরে উঠে দেখে, গুপ্তাজি আর সন্তোষের ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দাতে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। ডান দিকে ঘুরে দেখে, রমেশের ঘরের দরজায় মোটা পর্দা ঝুলছে। ও ঘরে টিউব ল্যাম্প জ্বলছে না। পর্দার তলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তা দেখে মনে হলো, শুধু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। খুকুর মনে হয়, রমেশদা বোধ হয় কোনো লেখাপড়ার কাজ করছে কিন্তু পর্দা সরিয়েই ও চমক ওঠে। লজ্জায় তাড়াতাড়ি একটু পিছিয়ে আসে। একবার মনে হয়, ছুটে নিচে চলে যায়। মাকে বলে, শিগগির দেখবে এসো, রমেশদা আর ছোড়দি কী কাণ্ড করছে।

কিন্তু না, খুকু তা পারে না। কিশোরী হলেও সে জানে, এসব কথা বাবা-মাকে বলতে নেই।

ওরা খুকুকে দেখতে না পেলেও খুকু পর্দাটা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখে, রমেশদা ছোড়দিকে কোলে বসিয়ে আদর করছে ; আর ছোড়দিও দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে আছে।

খুকু ওকে ডাকার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না।

কয়েক মুহূর্ত পর একটু সাহস করে একটু জোরেই বলে, এই ছোড়দি! বাবা এসে গেছে। মা...

ও কথাটা শেষ করার আগেই ওরা চমকে ওঠে। বীণা বোধহয় কাপড়-চোপড় ঠিক করার জন্যই এক লাফে বড় আলমারির ওপাশে চলে যায়।

রমেশও এক লাফে দরজার কাছে এসে খুকুর হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

খুকু, প্লিজ কাউকে কিছু বলো না। তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব।

খুকু মুখ নিচু করে একটু হাসে। মুখে কিছু বলে না, বলতে পারে না।

রমেশ আবার বলে, কি খুকু, কাউকে কিছু বলবে না তো?

খুকু আগের মতোই মুখ নিচু করে কোনোমতে বলে, না।

রমেশ ওর দুটো হাত ধরে বলে, আমি জানতাম, তুমি আমার কথা রাখবে। আমি কালই তোমাকে একটা দারুণ প্রেজেনটেশন দেব।

খুকু ওর দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসে।

সিঁড়ি দিয়ে দু'এক ধাপ নামতেই বীণাও খুকুর দু'হাত ধরে বলে, প্লিজ, কাউকে কিছু

বলিস না। আমি সারাজীবন তোর গোলাম হয়ে থাকব।

বলেছি তো বলব না।

ওরা দু'জনে রান্নাঘরে ঢুকতই মালতী দেবী বললেন, কীরে তোদের এত দেরি হলো?

খুকু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, রমেশদার সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম।

অন্যদিন বীণা যখন শুতে আসে, তখন খুকু অঘোরে ঘুমোয়। আজ দুই বোনে একই সঙ্গে শুতে যায়।

বীণা ওর গলা জড়িয়ে শুতেই খুকু একটু হেসে ফিসফিস করে বলে, আজ হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরলি যে!

তোকে আদর করতে ইচ্ছে করছে, তাই।

অন্যদিন তো আদর করিস না।

আমি রোজই তোর গলা জড়িয়ে শুই।

ইস! রোজ গলা জড়িয়ে শোয়!

খুকু মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, কেন মিথ্যে কথা বলছিস?

সত্যি কথাটা শেষ হবার আগেই খুকু জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে ছোড়দি, তুই রমেশদাকে ভালবাসিস?

হ্যাঁ।

রমেশদাও তোকে ভালবাসে?

হ্যাঁ।

রমেশদা তোকে রোজ আদর করে?

না, না, রোজ না।

ইস! আবার মিথ্যে কথা বলছিস?

মা কালীর নামে বলছি, রোজ আদর করে না ; তবে মাঝে মাঝে করে।

তুই নিশ্চয়ই রোজ রমেশদাকে আদর করিস?

বীণা কোনো মতে হাসি চেপে বলে, করলেও এক-আধ মিনিটের জন্য।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর খুকু বলে, আচ্ছা ছোড়দি, রমেশদা যে তোকে ঐভাবে আদর করছিল বলে তোর লজ্জা করছিল না?

কীভাবে আদর করছিল?

ইস! আমি যেন দেখিনি।

বীণা একটু বিরক্ত হয়েই বলে, আর বকবক না করে এবার ঘুমোতে দে।

ঠিক আছে বকবক করব না কিন্তু তোরা দু'জনেই বড় অসভ্য।

খুকু, প্যাকামি বন্ধ করবি?

তোরা অসভ্যতা করবি আর বললেই পাকামি হয়ে গেল, তাই না?

এবার বীণা রেগেই বলে, বেশ করেছি অসভ্যতা করেছি।

ও এক নিঃশ্বাসেই বলে যায়, যাকে বিয়ে করব, তার সঙ্গেই অসভ্যতা করেছি ; কোনো রাস্তার ছেলের সঙ্গে তো...

খুকু অবাক হয়ে বলে, তুই রমেশদাকে বিয়ে করবি?

হ্যাঁ, করব।

মাকে বলেছিস?

কখন কাকে বলব, তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

খুকু মাথা না ঘামালেও কিছুদিনের মধ্যে ওদের ব্যাপার নিয়ে সবাইকেই মাথা ঘামাতে হলো।

হঠাৎ গুপ্তাজির বড়ছেলে সুরেশ সস্ত্রীক এসে রামপ্রসন্ন আর মালতী দেবীকে নেমন্তন্ন করায় ওঁরা একটু অবাকই হলেন কিন্তু নেমন্তন্ন গ্রহণ না করে পারলেন না।

পরের রবিবার দুপুরে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাসায় রামপ্রসন্ন স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হতেই শুধু সুরেশ না, ওর বাবা-মা'ও ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

গল্পগুজব খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ হবার পর স্বয়ং গুপ্তাজিই রামপ্রসন্ন আর মালতী দেবীকে বললেন, আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই জরুরি কথা বলার জন্য এখানে টেনে এনেছি।

ওঁর কথা শুনে রামপ্রসন্ন ঘাবড়ে গেলেও মুখে বলেন, হ্যাঁ, বলুন।

দেখুন মিত্তিরবাবু, আপনাদের বাঙ্গালি সমাজের মতো আমাদের সমাজ ঢিলেঢালা না। সমাজের নিয়ম মেনে না চললে আমাদের অনেক খেসারত দিতে হয়। তাই তো বীণার সঙ্গে রমেশের শাদি হলে আমার ভাতিজিদের বিয়ে-শাদি দিতে বহুত ঝামেলা হবে।

ঘরের পরিবেশ বেশ থমথমে হলেও রামপ্রসন্ন একটু হেসে বলেন, হাজার হোক আজকালকার ছেলেমেয়ে। যদি ওরা নিজেরাই বিয়ে করে, তাহলে...

গুপ্তাজি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, তা করতে পারে কিন্তু তাহলে রমেশ আমার ব্যবসা-বাণিজ্য টাকাকড়ির ফুটো পয়সাও পাবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এই আমার বড়ছেলের সামনেই বলছি, ওরা দু'ভাই যতই ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করুক, ওরা কেউই মালিক না। ষোল আনা মালিক আমি।

গুপ্তাজি একবার সুরেশের দিকে তাকিয়ে বলেন, তবে হ্যাঁ, ওরা সবাই ঠিকঠাকমতো চললে আমি ঠিক সময় তিন ছেলের মধ্যে সবকিছু বাঁটোয়ারা করে দেব।

রামপ্রসন্ন আর মালতী দেবী মুখ নিচু ওঁর কথা শোনেন। একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না।

শুনুন মিত্তিরবাবু, এবার আসল কথা বলি।

গুপ্তাজি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলে যান, চটপট আপনাকে বীণার শাদি দিতে হবে। আর সেজন্য আমি সব রকম সাহায্য করতে রাজি।

এতক্ষণ পর মালতী দেবী বললেন, দাদা, বললেই কি মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়?

গুপ্তাজি একটু হেসে বললেন, বহিনজি, মেয়ের বিয়ে দিতে হলে ছেলে দেখতে হবে, টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে হবে, তা কি আমি জানি না?

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে যান, আমার অ্যাকাউন্টসবাবুর ছেলে আছে। বি. কম. পাশ করে রেল কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। আমি অ্যাকাউন্টসবাবুর সঙ্গে কথাও বলে রেখেছি। আমার পছন্দমতো মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে ওঁর কোনো আপত্তি নেই।...

মালতী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন?

হাজার বার দেখেছি।

সুরেশ বলল, ছেলেটিকে আমিও খুব ভাল করে চিনি। ছেলেটি বেশ ভদ্র-সভ্য।

গুপ্তাজি বললেন, মিত্তিরবাবু, যদি দেরি না করে ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন, তাহলে আমি বিয়ের খরচের জন্য দশ-পনের হাজার টাকা ব্যয় করতে পারি।

না, এইটুকু বলেই উনি থামলেন না। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বললেন, আর যদি আপনাদের আপত্তি থাকে, তাহলে সামনের রবিবারই আপনার বাড়ি আমি ছেড়ে দেব।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত এই ছেলের সঙ্গেই বীণার বিয়ে হলো। কিন্তু মজার কথা, তার ঠিক এক সপ্তাহ আগে রমেশ বালিগঞ্জে তার ভাবী শ্বশুরের নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেল।

আট

ইদানীং সময় সুযোগ পেলেই বড়বউ স্বামীকে বলেন, আচ্ছা, তুমি কি শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই মেতে থাকবে? মেয়েটা যে ধেই ধেই করে বড় হচ্ছে, তা কি দেখতে পাও না?

নরোত্তম মল্লিক একটু হেসে বলেন, ওরে বাপু, এখন আর সে যুগ নেই। পনের-ষোল বছরে মেয়ের বিয়ে দিলেও কেউ কিছু বলবে না।

এসব বিলেতফেরত জজ-ব্যারিস্টারের ঘরে হতে পারে। আমাদের সমাজে তা হয় না।

বড়বউ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মেয়েটা তের বছরে পা দিল। এখনই উঠে-পড়ে লাগলেও হয়তো চোদ্দ-পনের পার হয়ে যাবে।

নরোত্তম বড়বউ-এর একটা হাত ধরে একটু হেসে বলেন, আমার উপর বিশ্বাস রাখো ; আমি ঠিক সময়েই তোমার মেয়ের বিয়ে দেব।

বিশ্বাস কেন রাখব না?

বড়বউ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, একটু দেখেশুনে ভাল ঘরে মেয়েটাকে না দেওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাব না।

বড়বউ ভুলে যেও না, নরোত্তম মল্লিকের মেয়েকে পেয়েও অনেক পরিবার ধন্য হয়ে যাবে।

উনি একটু থেমে বলেন, তাড়াহুড়ো করে যার-তার হাতে তো মেয়েটাকে তুলে দিতে পারি না।

মাঝে মাঝেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা হয়।

হ্যাঁগো, আর দেরি করো না। মেয়েটার বিয়ে দেবার জন্য এবার একটু উঠে-পড়ে লাগো।

বড় বউ একবার নিঃশ্বাস নিয়েই আবার বলেন, মেয়েটা এমন সোমত্ত হয়ে উঠেছে যে...

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই নরোত্তম বলেন, বড়বউ, ইতিমধ্যেই তিন-চারটে পাত্রের খবর পেয়েছি। খোঁজ -খবর নেবার জন্য লোকজনও লাগিয়েছি। দেখি, কী হয়।

বড়বউ এক গাল হাসি হেসে, কই, আমাকে তো কিচ্ছু বলোনি।

নরোত্তম মল্লিক একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, আগে জাল গুটিয়ে নিই। তারপর ঠিকই খবর পাবে।

দিন পনের পরই একদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ জগদীশ ভট্টাচার্য প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বড়বউকে বললেন, এখুনি খবর এলো, পাইকপাড়ার রায়বাড়ির বড়কর্তা আজ বিকেলেই তোমার মেয়েকে দেখতে আসবেন।

আজই?

হ্যাঁ।

জগদীশ ভট্চাজ একটু থেমে বলেন, পাইকপাড়ার রায়রা অনেক জমিদারদের চাইতেও বেশি টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তির মালিক।

কেন? ওরা কীসের ব্যবসা করে?

ওরা জাহাজের ব্যবসা করে?

জাহাজের?

তবে কি এমনি বললাম, ওরা অনেক জমিদারদের চাইতেও...

তা ওঁরা ক'জন আসবেন?

বোধহয় পাঁচ-সাতজন।

বড় বউ মুহূর্তের জন্য একটু ভেবে-চিন্তে বলেন, ঠিক আছে। আমি এদিকে সব বিধিব্যবস্থা করছি কিন্তু আপনি বাগবাজার বা রামবাগান থেকে ভাল মিষ্টি আনার ব্যবস্থা করবেন।

মিষ্টির কথা আগেই বলে দিয়েছি। ওসব বিকেলের মধ্যেই এসে যাবে।

সন্ধের পরপরই পাইকপাড়ার রায়বাড়ির বড়কর্তা নিত্যানন্দ রায় সদলবলে এসে হাজির হন। আদর-আপ্যায়নের পর্ব শেষ হতেই নিত্যানন্দ রায় হাসতে হাসতে বলেন, মল্লিকমশাই, আপনার কন্যা দেখতে আসার জন্য যদি এইভাবে-আপ্যায়ন করেন, তাহলে বিয়ের দিন কী করবেন?

নরোত্তম মল্লিক সলজ্জ হাসি হেসে বলেন, আজ্ঞে, আপনার সম্মান রাখার জন্য কী আর করতে পারলাম যে এভাবে বলে লজ্জা দিচ্ছেন।

মল্লিকমশাই, আপনি তো বড্ড বিনয়ী।

যাই হোক, মাধুরীলতাকে দেখে সবার সামনেই নিত্যানন্দ রায় বললেন, মল্লিকমশাই, আপনার মেয়ে তো সাক্ষাৎ মা দুর্গা!

উনি এক নিঃশ্বাসে বলে যান, আপনি আমার ছেলেকে দেখুন। যদি পছন্দ হয়, তাহলে যেদিন বলবেন, সেইদিনই আমি আমার মা দুর্গাকে বরণ করে ঘরে তুলব।

আপনার ছেলেকে আবার কী দেখব?

না, না, মল্লিকমশাই, ও কথা বলবেন না। যার হাতে এমন মা জননীকে তুলে দেবেন, তাকে দেখবেন না, তাই কখনো হয়?

দিন দশেক পর শুধু জগদীশ ভট্‌চাজকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম মল্লিক নিত্যানন্দ রায়-এর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জগৎনারায়ণকে দেখে এসে বড়বউকে বললেন, তোমার জামাইকে দেখতে তো সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুর।

বড়বউ এক গাল হাসি হেসে বলেন, দেখতে এত ভাল?

সত্যি বলছি, বড়বউ, এমন সুপুরুষ ছেলে হঠাৎ চোখে পড়ে না।

জগদীশ ভট্‌চাজ দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, শুধু রূপের কথা কেন বলছ? ছেলেটার গুণের কথা বলো।

নরোত্তম বললেন, আমি বললেই মনে করবে বাড়াবাড়ি করছি। যা বলার আপনিই

বলুন।

ভট্‌চাজমশাই বললেন, আশু মুখুজ্যের মতো জাঁদরেল জজ যে বিশ্ববিদ্যালয় চালায়, সেখান থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি পাওয়া কি ছেলেখেলার ব্যাপার?

বলেন কী ভট্‌চাজমশাই?

তবে আর বলছি কী?

ভট্‌চাজমশাই একটু থেমে বলেন, শ্রীমান আবার আইনের ডিগ্রি নেবে বলে ঠিক করেছে।

বড়বউ একটু হেসে বলেন, এত লেখাপড়া জানা জামাইয়ের সঙ্গে কীভাবে যে কথা বলব, তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।

নরোত্তম বললেন, বুঝলে বড়বউ, একে রায় পরিবারের ছেলে, তার উপর এত পাশ করেছে কিন্তু এমন ভদ্র-সভ্য-বিনয়ী যে আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেছি।

যাই হোক, বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক হবার পরই নরোত্তম মল্লিক জগদীশ ভট্‌চাজকে বললেন, হাতে মাত্র আড়াই মাস সময়। বিয়ে-টিয়ে টিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ব্যবসা-বণিজ্যের কোনো ব্যাপারেই আমি সময় দিতে পারবো না। সবকিছু আপনিই সামলাবেন।

জগদীশ ভট্‌চাজ একটু হেসে বলেন, হাজার হোক আমি তোমার কর্মচারী। আমার উপর সব ছেড়ে দিলে হয়তো তোমার পরিবারের লোকজনই অসন্তুষ্ট হবে।

দেখুন ভট্‌চাজমশাই, কে কোথায় সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট হলো, তাতে নরোত্তম মল্লিকের কিছু যায়-আসে না। আপনি ছাড়া আর কাউকেই যে বিশ্বাস করি না, তা তো আপনি খুব ভাল করেই জানেন।

নরোত্তম একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, এখন বলুন, আমি মেয়ের বিয়েতে কত খরচ করতে পারি।

দশটি নয়, পাঁচটি নয়, তোমার একটিই মেয়ে। তারপর বিয়ে দিচ্ছো অমন বিখ্যাত পরিবারের অত গুণী ছেলের সঙ্গে।

ভট্‌চাজমশাই একটু হেসে বলেন, তাছাড়া তোমার মতো ধনী ব্যবসায়ীই বা কলকাতায় ক'জন আছে। তাই টাকাকড়ি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে যা চাইবে, তা নিশ্চয়ই হবে।

তবু আপনি একটু ভেবে দেখবেন, কত টাকা পর্যন্ত খরচ করলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে অসুবিধে হবে না।

হ্যাঁ, দেখব।

আর হ্যাঁ, লিভারপুলের জাহাজ কবে এসে পৌঁছবে?

সামনের রবিবার ; তবে মাল ছাড়াতে হবে মঙ্গলবার।

কত টাকার মাল আসছে?

মোটামুটি তিরিশ লাখ টাকার মাল আসছে। তবে মাল ছাড়াতে মাত্র লাখ দশেক লাগবে।

তার মানে কুড়ি লাখই আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন?

এক পার্সেন্ট বেশি কমিশন পাওয়া যাবে বলে...

নরোত্তম হাসতে হাসতে বলেন, তার মানে তিন লাখের জায়গায় তিন লাখ তিরিশ হাজার আমরা পাচ্ছি?

হ্যাঁ।

উনি একটু থেমে একটু হেসে বলেন, তোমার মেয়ের বিয়ের আগে যে আরো তিনটে জাহাজে আমাদের যা মাল আসবে, তার থেকে মোটামুটি লাখখানেক অতিরিক্ত কমিশন পেয়ে যাবে।

বাঃ! দারুণ খবর শোনালেন।

তাই তো বলছিলাম, নিজের সম্মান প্রতিপত্তি অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থা করো। টাকাকড়ির জন্য ভাবতে হবে না।

সেদিন রাত্রেই নরোত্তম বড়বউকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, মেয়ের বিয়েতে কী দিতে চাও, কী করতে চাও।

আমি আবার কী বলব? তুমি যা ভাল মনে করো, তাই করবে।

হাজার হোক আমাদের একটাই মেয়ে। তার বিয়েতে তোমার কী দিতে ইচ্ছে করছে বা কি করতে চাও, তা তো বলবে।

আমি মেয়েটাকে গহনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাই।

বোধহয় পরশু দিন বিকেলেই নাদুবাবু ডিজাইনের বই নিয়ে আসবেন। তোমার পছন্দমতো সব গহনাই উনি গড়িয়ে দেবেন।

হীরের গহনাগুলোর কথাও কি ওঁকে বলব? নাকি তোমাদের...

সব গহনার দায়িত্ব নাদুবাবুর। তবে উনি বলেছেন, হীরের গহনাগুলো বোম্বাই থেকে তৈরি করিয়ে আনবেন।

হ্যাঁ, আমিও তাই চাইছিলাম।

নরোত্তম একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, বড় বউ, আমি কি জানি না, এখানকার তৈরি হীরের গহনা তোমার ভাল লাগে না?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তবে কাপড়-চোপড়ের জন্য তিন-চারজনকে বলে দেব। একজনের কাছে সব পছন্দমতো শাড়ি নাও পেতে পারো।

তবে কাঞ্জিলালবাবুকে আগে আসতে বলো।

হ্যাঁ, বলব।

বড়বউ একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন তুমি জামাইকে কী দিচ্ছো?

নরোত্তম একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, বিয়ের দানসামগ্রী হিসেবে যা দেওয়া উচিত তা নিশ্চয়ই দেব। তাছাড়া আর কী দেওয়া যায়, তাই ভাবছি।

আর কী দেওয়া যায় মানে?

এবার উনি মুখ তুলে বড়বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাজার হোক অত বড় বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। ওরা যেন না ভাবে, আমার মেয়েটা কোনো আলতু-ফালতু পরিবার থেকে এসেছে।

বড়বউ চুপ করে থাকলেও নরোত্তম একটু পরে আবার বলেন, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ঠিক করব, কী দিলে ও বাড়িতে আমার মেয়েটার সম্মান থাকে।

পাঁচ-সাত দিন না, দিন পনের পর জগদীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে পরামর্শ করে নরোত্তম ঠিক করলেন, বেশ কয়েক বছর আগে মিসেস শিলটনের কাছ থেকে কেনা ধর্মতলার একটা বাড়ি মেয়ে-জামাইয়ের নামে দানপত্র লিখে দেবেন।

খবরটা বড়বউকে জানিয়ে নরোত্তম মুচকি হেসে বললেন, সম্প্রদান হয়ে যাবার পর মেয়ে-জামাই-এর হাতে এই দানপত্র তুলে দিলে ঐ জাহাজের কারবারি নিত্যানন্দ রায় পর্যন্ত হাঁ হয়ে যাবে।

কেন? বাড়িটা কি খুব বড়?

ধর্মতলার সাহেবপাড়ায় দেড় বিঘে জমির উপর তিনতলা বাড়ি। ওখানে এখন বোধহয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় জমির দাম বাড়ছে।

তাই নাকি?

তবে কী?

নরোত্তম আবার একটু হেসে বলেন, বড়বউ, একদিন হয়তো কালীঘাট-ভবানীপুরও আমাদের বাগবাজার-আহিরীটোলার মতো জমজমাট হবে। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছর পরে হয়তো বেহালা বা টালিগঞ্জের মতো গ্রাম-গঞ্জগুলোতেও হাজার হাজার পাকা বাড়ি উঠে শহর হয়ে যাবে কিন্তু ধম্মতলা চিরকালই ধম্মতলা থাকবে।

বড়বউ চুপ করে ওঁর কথা শোনেন।

বুঝলে বড়বউ, তুমি বা আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকব না। তবে আমি বলে দিচ্ছি, এই একটা সম্পত্তির জন্যই তোমার নাতিরা বা তার ছেলেরা তোমাকে আর আমাকে পুজো করবে।

এতক্ষণ পর বড়বউ একটু হেসে বলেন, কিন্তু তার আগেই যদি তোমার মেয়ে-জামাই ঐ সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়?

নরোত্তম দু'হাতের দুটো বুড়ো আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, তা হবে না বড়বউ। সেসব রাস্তা বন্ধ না করে কি এই সম্পত্তি ওদের হাতে তুলে দেব? নরোত্তম মল্লিক অত কাঁচা কাজ করার মতো পাত্র না।

সারা কলকাতায় তখন জাহাজবড়ির ছেলের সঙ্গে নরোত্তম মল্লিকের মেয়ের বিয়ের আলোচনা। এমনকি বেঙ্গল ক্লাবের আড্ডাখানায় পর্যন্ত সাহেবরা ঐ একই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা না বলে পারেন না।

বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হোম সেক্রেটারি মিঃ গোল্ডস্মিথকে দেখেই বেঙ্গল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট স্যার আর্থার এগিয়ে গিয়ে একটু হেসে বললেন, হ্যালো গোল্ডস্মিথ, হঠাৎ একদিন পর ক্লাবে এলে কেন?

ইচ্ছে তো হয় রোজই ক্লাবে আসি কিন্তু রাইটার্স থেকে বেরিয়ে রোজই একবার গভর্নমেন্ট হাউসে যেতে হয়। তাই আর...

গভর্নর কী ক্যালকাটার বাইরে যে আজ ক্লাবে আসার সুযোগ পেলে?

ইতিমধ্যে ওঁদের চারপাশে আরো অনেকেই জড় হয়েছেন।

মিঃ গোল্ডস্মিথ হাসতে হাসতে বললেন, আজ ক্লাবে এসেছি ভেরি ফানি কারণে।

সবাই অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাতেই হোম সেক্রেটারি বললেন, হিজ একসেলেনসিই আমাকে ক্লাবে পাঠালেন আপনার মতো দু'একজনের সঙ্গে কথা বলতে।

এনিথিং সিরিয়াস?

নো স্যার আর্থার, নাথিং সিরিয়াস...

তবে?

আজ গভর্নমেন্ট হাউসে যেতেই হিজ একসেলেনসি একটু হেসে বললেন, গোল্ডস্মিথ, তোমার মতো আমিও ক্যালকাটায় নতুন। তাই বেঙ্গলি অ্যারিস্টোক্র্যাট সোসাইটির সোস্যাল কাস্টমস জানি না। সো, গো টু ক্লাব, টক টু ওল্ড ক্যালকাটা হ্যান্ডস্ লাইক স্যার আর্থার। জিজ্ঞেস করবে, বেঙ্গলিদের বিয়েতে কী উপহার দেওয়া যায়।

স্যার আর্থার হুইস্কির গেলাসে একটু চুমুক দিয়েই হাসতে হাসতে বললেন, গভর্নর

কি রয়দের রিসেপসনে যাবেন? নাকি...

ইয়েস, ইয়েস, হি ইজ গোয়িং দেয়ার।

আর বেঙ্গল চেম্বারের আমরা প্রায় সবাই যাচ্ছি মিঃ মালিকের বাড়ি।

মাই গড!

মিঃ গোল্ডস্মিথ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, হু ইজ দিস মালিক?

ক্যালকাটার চার-পাঁচজন বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের একজন।

আই সি!

গোল্ডেস্মিথ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, অ্যান্ড রয় ফ্যামিলি?

ওরা ইস্ট-ওয়েস্ট শিপিং কোম্পানীর মেজর শেয়ার হোল্ডার।

নাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই হিজ একসেলেনসি উইল বি গোয়িং দেয়ার।

স্যার আর্থার হুইস্কির গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন, হোয়াইটওয়ে লেডল'র মিঃ বল্ডউইনকে বললেই উনি গভর্নরের জন্য প্রেজেনটেশন পছন্দ করে পাঠিয়ে দেবেন। এর জন্য আপনাদের কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না।

মিঃ গোল্ডস্মিথ ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ভেরি গুড আইডিয়া।

সো ইউ আর নাউ ফ্রি টু এনজয় ড্রিঙ্কস?

অব কোর্স!

কৌন হ্যায়? জলডি হুইস্কি লে আও!

এধরনের বিয়ে বা উৎসব কলকাতায় বছর বছর হয় না। একমাত্র গভর্নরের পার্টি ছাড়া এ ধরনের ব্যবসার সুযোগও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল বিশেষ পায় না। তাই তো গ্রেট ইস্টার্নের ম্যানেজার মিঃ ব্রেইলি দু'তিনজন ভারতীয় সহকারীকে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন নরোত্তম মল্লিকের বাড়ি।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে আলাপ-আলোচনার পর নরোত্তম বললেন, মিঃ ব্রেইলি, আপনি বুঝতে পারছেন, কী ধরনের অতিথিরা আমার মেয়ের বিয়েতে আসছেন?

স্যার, গভর্নরের পার্টিতে যাঁরা আমন্ত্রিত হন, তাঁরা সবাইই আপনার মেয়ের বিয়েতে আসছেন।

তাই আমি আশা করি, আপনি বেস্ট ড্রিঙ্ক, বেস্ট ফুড, বেস্ট সার্ভিস দিয়ে ওঁদের ষোল আনা খুশি করবেন।

স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, গ্রেট ইস্টার্ন তার ঐতিহ্য ও আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে ত্রুটি করবে না।

আর হ্যাঁ, আই আমার অফিস থেকে পঁচিশ হাজার টাকর একটা চেক নেবার ব্যবস্থা করবেন।

সরি স্যার! আপনার মতো বিখ্যাত ও সম্মানিত মানুষের কাছ থেকে এক পয়সাও অ্যাডভান্স নিতে পারব না। আমাকে মার্জনা করবেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

মেয়ের বিয়ে তো নয়, এ যেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। নরোত্তম মল্লিকের প্রায় নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। শুধু উনি কেন, জগদীশ ভট্‌চাজ থেকে শুরু করে ষাট-সত্তরজন কর্মচারীরও একমুহূর্ত ফুরসত নেই। থাকবে কী করে? একে জাহাজবাড়ির লোকজন-আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে পরিবারিক সম্মান, তার উপর গণ্য-মান্য-বরেণ্য ইংরেজ অতিথিদের খুশি করে ভবিষ্যত ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করা।

নরোত্তম কোনো দিক দিয়েই কোনো ত্রুটি রাখছেন না। বিয়ের দান-সামগ্রী দেখে শুধু বড় বউ-এর না, সবারই চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। আশেপাশের প্রতিবেশীরা বলছেন, কোনো বিয়ে বাড়িতে এত বড় ম্যারাপ বাঁধা হয়নি কোনোদিন। বিয়ের আসরে সানাই বাজাতে আসছেন কাশীর বিখ্যাত ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেব। বৌভাতের দিন লাটসাহেব জাহাজবাড়ি যাবেন বলে নিত্যানন্দ রায় কলকাতা পুলিশের ব্যান্ড পার্টির ব্যবস্থা করেছেন শুনেই নরোত্তম বেঙ্গল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট স্যার আর্থারকে ধরে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মিলিটারি ব্যান্ড পার্টি আনার ব্যবস্থা পাকা করেছেন। তবে হ্যাঁ, তার জন্য উনি হাসিমুখে সৈনিক কল্যাণ ফান্ডে দশ হাজার টাকা দান করেছেন।

কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন দিন আগে যে ছোটবউ এমন অশান্তি করবেন, নরোত্তম তা স্বপ্নেও ভাবেননি।

সকালের ডাকে বিলেত থেকে বেশ কয়েকটি চিঠি এসেছে। তার মধ্যে দু'তিনটে ব্যবসা -বাণিজ্যের চিঠি ; বাকি সবগুলোই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকে। প্রায় সব চিঠির সঙ্গেই শ'খানেক পাউন্ডের একটা করে চেক।

নিছক সৌজন্যের খাতিরে এদের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তাঁরা যে এভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে চিঠি লিখবেন ও চেক পাঠাবেন, তা নরোত্তম স্বপ্নেও ভাবেননি। ।

যাই হোক, এই চিঠিগুলো পড়ার সময় কখন যে ছোটবউ এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা উনি খেয়ালই করেননি।

বলি, তুমি কী ভেবেছ বলো তো?

হঠাৎ ছোটবউ-এর কথা শুনেই নরোত্তম মুখ তুলে তাকান।

দুনিয়ায় আর কি কেউ কোনোদিন মেয়ের বিয়ে দেয়নি? এভাবে হরির লুঠের মতো টাকা উড়িয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তুমি কি আমার ছেলে দুটোকে পথের ভিখিরি করে দিতে চাও?

ছোটবউ-এর কথা শুনে নরোত্তমের গা জ্বলে যায়। তাই তো উনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, আঃ! কি আজেবাজে বকবক করছো?

হঠাৎ ছোটবউ হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলেত থেকে আসা চিঠিপত্র-চেকগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েই পাগলের মতো চিৎকার করে বললেন, এই মেয়ের বিয়েতে যত ব্যয় করছো, ঠিক তার ডবল টাকা আমার ছেলেদের বিয়ের জন্য এখনই দিতে হবে। তা না হলে....

না, নরোত্তম মল্লিক আর সহ্য করতে পারেননি। উনিও সঙ্গে সঙ্গে ছোটবউ-এর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়িয়েই চিৎকার করে বললেন, হারামজাদি, বড্ড বেশি বেড়ে গেছিস। আমি কি তোর বাপের টাকা খরচ করছি যে তোকে জবাব দিতে হবে! আজ আমি তোকে দূর করে না দিয়ে জলগ্রহণ করব না।

ওঁর ঐ চিৎকার শুনে সারা বাড়ির লোকজন চমকে ওঠে। বিয়ে-বাড়ির হাজার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সবাই কাজকর্ম থামিয়ে কর্তাবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

নরোত্তম চিৎকার করে ওঠেন, এই গণেশ! এই হরিদাস! কোথায় গেলি তোরা?

হরিদাস ছুটতে ছুটতে বারান্দার কোনায় হাজির হয়ে কর্তাবাবুকে ছোট গিন্নিমা'র চুলের মুঠি ধরে লাথি মারতে মারতে কি যা তা গালাগালি দিতে দেখেই ভয়ে কাঁপতে থাকে।

হরিদাস হঠাৎ লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেই নরোত্তম গর্জে ওঠেন, এই হারামজাদা, পালাচ্ছিস কোথায়? মথুরা সিংকে এখুনি গাড়ি বের করতে বল। এই হারামজাদিকে এখুনি ওর চোদ্দ পুরুষের বাপের বাড়ি বিদেয় করতে হবে।

না, ছোটবউও চুপ করে থাকেন না। উনিও কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করেই বলেন, যেখানে খুশি পাঠাও কিন্তু আমি খালি হাতে যাবো না, যাব না, যাব না।

তুই যাবি না তোর বাপ যাবে।

নরোত্তম আবার একটা লাথি মেরে ছোট বউকে শাসান।

ছোটবউ কাঁদতে কাঁদতেই চিৎকার করেন, আমাকে মেরে ফেললেও আমি ছেলেদের পাওনা না নিয়ে যাব না যাব না...

ওরে হারামজাদি, আমি তোর চোদ্দ পুরুষের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি।

দূর থেকে কর্মচারীরা এই দৃশ্য দেখলেও কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করে না। এরই মধ্যে কে যেন খবর দেয় জগদীশ ভটচাজ্ আর বড় দাদাবাবু সুবলকে।

সুবল দৌড়ে এসে বাবার হাত টেনে ধরে বলে, কী করছেন আপনি? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে ছোট মা-কে এভাবে...

এই ডাইনীকে আর ছোট মা বলে ডাকতে হবে না। এই হারামজাদি সব্বনাশ করার জন্যই...

আঃ বাবা! চুপ করুন।

সুবলও চিৎকার করে ওঠে।

ইতিমধ্যে বুড়ো ভোলানাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে বড়বউ এসে হাজির হতেই সুবল চিৎকার করেই বলে, মা, শিগগির ছোট মা-কে নিয়ে যাও।

বড়বউ অবাক হয়ে বলেন, কী ব্যাপার কী? তোর বাবা আর ছোট মা'র...

ওর কথাটা শেষ হবার আগেই নরোত্তম গর্জে ওঠেন, এই হারামজাদিকে এখনই ঝাঁটা মেরে দূর করে দাও।

ছোটবউও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলেন, নিজে বেশ্যা মাগীদের জন্য দু'হাতে টাকা ওড়াবেন, মেয়ের বিয়েতে লাখ লাখ খরচ করবেন আর আমার ছেলে দুটো কি রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবে?

আমি সব সম্পত্তি দেবোত্তর করে দেব কিন্তু তোকে একটা তামার পয়সাও দেব না।

এবার বড়বউ চিৎকার করে ওঠেন, তোমরা দু'জনে চুপ করবে নাকি আমি গলায় দড়ি দেব?

উনি মুহূর্তের জন্য না থেমেই সুলকে বলেন, বড় খোকা, তোর বাবাকে ঘরে নিয়ে যা।

সুবল ওর বাবাকে জোর করে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবার পর পরই বড়বউ কোনোমতে ছোট সতীনকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা তখনকার মতো থেমে গেলেও সমস্যাটা যে মিটল না, তা সবাই বুঝলেন। এ বাড়ির একমাত্র মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ে নিয়ে যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা আর রইল না। সমস্ত বাড়ির মানুষগুলোর মুখ থেকে হঠাৎ হাসি-খুশির ভাব হারিয়ে গেল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মাধুরীলতার বিয়ে বেশ ভালভাবেই মিটে গেল। বিয়ের পরদিন সন্ধের সময় পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে যাবার আগে পাইকপাড়া জাহাজবাড়ির বড়কর্তা স্বয়ং নিত্যানন্দ রায় নরোত্তম মল্লিকের দু'হাত ধরে বললেন, মল্লিকমশাই, কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো, তা ভেবে পাচ্ছি না। তবে শুধু এইটুকু বলে যাই, কাশিমবাজার বা বর্ধমানের মতো দু'চারজন রাজা-মহারাজারাও বোধহয় এভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন না।

নরোত্তম সবিনয়ে একটু হেসে বলেন, কি যে বলেন বেয়াইমশাই, রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে কি আমার মতো চুনো-পুঁটি ব্যবসাদারের কোনো তুলনা হয়?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনাদের সম্মান-মর্যাদা রাখার মতো তো কিছুই করতে পারলাম না।

না, না মল্লিকমশাই, ও কথা বলবেন না।

নিত্যানন্দ রায় হাসতে হাসতে বলে যান, আপনি মেয়ে-জামাইকে যে দান-সামগ্রী দিয়েছেন, অতিথিদের আদর-আপ্যায়নের জন্য যে সুন্দর বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, যে ধরনের গণ্যমান্য অতিথি সমাগম হয়েছিল, সেসব দেখে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছে। আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো, তা ভেবে পাচ্ছি না।

না, না, বেয়াইমশাই, ধন্যবাদ জানাবেন কেন? আমি তো আমার কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

নরোত্তম একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আপনি বাবাজীবনের পিতৃদেব। যদি আপনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তা হলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

একশ'বার আমি খুশি হয়েছি।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনেই ওঁরা দু'জনে আর কোনো কথা বলেন না।

নরোত্তম পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, মাধুরীলতা আর বড়বউ দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কাঁদছে আরো অনেকে। সুবল তো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভিতরেই চলে গেল।

ঐসব কান্নাকাটি দেখতে দেখতে নরোত্তম একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মাধুরীলতাকে আবার খুব জোরে কেঁদে উঠতে শুনেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, ছোটবউ-এর ছোট ছেলে সুশীলকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ও বলছে, ছোড়দা, আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

সুশীলও পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলছে, মাধু, তোকে ছেড়ে আমিও থাকতে পারবো না।

তবু গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই মাধুরীলতা স্বামীর সংসারে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বিচিত্র শূন্যতা ও নীরবতায় ডুবে যায় মল্লিকবাড়ি।

ক্লান্ত বিষণ্ণ নরোত্তম মল্লিক সদরের বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে চুপচাপ শুয়েছিলেন আর আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন।

হঠাৎ বড়বউ পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, অনেক রাত হলো। ঘরে যাবে না?

ও! তুমি?

নরোত্তম ওঁকে দেখেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বড়বউ, মাধু চলে গেলেও মনটা খুশিতে ভরে গেছে।

অমন পরিবারের একটা ভাল ছেলের হাতে মেয়েকে দিতে পারলাম বলে আমিও খুব খুশি।

হ্যাঁ, বড়বউ, জগৎনারায়ণ ছেলেটি সত্যি ভাল।

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ্ নেই।

বড়বউ একটু হেসে বলেন, ছেলেটার কথাবার্তা শুনে আমার বুক জুড়িয়ে গেছে।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন, জামাই দেখে তো আত্মীয়-স্বজনের চক্ষুস্থির হয়ে গেছে।

কেন?

কেন আবার?

বড়বউ এক নিঃশ্বাসেই বলে যান, একে অমন বিখ্যাত বাড়ির ছেলে, তার উপর রূপে-গুণে এত ভাল জামাই যে আমাদের কপালে জুটবে, তা কেউ ভাবতেই পারেনি।

বড়বউ, তুমি বা আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম, মাধুকে এমন গুণী ছেলের হাতে তুলে দিতে পারব?

নরোত্তম মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সবই মা সিদ্ধেশ্বরীর কৃপা।

সে তো একশ'বার সত্যি। মা'র কৃপা না হলে কি এসব হয়?

তবে বড়বউ, আমি আরো একটা কারণে খুব খুশি।

বড়বউ একটু অবাক হয়েই বলেন, আবার কী কারণে খুশি?

নরোত্তম বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, মাধু চলে যাবার সময় মেজখোকা আর ছোট খোকার কান্নাকাটি দেখে বুঝলাম, ছোটবউ চেষ্টা করলেই বোধহয় আমার সংসারটা ভাঙতে পারবে না।

বড়বউ একগাল খুশির হাসি হেসে বলেন, তুমি তো সংসারের কোনো খবরই রাখো না। তাই তো জানো না, এই এত বড় হলেও ছোটখোকাকে এখনও আমার ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কি?

বড়বউ প্রায় না থেমেই বলে যান, আমি ওর গায়-মাথায় হাত না দিলে ওর ঘুমই আসে না। আর তাই নিয়ে মাধু ওকে কি ঠাট্টাই করতো!

সতের-আঠারো বছরের ছেলেরও গায়-মাথায় হাত না দিলে ঘুম আসে না?

বড়বউ চাপা হাসতে হাসতে বলেন, এই ক'বছর আগে পর্যন্ত তো তুমি ছোটবউকে কাছে না পেলে ঘুমুতে পারতে না। তাই তো মাধুর মতো ছোট খোকাও...

ছোটবউ কিছু বলতো না?

আবার বড়বউ চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, ছোট তো তোমাকে ছাড়া ঘুমতো পারত না। তাই তো...

এবার নরোত্তম একটু হেসে বলেন, শুধু ছোটবউকে কেন দোষ দিচ্ছে কি? এর আগে তুমিও কি আমাকে ছাড়া ঘুমুতে পারতে?

স্বামীর কাছে শুতে কোন মেয়ের ইচ্ছে করে না?

বড়বউ স্বামীর একটা হাত ধরে সামান্য একটু টান দিয়ে বলেন, চল, চল, ভিতরে শোবে চল।

নরোত্তম উঠে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করেন, আজ কি তোমার কাছে শোব?

না, না, আমার কাছে শুতে হবে না।

উনি না থেমেই বলে যান, যাও, যাও, ছোটর ঘরে যাও। তুমি একটু আদর-টাদর করলেই ওর রাগ চলে যাবে।

পরের দিন সকালে স্বামী আর তিন ছেলেকে জলখাবার খেতে দিচ্ছিলেন বড়বউ। স্নান করে ছোটবউ সেখানে এসেই সবার সামনে বললেন, দিদি, মাধুর ফুলশয্যার তত্ত্ব আমি সাজাব। তুমি নাক গলাতে পারবে না।

বড়বউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উনি বলে যান, এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে তত্ত্ব পাঠাব যে জাহাজবাড়ির কর্তা-গিন্নিদের মাথা ঘুরে যাবে।

বড়বউ আপনমনে একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুইই ও সব সাজাবি। আমি ওসব পারি নাকি?

এবার ছোটবউ হুকুম করেন, এই বড় খোকা, তত্ত্ব সাজাবার জন্য আজ বিকেলে আমাকে কিছু জিনিস এনে দিতে হবে।

সুবল মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, ছোট মা, এনে দেব।

নরোত্তম আর ছেলেরা খেয়েদেয়ে চলে যেতেই বড়বউ সতীনের গাল টিপে আদর করে একটু চাপা গলায় বলেন, কাল রাত্তিরে মল্লিকমশাই বোধহয় একটু বেশি আদর করেছেন, বেশি আনন্দ দিয়েছেন, তাই না রে?

ছোটবউও হাসতে হাসতে বলেন, মল্লিকমশায়ের সোহাগ করার ধরন বুঝি তুমি জানো না, তাই না দিদি?

সে সব অল্প বয়সের কথা। এখন কি সেসব মনে আছে!

ইস! ভুলে গেছি!

ছোটবউ একটু থেমে একটু হেসে বলে, এসব কথা কি কেউ কোনোদিন ভুলে যায়?

বড়বউ দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, যাই বল ছোট, মল্লিকমশাই বেশ

রসিক লোক, তাই না রে?

ছোটবউ একগাল হাসি হেসে বলেন, লোকটা যেন দিন দিন আরো বেশি রসিক হচ্ছে।

কাল রাত্তিরে উনি যে একটু বেশি রসিকতা করেছেন, তা তোর চোখ-মুখ দেখেই বুঝেছি।

হাসতে হাসতে কথাটা বলেই বড়বউ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, দ্যাখ ছোট, তোকে একটা কথা বলি।

ছোটবউ ওঁর দিকে তাকাতেই উনি বলে যান, মল্লিকমশাই একটু আনন্দ-ফুর্তি করতে ভালবাসেন ঠিকই কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, এই মানুষটা একা শুধু বুদ্ধির জোরে ব্যবসা-বাণিজ্য এমন বাড়িয়েছেন যে বড় বড় সাহেবরা পর্যন্ত তাঁকে খাতির না করে পারে না।

সে তো ঠিকই।

তাই তো বলছি, আমরা দু'জনের কেউই যেন এমন কিছু না করি, যাতে ওঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বা সম্মান নষ্ট হয়।

না, না, দিদি, আমি তা কখনই করবো না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার বৌদি আমার মন বিষিয়ে না দিলে সেদিনের মতো কেলেঙ্কারি কখনই...

সেদিনের কথা তুই ভুলে যা।

বড়বউ ও'র দুটি হাত ধরে বলে যান, দ্যাখ ছোট, মল্লিকমশাই আর চারটে ছেলেমেয়ে নিয়েই তোর আর আমার সংসার। এই সংসারের ভাল-মন্দ নিয়েই তো আমাদের থাকতে হবে। আমাদের সংসারের ব্যাপারে বাইরের কাউকে নাক গলাতে দিলে কী তোর আর আমার সম্মান বাড়বে, নাকি তিনটে ছেলে সুখে থাকতে পারবে?

ছোটবউ দু'হাত দিয়ে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, দিদি, সত্যি বলছি, এই সংসার নিয়ে তোমার মতো আমি এত কিছু কোনোদিনই ভাবিনি। তাই তো দিনের পর দিন দাদা-বৌদির কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল...

কী মনে হয়েছিল, তা আর তোকে বলতে হবে না।

বড়বউ একগাল হেসে ওকে বলেন, এবার থেকে তোর সব দুঃখের কথা আমাকে বলিস। তারপর আমি যদি তোর দুঃখ দূর করতে না পারি, তাহলে যাকে ইচ্ছে বলিস।

না, না, দিদি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমাদের সংসারের ব্যাপারে বাইরের কারোর সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবো না।

এবার ছোটবউ একগাল হাসি হেসে বলেন, দিদি, তুমি বড্ড ভাল। আজ সারারাত ধরে তোমার গলা জড়িয়ে শুয়ে তোমাকে প্রাণভরে আদর করবো।

দূর হতভাগী!

বড়বউও হাসতে হাসতেই বলেন, অমন রসিক স্বামীকে ফেলে কোন দুঃখে আমার গলা জড়িয়ে শুবি?

মল্লিকবাড়ি আবার হাসি-খুশিতে ভরে উঠলেও নরোত্তমের মন থেকে সন্দেহের মেঘ দূর হয় না। হাজার হোক টাকা দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল। তাইতো ভবিষ্যতে যে কোনো কেলেঙ্কারি ঘটবে না বা তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না, তার কি কোনো ঠিকঠিকানা আছে?

নরোত্তম আপনমনেই বলেন, এত বছর ধরে পাগলের মতো পরিশ্রম করে যে বিষয়-সম্পত্তি-টাকাকড়ি করেছি, তা নিয়ে ছেলেরা ছিনিমিনি খেলবে, সে আমি কখনই হতে দেব না।

কিন্তু ঠিক কী করা উচিত, তা ঠিক ভেবে পান না। তাছাড়া ভালভাবে ভাবনা-চিন্তা করার মতো অবকাশও ওঁর হয় না। তাইতো উনি মনে মনে ঠিক করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের শত কাজ থাকলেও কয়েক দিনের জন্য বাইরে কোথাও যেতে হবে।

কয়েক দিন পর উনি জগদীশ ভটচাজ্‌মশাইকেই প্রথম বলেন, ভটচাজ্‌ মশায়, একটা বিশেষ জরুরি কাজে আমাকে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে। তাছাড়া শরীরটাও বিশেষ সুবিধার নেই। তাই ভাবছি, বাইরে যখন যেতেই হবে, তখন দু'চারদিন বিশ্রাম নিয়েই ফিরব।

তোমাকে তো কতদিন ধরেই বলছি, দিন কয়েক পুরী বা কাশী ঘুরে এসো, কিন্তু...

হ্যাঁ, আপনি অনেকবারই বলেছেন কিন্তু যখনই যাবো ভাবি, তখনই এমন সব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে কলকাতার বাইরে পা বাড়াতেই পারি না।

তুমি কতদিনের জন্য বাইরে যাবে?

স্যার আর্থারের অনুরোধে যাচ্ছি, তাই ঠিক বলতে পারছি না, ক'দিনের মধ্যে ফিরব।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, তবে দিন দশেকের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না।

দিন দশেকের মধ্যে ফিরে এলে ঠিকই আছে কিন্তু তার বেশি হলে হয়তো এম্পায়ার টেক্সটাইলের কাপড়-চোপড়ের জাহাজটা এসে হাজির হবে। তখন তো তোমাকে....

ও জাহাজ কি রওনা হয়েছে?

দু'একদিন আগে হয়তো রওনা হয়েছে অথবা দু'একদিনের মধ্যেই রওনা হবে বলেই তো ওরা জানিয়েছিল। আশা করছি আজকালের মধ্যেই টেলিগ্রাফ এসে যাবে।

ও জাহাজ পৌঁছবার আগে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব।

তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পার।

পরের দিন সকালে জলখাবার খেতে খেতে নরোত্তম বড়বউ-এর দিকে তাকিয়ে

বললেন, জরুরি কাজে আমাকে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে।

কয়েক দিন মানে?

ঠিক জানি না ; তবে বোধহয় সাত-দশ দিন লেগে যাবে।

বড়বউ মুহূর্তের জন্য চাপা হাসি হেসে সতীনের দিকে তাকিয়েই বলেন, যাবে যাও কিন্তু ছোটকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ও না থাকলে কে তোমার দেখাশুনা করবে?

আমি কি বেড়াতে যাচ্ছি যে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবো?

নরোত্তম না থেমেই বলে যান, আমি দু'জন সাহেবের সঙ্গে জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি।

বড়বউ এবার অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলেন, তা তো তুমি আগে বলোনি ; তাই....

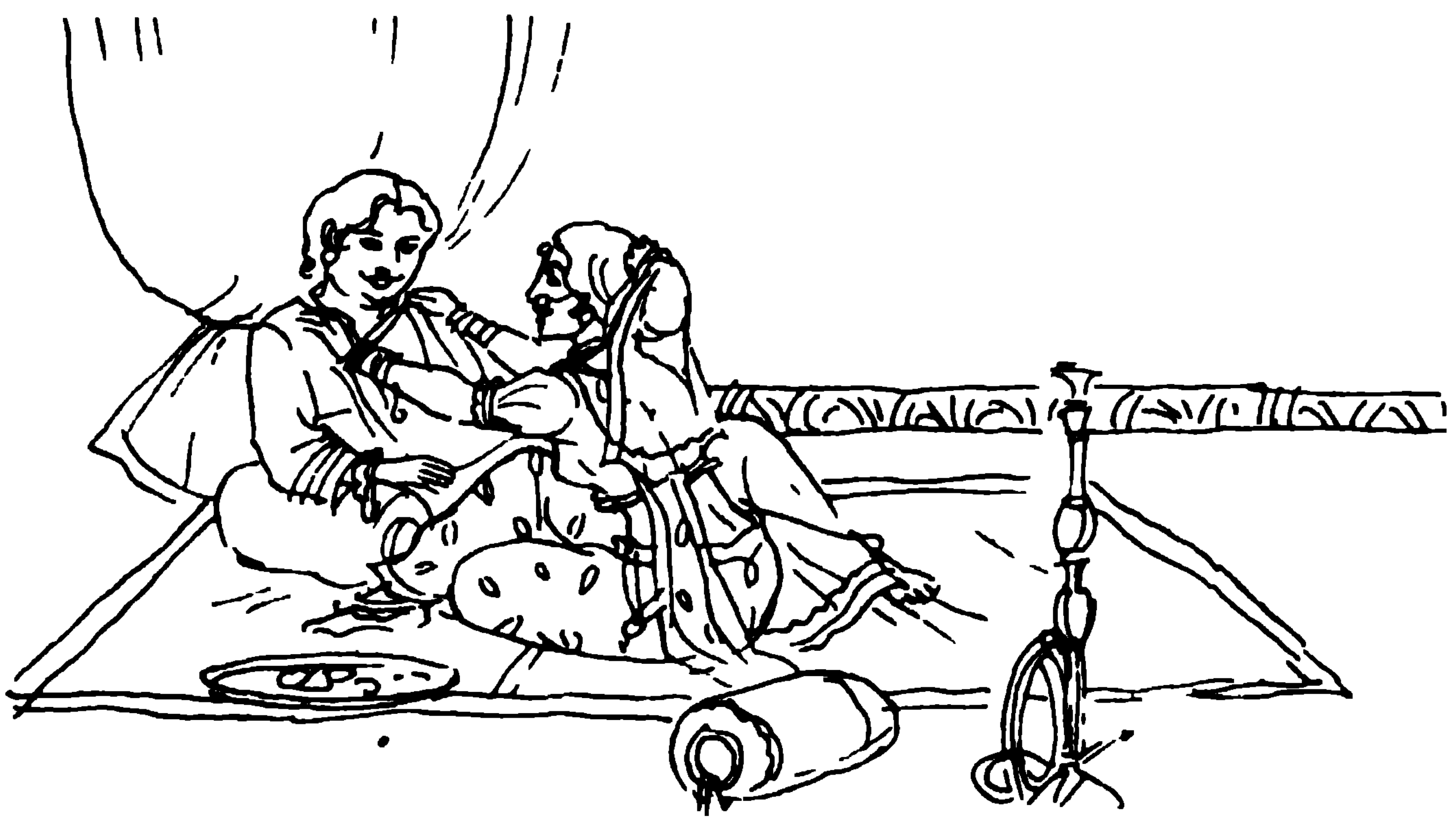

সেদিনই সন্ধে ঘুরতে না ঘুরতেই নরোত্তম সাবিত্রীর কাছে হাজির।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওঁর একটা হাত ধরে বলল, এসো, এসো। দু'তিন দিন ধরে শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই নরোত্তম জিজ্ঞেস করেন, আমার কথা কেন ভাবছিলি? কোনো দরকার....

না গো না।

নরোত্তম ফরাসের উপর বসে তাকিয়ে হেলান দিতে না দিতেই সাবিত্রী ওঁর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বলে যায়, ভাবছিলাম, মেয়ের বিয়ের ঝক্কি সামলাতে গিয়ে আবার শরীরটা খারাপ হলো না তো!

সত্যি কি ঝক্কি যে গেল, তা আর তোকে কি বলব! শরীরটা বড্ড কাহিল হয়ে গেছে।

নরোত্তমের মাথায় মুখে হাত দিতে দিতে সাবিত্রী বলে, সাধারণ মানুষই মেয়ের বিয়ে দিতে হিমশিম খেয়ে যায় আর তোমার মেয়ের বিয়েতে তো সারা কলকাতা শহর

তোলপাড় হয়ে গেছে।

নরোত্তম একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, তুই ঠিকই বলেছিস। সত্যি মাধুর বিয়েতে সারা কলকাতা শহর তোলপাড় করে দিয়েছি।

সব সাহেবরা এসেছিল?

সব্বাই।

নরোত্তম একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, এমনকি বিলেত থেকে কত সাহেব চিঠি আর টাকা পাঠিয়েছে, তা তুই ভাবতে পারবি না।

সাবিত্রী দু'হাত দিয়ে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে গদগদ হয়ে বলে, শালা সাহেবরা বেনের জাত। ওরা খুব ভাল করেই জানে, এখানে তোমার মতো মালদার পার্টি বিশেষ নেই। তাই....

তা ঠিক! তবে এবার কাজের কথা শোন।

না না, আজ কোনো কাজের কথা শুনতে চাই না। আজ শুধু প্রাণভরে তোমাকে আদর করবো।

এবার নরোত্তম ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, ওরে মাগী, তুই আর আমি প্রাণভরে ফুর্তি করব বলেই একটা প্ল্যান করেছি।

শুনি কী প্ল্যান করেছ।

চল, আমরা কোথাও বেড়াতে যাই।

কথাটা শুনেই সাবিত্রী আনন্দে খুশিতে ভরে ওঠে। বলে, সত্যি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে?

নরোত্তম অত্যন্ত বিষাদের সুরে বলেন, মাঝে-মাঝে দু'এক ঘণ্টার জন্য তোকে কাছে পেয়ে কি মন ভরে? তাইতো ভাবছি, দিন কয়েকের জন্য তোকে নিয়ে বাইরে চলে যাই।

কোথায় যাবে? কাশী?

না না, কাশী বা পুরী যাব না। ও দুটো জায়গায় কলকাতার লোকজন যখন-তখন গিয়ে হাজির হয়।

তাহলে কোথায় যাবে?

তুই বল।

আমি কী বলব? আমি কি কোথাও গেছি?

তুই কোথায় যেতে চাস? পাহাড়ে? জঙ্গলে? নাকি সমুদ্রের ধারে?

সাবিত্রী মুহূর্তের জন্য একটু ভেবে-চিন্তেই একগাল হাসি হেসে বলে, চল, চল, পাহাড়ে যাই। আমি কোনোদিন পাহাড় দেখিনি।

ঠিক আছে, তোকে পাহাড়েই নিয়ে যাব।

কবে আমরা যাব?

বেশি দেরি করব না। একটু বিধিব্যবস্থা করেই রওনা দেব।

নরোত্তম একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রায় স্বগতোক্তি করেন, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চল। ক'দিন প্রাণভরে তোমাকে আদর-যত্ন সেবা করি।

চা-জলখাবারের বিধিব্যবস্থা করার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সাবিত্রী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুধু টাকা রোজগার আর পরিবার প্রতিপালন ছাড়া কোনোদিন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তো নজর দিলে না।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

নরোত্তম মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলেন, প্রায় নেশার ঘোরে বছরের পর বছর পাগলের মতো কাজ করে গেছি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নেবার দরকার।

যাই হোক, সেদিন বিদায় নেবার আগে নরোত্তম বলেন, তুই বাক্স-টাক্স গোছাতে শুরু কর।

বিছানাপত্র কি তুমি নেবে?

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, ওরে মাগী, বিছানাপত্র নিতে হবে না। জামাকাপড় ছাড়া সঙ্গে কিছু নিতে হবে না।

সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েক ধাপ নেমে যাবার পর উনি আবার উঠে এসে একটু চাপা গলায় বলেন, আমার কোথায় যাচ্ছি, তা যেন তোর কাজের লোকজনও না জানে।

না না, কেউ জানবে না।

নরোত্তম মল্লিক অসম্ভব হিসেবী কিন্তু কৃপণ না। বউ-ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে কর্মচারীরা পর্যন্ত বলতে পারবে না, উনি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখেন না বা তাদের প্রতি কর্তব্য করেন না। জগদীশ ভট্চাজ্‌কে বলা আছে, যে কোনো কর্মচারীর ছেলেমেয়ের বিয়েতে আড়াই শ' টাকা আশীর্বাদী পাঠাবেন। পুজোর সময় বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কর্মচারীকেও একখানি করে ধুতি দেওয়ার রীতি ছিল। তবে হ্যাঁ, কাজকর্মের ব্যপারে পানের থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ!

এইতো বছর তিনেক আগেকার কথা। প্রতি বছরের মতো সেবারও উনি দুই বউ আর চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে মধুপুর গিয়েছেন। সঙ্গে জনা পাঁচেক কাজের লোক। ওদের মধ্যে মাখনের কাজ বাজার-হাট করা আর ফাইফরমায়েশ খাটা।

সকালবেলায় দুই বউয়ের সঙ্গে কথা বলে ভটচাজ্‌মশাই ফর্দ করে টাকাকড়ি দিয়ে মাখনকে বাজার পাঠাতেন। সকালে গোয়ালা বাড়ির সামনে গরু এনে দুধ দুইয়ে দিত

কিন্তু বিকেলে মাখনই দুধ আনতে গোয়ালার ওখানে যেত।

সেদিন মাখন বাজার থেকে ফিরতেই নরোত্তম ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ফর্দ মতো সব এনেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেখি ফর্দটা।

মাখন ওঁর হাতে ফর্দ দিতেই মল্লিকমশাই চিৎকার করে বললেন, এই মদন দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে আয়।

মদন দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসতেই মাখন হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে নরোত্তমের দুটি পা জড়িয়ে ধরে বলে, কর্তাবাবু, জীবনে আর কখনো চুরি করব না। দয়া করে এবারের মতো ক্ষমা করে দেন ; তা না হলে....

নরোত্তম মল্লিক এক লাথি মেরেই চিৎকার করে উঠলেন, হারামজাদা, আমি দুধ-কলা দিয়ে এতকাল সাপ পুষেছি! তোকে আমি জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব।

উনি প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলেন, ভটচাজ্‌মশাই, এখনই থানায় খবর দিন।

হঠাৎ বড়বউ এগিয়ে এসে বললেন, আজ মেজখোকার জন্মদিন। আজ আর থানা-পুলিশ করো না।

উনি একটু থেমে বলেন, এই মাখন, কর্তার পা ধরে ক্ষমা চা।

মাখন বার বার ক্ষমা চাইবার পর নরোত্তম বললেন, ঠিক আছে তোকে পুলিশে দেব না কিন্তু তুই তিন মাস মাইনে পাবি না।

যাই হোক, নরোত্তম মল্লিক তাঁর এক 'স্ত্রীকে' নিয়ে দার্জিলিং-এ বিশ্রাম নিতে যাবেন বলে অনেক সাহেবই হাসিমুখে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। ইন্টার ক্লাস — সেকেন্ড ক্লাস না, একেবারে ফার্স্ট ক্লাসে ওদের যাবার ব্যবস্থা হলো। রেল কোম্পানির চিফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ হাওয়ার্ড স্বয়ং হুকুম দিলেন, মিঃ ও মিসেস মালিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দৃষ্টি রাখতে। বেঙ্গল চেম্বারের সাহায্যে দার্জিলিং-এ সরকারি ইন্সপেকশন বাংলোয় থাকারও বিধিব্যবস্থা হবার পর নরোত্তম মুখ টিপে হাসতে হাসতে সাবিত্রীকে বললেন, তুই বোধহয় দার্জিলিং থেকে আর ফিরে আসবি না।

ফিরে আসব না কেন?

ওরে মাগী, এত আরামে থাকবি যে আর এই বউবাজারে ফিরে আসতে মন চাইবে না।

সাবিত্রী চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, দার্জিলিং-এ গিয়ে কি আমি মহারানী হয়ে যাব, যে ঐ রাজত্ব ছেড়ে আর আসতে চাইব না?

আগে চল ; তারপর বলিস।

হ্যাঁ, দার্জিলিং-এ পৌঁছে সাবিত্রী এক গাল হাসি হেসে বলেছিল, সত্যিকারের মহারানীরাও বোধহয় এত সুখে, এত আরামে থাকে না। মাত্র দুটো লোকের জন্য এতগুলো চাকর-বাকর! সত্যি ভাবা যায় না।

নরোত্তম চাপা হাসি হেসে বললেন, ওরে মাগী, তোর ভাল লাগছে কিনা, তাই বল।

সাবিত্রী দু'পা এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দারুণ ভাল লাগছে। কলকাতায় আর কোনো মিনসে নেই, যে আমাকে এত সুখে রাখতে পারে।

প্রথম দুটো দিন শুধু খাওয়া-দাওয়ার সময় ছাড়া নরোত্তম সাবিত্রীর সঙ্গে শুধু রঙ্গ-রস আমোদ-ফুর্তি করেই কাটিয়ে দিলেন। পরের দিন থেকে একটু-আধটু ম্যালের দিকে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া নরোত্তম বাংলো ছেড়ে বেরুতেন না। সাবিত্রীকে নিয়ে প্রাণভরে আনন্দ করার মাঝে মাঝেই নরোত্তম অপলক দৃষ্টিতে দূরের হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

দু'একদিন পরই সাবিত্রী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁগো, তুমি যখন তখন কি এত ভাব বল তো?

না, না, তেমন কিছু না।

না বললেই আমি মেনে নেব? আমি কি তোমায় নতুন দেখছি?

সাবিত্রী প্রায় না থেমেই বলে যায়, তোমাকে এভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে দেখলে কি আমার ভাল লাগে? তুমি ভাল না থাকলে যে আমিও ভাল থাকতে পারব না, তা কি বুঝতে পার না?

নরোত্তম এবার মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেও মুখে কিছু বলেন না।

সাবিত্রী ওঁকে কোলের উপর শুইয়ে মাথায়-মুখে হাত দিতে দিতে বলে, আমি তোমার বিয়ে করা বউ না হলেও আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তা কি তুমি বুঝতে পারো না, নাকি বিশ্বাস কর না?

আমি কি তাই বলেছি?

সাবিত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বেশ গম্ভীর হয়েই বলে, দ্যাখো মল্লিকমশাই, আমি সতী-সাবিত্রী না। মুখের মিষ্টি বুলি আর এই শরীরটাকে খেলিয়েই তোমাদের মতো কামুক মানুষকে খুশি করে খেয়ে-পরে টিকে আছি। কিন্তু তাই বলে কি আমার মন বলে কিছু নেই?

হাজার হোক সাবিত্রী একজন বারবণিতা। ছলে-বলে কৌশলে পুরুষের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই ওদের মতো মেয়েরা জীবন কাটায়। আবেগ-ভালবাসায় ওরা

কখনই নিজেদের জড়ায় না। কিন্তু আজ সাবিত্রীর কথা শুনে নরোত্তমের হঠাৎ মনে হয়, এই পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মতো সাবিত্রীও তো রক্ত-মাংসের মানুষ! তারও সুখ-দুঃখ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা থাকাই তো স্বাভাবিক। ভাগ্যের বিড়ম্বনায়, পেটের দায়ে বারবণিতা হয়েছে বলে কি সে কোনো না কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারে না?

নরোত্তম মুখে কিছু বললেন না। শুধু মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সাবিত্রী ওঁকে আদর করতে করতেই বলে, বল, তোমার কী হয়েছে! আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ও একটু হেসে বলে, আমি তোমাদের মতো সংসারী না হলেও আমারও সাংসারিক বুদ্ধি আছে। ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা না থাকলে কি আজ তুমি আমার কোলে এভাবে শুয়ে থাকতে? নাকি মহারানীর মতো এত আরামে থাকতে পারতাম?

এবার আর নরোত্তম চুপ করে থাকেন না। মাধুরীলতার বিয়ের তিন দিন আগে ছোটবউ কি কেলেঙ্কারি করেছিল তা গড়গড় করে বলার পর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সেদিন থেকেই মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে।

কীসের ভয়?

এত বছর ধরে এত কষ্ট করে যে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তি করেছি, তা রেখে যেতে পারব তো?

সাবিত্রী একটু হেসে বলে, কদাচিৎ কখনও সব সংসারেই এই ধরনের অশান্তি হয়, কিন্তু তাই বলে কি সব সংসারই ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায়?

কিন্তু টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি বড় খারাপ জিনিস। সামান্য বিবাদ-বিসম্বাদ বা সন্দেহের জন্য চোখের সামনে কত বড় বড় পরিবারের সর্বনাশ দেখেছি বলেই ভয় হয়।

তা ঠিক।

একটু চুপ করে থাকার পর সাবিত্রী বলে, তিন ছেলেকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দেবার কথা ভেবেছ কি?

না।

কেন?

বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাগাভাগি করে দিলেই সাহেবরা ভাববে, আমরা ডুবতে বসেছি। তাই ওরা আর আমাদের বিশেষ পছন্দও করবে না, সাহায্যও করবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তাছাড়া আমার সব ব্যবসা থেকেই লাখ লাখ টাকা আয় হয়। সেই সব ব্যবসা ছেলেদের হাতে পড়লে কি ওরা মাথা ঠিক রাখতে পারবে?

সাবিত্রী মনে মনে কী যেন ভাবে। তারপর জিজ্ঞেস করে, তুমি কী চাও?

যতদিন আমার শরীর ঠিক থাকবে, ততদিন আমিই সবকিছু নিজের হাতে রাখতে চাই। তারপর অবস্থা বুঝে, ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেব।

তিন ছেলেকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চাও না?

চাই কিন্তু...

নরোত্তম কথাটা শেষ করেন না।

সাবিত্রী বলে, থামলে কেন? কথাটা শেষ কর।

নরোত্তম অসহায়ের মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বড় ছেলেটাকে নিয়েই আমার ভয় হয়।

সাবিত্রী অবাক হয়ে বলে, ভয় হয় মানে!

ও প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে, বড়বউ-এর ছেলেকে নিয়ে তো কোনো দুঃশ্চিন্তা হবার কথা নয়।

নরোত্তম একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, বড়বউ ভাল হলে কি হবে ও তো আমারই ঔরসে জন্মেছে।

তাতে কী হলো?

আমারই মতো ওরও মেয়েছেলের রোগে ধরেছে।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, তবে আমার এ রোগ ধরেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকাকড়ি রোজগারের পর, আর ঐ হতভাগাকে....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞেস করে, বড় খোকার কত বয়স হলো।

এইতো কুড়িতে পড়ল।

ও কি এরই মধ্যে আমাদের মতো খারাপ মেয়েদের কাছে যেতে শুরু করেছে?

না, না। নরোত্তম একটু থেমে বলেন, সে সাহসও নেই, টাকাও নেই।

তবে?

সে এক কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

বাড়ির কোনো ঝি-এর সঙ্গে...

না, না, ঝি-টি না।

তবে?

হতচ্ছাড়া ওর এক মাসির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

মাসি? আপন মাসি?

না, না, আপন মাসি না ; ছোটবউ-এর দূর সম্পর্কের এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে...

ওদের বিয়ে দেওয়া যায় না?

মেয়েটা তো বিধবা।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে মেয়েটা বাপের বাড়ি চলে আসে কিন্তু তাদের অবস্থা খারাপ বলে ছোটবউ তার এই বোনকে নিজের

কাছে এনে রেখেছে।

মেয়েটার বয়স কত?

আঠারো, উনিশ বা কুড়ি হতে পারে। তবে মেয়েটা কি অসম্ভব সুন্দরী তা তুই ভাবতে পারবি না।

একটু চুপ করে থাকার পর সাবিত্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি ওদের ব্যাপারটা জানলে কী করে? বড়বউ বা ছোটবউ বলেছে?

না, না, ওরা দু'জনের কেউই জানে না।

ওরা জানে না, অথচ তুমি জেনে গেলে?

ওদের না জানার কারণ আছে।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, পিছনের দিকে তিনতলার তিনখানা ঘর আমাদের তিনজনের।

মানে তোমার আর দুই বউয়ের?

হ্যাঁ।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, দোতলায় অনেকগুলো ঘর।...

অনেকগুলো ঘর?

হ্যাঁ ; মানে বারান্দার দু'পাশে তিনখানা করে ছ'খানা ঘর আছে।

ওগুলো কি ছেলেমেয়েদের ঘর?

হ্যাঁ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আত্মীয়-স্বজনরা এলে ঐ দোতলার দুটো-একটা ঘরে থাকে।

যাই হোক এবার আসল কথা বল।

নরোত্তম বলেন, রাত্তির বেলায় শোবার সময় মাধু আর ছোটখোকা বরাবরই বড়বউ-এর কাছে শোয়। তাই দোতালায় বড়খোকা-মেজখোকা ওদের ঘরে থাকতো।

সাবিত্রী মুখ টিপে হেসে বলে, আর তুমি বুঝি ছোটবউকে নিয়ে রাত কাটাও?

একজন কাছে না থাকলে যে ঘুম আসে না। বড়বউ আজকাল আসতে চায় না বলে বাধ্য হয়েই ছোটবউকে নিয়ে...

ন্যাকামি করো না।

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, আমার কথা বাদ দাও ; এখন আসল কথা শোন।

হ্যাঁ বল।

ছোটবউ-এর ঐ বিধবা বোন দোতালার কোনার দিকের একটা ঘরে থাকে। একটু বেশি রাত হলেই বড়খোকা ওর ঘরে যায়।

তোমাকে কে বলল, বড়বউ? নাকি ছোটবউ?

না না ; বললাম তো ওরা এসব কিছুই জানে না।

তাহলে কে তোমাকে এ খবর দিল?

আমাদের এক বুড়ি ঝি।

সাবিত্রী একটু ভেবে বলে, সে তোমার বউদের কাউকে না বলে হঠাৎ তোমাকে বলল কেন?

হয়তো বউরা জানলে ঝগড়া-ঝাঁটি হই-হল্লোড় শুরু হয়ে যাবে ভেবেই...

ঐ ঝি-টা কী খুবই বিশ্বাসী?

হ্যাঁ, খুবই বিশ্বাসী। তাছাড়া ও অনেক বছর ধরে আমাদের সংসারে আছে বলে সব ছেলেমেয়েই ওকে বড়মাসি বলে ডাকে।

তা অত রাত্তিরে ঐ বুড়ি জেগে ছিল কেন?

অত-শত জানি না।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, একদিন চুপি চুপি ও আমাকে শুধু বলল, বড়খোকা একটু বেশি রাত্তিরে ছোটবউ-এর বোনের ঘরে যাতায়াত শুরু করেছে ; তবে এ খবর আর কেউ জানে না।

বড়খোকা আর ঐ মেয়েটার হাবভাব-চালচলন দেখে কী মনে হচ্ছে?

আমি যতটুকু দেখি, তাতে তো ওদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাই না।

আগে থেকেই এত ভাবছ কেন? বুড়ি ঘুমের ঘোরে কী দেখতে কী দেখেছে, তা কে জানে!

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর নরোত্তম বলেন, কিন্তু বড়খোকা সম্পর্কে ও আজেবাজে কথা বলার লোক না। ঐ বুড়িই তো বড়খোকাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে।

অত যদি ভাবনা-চিন্তার কারণ হয়, তাহলে ঐ মেয়েটাকে সরিয়ে দাও।

না, না, সে অসম্ভব?

কেন?

একে মেয়েটি অসহায়, তার উপর ছোটবউ নিজে ওকে এনেছে।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, তাছাড়া বড়বউ মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসে। ওকে চলে যেতে বলা অসম্ভব।

একটু চুপ করে থাকার পর সাবিত্রী জিজ্ঞেস করে মেয়েটির নাম কী?

করুণা।

স্বভাব-চরিত্র?

বড়বউ তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তুমি তো বল, তোমার ছেলেরাও খুব ভাল।

এখনো পর্যন্ত তো ওদের কারুর মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি।

নরোত্তম একটু থেমে বলে যান, বড়খোকা এনট্রান্স পাশ করার পর আর পড়াশুনো

না করলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে কোনো কাজই করুক না কেন, তা বেশ ভালভাবেই করে। তাছাড়া ছেলেটা এত সাদাসিধে থাকে যে অপরিচিত লোকজনরা তো ওকে অনেক সময় আমার কর্মচারী মনে করে।

অন্য দুই ছেলে?

ওরা দুটোই লেখাপড়ায় বেশ ভাল।

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, মেজখোকা বুঝি মাঝে মাঝেই ওর মা আর বড় মাকে বলে, বি.এ. পাশ করার পরই ও ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত চলে যাবে।

সাবিত্রী একটু হেসে বলে, ছেলেরা যখন এত ভাল, তখন তোমার ভাবনা কী?

তাছাড়া ছোটবউকে নিয়েও মাঝে মাঝে ভয় হয়।

ওকে নিয়ে আবার কী ভয়?

হয়তো আবার কোনোদিন বলবে, সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দাও।

ও বললেই তুমি করবে কেন?

সাবিত্রী একটু থেমে বলে, আগে ছেলেরা উপযুক্ত হোক, তারপর যাকে যা দেবার নিশ্চয়ই দেবে। এখন ওদের হাতে বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি এলে কার কী মতিগতি হয়, তার কি ঠিকঠিকানা আছে!

ও প্রায় না থেমেই বলে, তবে মল্লিকমশাই, একটা কথা বলে দিই। বউ বা ছেলেরা যেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি বা টাকাকড়ির খুব বেশি খবর জানতে না পারে। ওদের মাথায় যদি ঢুকে যায়, তোমার অনেক টাকা আছে, তাহলে...

ঠিক বলেছিস। আমি সবকিছু বলে ফেলেই ভুল করি।

উনি একটু থেমে বললেন, তুই আজ যা বললি, সে কথা ভটচাজ্‌মশাই অনেক আগেই বলছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। সত্যি, এখন থেকে একটু সাবধান হতে হবে।

তবে একটা কথা মনে রেখো, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ বাড়ি থেকে করলে বউ বা ছেলেরা সব জেনে যাবেই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দু'এক মাসের মধ্যেই লালবাজারে অফিস খুলব। বাড়ি থেকে এত বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চালানো সত্যি খুব অসুবিধে।

সাবিত্রী একটু হেসে বলে, দেখ মল্লিকমশাই, আমি এই সাতাশ বছরের জীবনে যে পাঁচজন বাবুকে নিয়ে ঘর করলাম, তারা প্রত্যেকেই ব্যবসাদার, প্রত্যেকেই...

নরোত্তম হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বুঝি তোর পাঁচ নম্বর বাবু?

হ্যাঁ।

আমার আগে তো সরকারবাড়ির বড়কর্তা তোর বাবু ছিলেন।...

হ্যাঁ।

তার আগে?

সে এক পাটের দালাল।

তার আগে?

সে এক জমিদারের ব্যাটা।

তোর প্রথম বাবু কে ছিলেন?

আমার জামাইবাবু।

নরোত্তম অবাক হয়ে বলেন, তোর জামাইবাবু?

হ্যাঁ।

তোর নিজের জামাইবাবু?

হ্যাঁ নিজেরই মতন আর কি!

নিজেরই মতন মানে?

ও শালা আমার বড়জ্যাঠার ছোটজামাই ছিল।

সাবিত্রী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ঐ হারামজাদা আমাকে নিয়ে বছর খানেক ফুর্তি করার পর হাজার টাকা নিয়ে আমাকে ঐ জমিদারের ব্যাটার কাছে বিক্রি করে।

নরোত্তম চুপ করে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না।

সাবিত্রী বলে, আমার মতো হতভাগীর কথা শুনে কী হবে? যা বলতে চাইছিলাম, তাই শোন।

হ্যাঁ বল।

সাধারণ লোকের ধারণা, মদ আর মেয়েছেলের খপ্পরে পড়েই সবার সর্বনাশ হয়, কিন্তু তা কখনই হয় না। যারা লাখ লাখ টাকা রোজগার করে, তারা আমার মতো খারাপ মেয়েছেলের হাতে কখনই সব টাকা তুলে দেয় না বা লাখ টাকারই মদ খায় না, খেতে পারে না।

নরোত্তম মাথা নেড়ে বলেন, সে তো একশ'বার সত্যি!

মদ-মেয়েছেলের পিছনে তোমরা কত ব্যয় কর? বড় জোর দু'পাঁচশ বা দু'পাঁচ হাজার। তার বেশি কখনই নয়।

নরোত্তম মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

খেয়াল-খুশির জন্য এই টাকা ব্যয় করে তোমাদের মতো লক্ষপতিরা কখনই পথের ভিখারি হয় না।

সাবিত্রী একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়তোমাদেরই পারবারিক গণ্ডগোলে, আমাদের মতো মেয়েদের জন্য না।

খুব দামী কথা বলেছিস।

তাইতো বলছি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো নিজের সংসারের দিকেও নজর দাও। বউ-ছেলেমেয়েকে খুশি না রেখে কি ভালভাবে ব্যবসা করা যায়?

নরোত্তম অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি বলছিস, বউ-ছেলেমেয়েকে খুশি রাখতে?

হ্যাঁ বলছি।

সাবিত্রী একটু থেমে একটু হেসে বলে, মল্লিকমশাই, তোমার মনে শান্তি না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে মন দেবে কী করে? আবার ব্যবসা-বাণিজ্য ভালভাবে না চললে আমাকে পুষবে কী করে?

নরোত্তম ওকে বুকের কাছে টেনে বলেন, মাগী, তুই তো দারুণ বুদ্ধিমতী মেয়ে।

সাবিত্রী উদাস দৃষ্টিতে দূরে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে খুব ধীরে-স্থিরভাবে বলে, মল্লিকমশাই, আগেকার বাবুদের শুধু শরীরটা দিয়েছি কিন্তু তোমাকেই প্রথম শরীর আর মন দুই-ই দিয়ে দিলাম। তাই তো তোমার কোনো ক্ষতি হলে আমি সইতে পারব না বলেই আজ তোমাকে এত কথা বললাম।

নরোত্তম মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন কিন্তু ঠিক যেন চিনতে পারেন না। না না, এ তো কামনা-লালসার প্রতিমূর্তি না ; এ সাবিত্রী যেন দূরের চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের মতোই স্নিগ্ধ, শান্ত, পবিত্র।

নয়

,খবরটা মুকুন্দই পাড়ার পুরনো বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিল।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত না হলেও খবরটা শুনে কণিকা চমকে উঠলেন। বললেন, এইতো পরশু দিনই আমার সঙ্গে গল্প করলেন। একদিনের মধ্যে হঠাৎ কী হলো?

মুকুন্দ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কাল সন্ধের পর আমি যখন ওঁর দুধ আর দুটো কলা দিতে গেলাম, তখন আমাকে শুধু বললেন, বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, তুই কলা দুটো তোর মেয়েকে দিস।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, বৌদি।

উনি দুধ খেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আমারই সামনে উনি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

তারপর?

আজ সকালে সাড়ে ন'টা-দশটা পর্যন্ত ঠাকুমাকে বাইরে বেরুতে না দেখে ভিতরে গিয়ে দেখি, ওঁর শরীর লোহার মতো শক্ত!

তার মানে, ঘুমের মধ্যেই মাঝ রাত্তিরে মারা গেছেন।

চক্রবেড়ের ডাঃ মিত্র বললেন, বোধহয় রাত দুটো থেকে চারটের মধ্যে মারা গেছেন।

ঐ বিনু বলে যে ছেলেটা ওঁর পাশের ঘরে থাকে....

মুকুন্দ ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে, ওর কথা আর বলবেন না বৌদি। ঠাকুমাদের বাড়িতে থেকেও ঠাকুমাকে কি যা তা বলতো, তা ভাবতে পারবেন না।

আমি জানি।

কণিকা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ঠাকুমা আমার কাছেও অনেক দুঃখ করেছেন কিন্তু হতভাগা তো ওঁরই পাশের ঘরে থাকে।

ও আবার কী খবর নেবে? ঘরখানা দখল নেবে বলে ও তো দিনরাত্তির ঠাকুমার মৃত্যু কামনা করতো।

এবার কণিকা বললেন, যাই হোক মুকুন্দ, ঠাকুমার শেষ কাজ খুব ভালভাবে হওয়া চাই। খাট, ফুল, সেন্ট-টেন্ট কিনতে কত দেব বল?

ওসব কিনতে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওসবের জন্য আর আপনাকে টাকা দিতে হবে না।

ওসব কেনার টাকা কে দিল?

আমি আর আমার বন্ধুবান্ধব-খদ্দেররা ও টাকা দিয়ে দিয়েছি।

কণিকা ওকে দাঁড় করিয়ে ভিতর থেকে আড়াইশ' টাকা এনে ওর হাতে দিয়ে বললেন, শ্মশানঘাটের খরচের জন্য এই টাকাটা রাখো। তুমি যাও ; আমি এখুনি আসছি।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত কামিনীবালা প্রায় রাজমহিষীর মতো সেজেগুজে পালঙ্কে চড়ে ষাট-সত্তর জন লোকের হরির ধ্বনি শুনতে শুনতে ভবানীপুরের বিখ্যাত গোলাপী বাড়ি থেকে চিরবিদায় নিলেন। তাছাড়া স্বামীর সোহাগবঞ্চিতা নিঃসন্তান এই নিঃস্ব বৃদ্ধার জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় জানালেন পাড়ার বউ-ঝি বুড়ো-বুড়ির দল। সরকারবাড়ির আর কোনো কর্তা বা গিন্নির কপালে এই সৌভাগ্য জোটেনি।

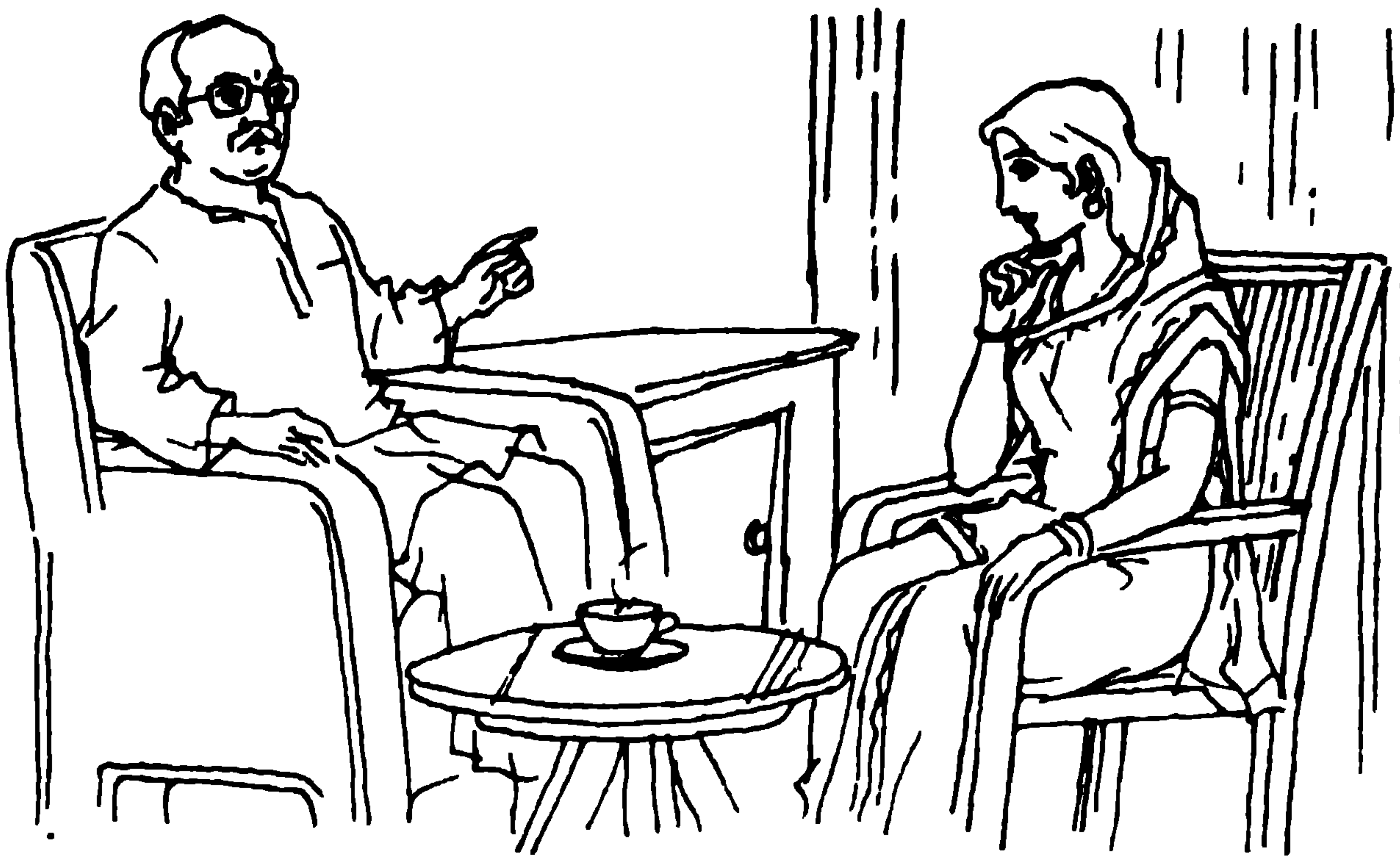

কণিকা ও বাড়ি থেকে ফিরে আসতেই অঘোরনাথ বললেন, বুড়িকে রওনা করে দিয়ে এলে?

হ্যাঁ, ছোট-কাকা।

জানলা দিয়ে দেখলাম, বুড়ি বেশ রাজরানীর মতোই গেলেন।

হ্যাঁ, সত্যিই রাজরানীর মতোই গেলেন।

কণিকা মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, শুধু এপাড়ার বাসিন্দারা না, এমনকি মুকুন্দর দোকানের অতি সাধারণ খদ্দেরদেরও দেখলাম, ঠাকুমার পায় ফুল-মালা দিয়ে প্রণাম করল।

জানো ছোটমা, মানুষের সুকৃতি না থাকলে এই ভালবাসা পাওয়া যায় না। সব মানুষই চায়, একটু ভালভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে কিন্তু সে সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এই বুড়ি ছাড়া সরকারবাড়ির আর কারুর সে সৌভাগ্য হয়নি।

ও বড়ির আর সবাই বুঝি খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন?

কেউ কষ্ট পেয়ে, আবার কেউ বা এমন ভাবে মারা যান, যা বিশেষ সুখের বা গৌরবের নয়।

ঠাকুমা একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, কে যেন জলে ডুবে মারা যান।

অঘোরনাথ একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ, ও বাড়ির মেজকর্তা।

উনি একটু থেমে বলেন, দেখ ছোটমা, ধর্মের ঢোল আপনি বাজে। আমরা অতি বুদ্ধিমানের দল লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্যায় বা খারাপ কাজ করে মনে ভাবি কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না কিন্তু মজার কথা, একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হয়।

কণিকা কোনো কথা না বলে ওঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

অঘোরনাথ বলে যান, সরকারবাড়ির বড়কর্তার যে রক্ষিতা ছিল, এ কথা সবাই

জানতো। মাতাল-চরিত্রহীন বলে ছোটকর্তার খ্যাতি সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মেজকর্তকে সবাই জানতো, ব্যবসা -বাণিজ্য টাকাকড়ি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ নেই।

ঠাকুমার কাছে শুনেছি, ওঁর জন্যই বুঝি সরকারদের এত বিষয়-সম্পত্তি হয়।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ কিন্তু দুঃখের কথা কী জানো ছোটমা, প্রায় সব সম্পত্তিই উনি লোক ঠকিয়ে নিজেদের করে নেন।

লোক ঠকিয়ে?

হ্যাঁ।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, যাঁরা বিপদে-আপদে পড়ে বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা নিতেন, তাঁরা কথামতো টাকা শোধ করতে না পারলেই উনি সে-সব সম্পত্তি নিয়ে নিতেন।

তাই নাকি?

মাত্র দু'পাঁচ-দশ হাজার টাকা ধার দিয়ে কত মূল্যবান সম্পত্তি যে উনি আত্মসাৎ করেছেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

তা উনি জলে ডুবে মারা গেলেন কী ভাবে?

আমাদের সমাজে বিধবাদের তো দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। তাই মেয়েদের বিয়ে-থা'র ব্যাপারে বা ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখের জন্য বিধবারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপদে পড়ে সম্পত্তি বন্ধক রেখে মেজকর্তার কাছ থেকে টাকা নিতেন। ওঁদেরই মধ্যে একজন অল্পবয়সী বিধবাকে নিয়ে ফুর্তি করতে গিয়েই তো উনি নৌকো থেকে পড়ে গঙ্গায় ডুবে মারা যান।

এ রাম!

কণিকার বিস্ময় আর ঘৃণা দেখে অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, ছোটমা, আমাদের আশু মুখুজ্যেও অনেক টাকা আয় করেন। এই ভবানীপুরে উনি কি বিশাল বাড়ি বানান, তা তো দেখেছ।...

সত্যি, ভবানীপুরে ওর চাইতে বড় বাড়ি দেখিনি।

আশুবাবু বিদ্যা-বুদ্ধি পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেন, উনি অসৎ উপায়ে একটি পয়সাও আয় করেননি। তাইতো তাঁর প্রত্যেকটি ছেলে যেমন শিক্ষিত, সেইরকমই সম্মানিত হয়েছেন।

অঘোরনাথ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আর সরকারবাড়ির কর্তাদের না ছিল শিক্ষা দীক্ষা, না ছিল সততা। মানুষ ঠকিয়ে জোচ্চুরি করে টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি করেন বলেই ওঁরা যত রকমের নোংরামি করে টাকা ওড়াতে দ্বিধা করেননি।

কণিকা জিজ্ঞেস করেন, ও বাড়ির বড়কর্তা কী ভাবে মারা যান?

উনি যখন মারা যান, তখন আমি কলকাতায় ছিলাম না। তবে পুজোর সময়

কলকাতায় এসে বন্ধু বান্ধবদের কাছে শুনি, উনি কোনো খারাপ অসুখে মারা যান।

যা তা জায়গায় গেলে এইসব অসুখ তো হবেই।

শুধু তাই না ছোটমা। হাসপাতালে ওঁকে কেউ দেখতেও যেত না।

নিজের বউ-ছেলেও না?

না।

কেন? ওঁর চরিত্র ভাল ছিল না বলে?

শুধু তাই না ; উনি ওঁর রক্ষিতাকে কালীঘাটের বাড়িটা লিখে দেন বলে...

কণিকা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, উনি ওঁর রক্ষিতাকে বাড়িও দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থাকার পর কণিকা জিজ্ঞেস করেন, আর ছোটকর্তা কীভাবে মারা যান?

উনি মদ খেয়েই মারা গেলেন।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, তবে ছোটমা, দত্তবাড়ির মেজবাবুর মৃত্যু আর ঐ মামলা-মোকদ্দমার পর ছোটকর্তা বাড়িতে বসে দিনরাত্তির শুধু মদ খেতেন কিন্তু বাইরে কোথাও যেতেন না।

কণিকা একটু হেসে বলেন, বোধহয় ভয়েই কোথাও যেতেন না।

ভয় নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু মেজবাবু আর বড়বাবুর ঐভাবে মৃত্যু হওয়ায় উনি খুবই আঘাত পেয়েছিলেন।

অঘোরনাথ একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, তবে ছোটমা, একটা কথা জেনে রেখো। সরকারবাড়ির এই চরিত্রহীন মাতাল ছোটবাবু কোনোদিন কারুর ক্ষতি করেননি, বরং বহু মানুষকে সাহায্য করেছেন।

ঠাকুমা তো কোনোদিন কিছু বলেননি।

তোমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, উনি বাইরের লোকজনের কাছে শ্বশুরবাড়ির আলোচনা করা বিশেষ পছন্দ করতেন না।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

কণিকা একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, সরকারবাড়ির এই দুরবস্থা হলো কেমন করে?

অঘোরনাথ একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, তুমি তো ইকনমিক্স নিয়ে পড়েছিলে। ল অফ ডিমিনিসিং রিটার্নের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে?

হ্যাঁ।

সরকারদের ঠিক তাই হয়েছিল।

উনি একটু থেমে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাগজের কালোবাজারি আর চুরি করে ওঁরা যে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আয় করেছিলেন, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

কালোবাজারি করে আয় করতেন, তা বুঝলাম কিন্তু চুরি করতেন কী করে?

তখন কলকাতা ছাড়া আসাম ও বাংলাদেশের নানা জেলায় লাখ লাখ বৃটিশ-আমেরিকান-কানাডিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য ছড়িয়ে ছিল। ওদের হাজার হাজার অফিসে কোটি কোটি টাকার কাগজ সাপ্লাই দিতেন আমাদের এই সরকাররা।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, প্রতেক প্যাকেটে পাঁচ শ'র জায়গায় চারশ' শিট কাগজ সাপ্লাই দিয়ে কত টাকার কাগজ ওঁরা চুরি করতেন, তা ভাবতে পারো?

ধরা পড়তেন না?

কে ধরবে?

অঘোরনাথ ওঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, বিশ্বযুদ্ধ যে কী ভয়ানক ব্যাপার, তা তোমরা ঠিক বুঝবে না। যখনকার কথা বলছি, তখন হিটলারের জার্মানি প্রত্যেকদিন এক একটা দেশ দখল করে চলেছে ; আর এদিকে জাপানিরা সিঙ্গাপুর-মালয় ইত্যাদি জয় করে ঝড়ের বেগে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কি আর্মি অফিসারদের কোনো জিনিসপত্রের হিসেব-নিকেশ নেবার সময় ছিল!

কণিকা অবাক হয়ে ওঁর কথা শোনেন।

এদিকে যুদ্ধের জন্য চাল-গম-চিনি থেকে শুরু করে কাপড়-চোপড় লেখাপড়ার কাগজ সবই কন্ট্রোল কিন্তু কোনো ব্যসাদারই কন্ট্রোলের দামে কোনো জিনিস বিক্রি করে না। এই সরকাররা আট-দশ গুণ বেশি দামে কাগজ বিক্রি করে কত আয় করলেন, তা ভগবানই জানেন।

এত টাকা গেল কোথায়?

বৃদ্ধ অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, ছোটমা, তখন বাড়ির বড়কর্তা আর মেজকর্তা এমন বেহিসেবী ফুর্তি করা শুরু করলেন, যা আমি তোমাকে বলতে পারব না। সেই সঙ্গে সমান তালে বিলাসিতা আর অপব্যয়। তখন ওঁদের কতগুলো মোটরগাড়ি ছিল জান?

কণিকা চাপা কৌতুকের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেন, কত?

সাতখানা।

সাতখানা গাড়ি ছিল?

হ্যাঁ ছোটমা, সাতখানা।

উনি মুহূর্তের জন্যে থেমে বলেন, তার মধ্যে তিনখানা ছিল প্যাকার্ড আর ক্রাইসলার।

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকার পর কণিকা প্রশ্ন করেন, তখনও ওঁরা ব্যবসা-বাণিজের কাজকর্ম করতেন তো?

না, না ; তখন ওঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময়ও ছিল না, মনও ছিল না।

তাহলে...

তত দিনে তো ওঁদের তিন ছেলেই বড়ো হয়ে গেছে। ওরাই তখন সবকিছু দেখাশুনা

করত।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, ছেলেগুলোও তো এক একটা অবতার ছিল।

কেন? ওরাও কি বড়কর্তা-মেজকর্তার মতো চরিত্রহীন ছিল?

বড়কর্তার বড় ছেলেটির কোনো মেয়েছেলের রোগ ছিল বলে কোনোদিন শুনিনি কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খিদিরপুর আর টালিগঞ্জে নিয়মিত রেস খেলত।

উনি না থেমেই একটু হেসে বলেন, শ্রীমান যথারীতি প্রত্যেকদিন রেসের মাঠে হাজার হাজার টাকা হেরে বন্ধুদের সঙ্গে বোতল নিয়ে বসত। রাত দেড়টা-দুটোর আগে কোনোদিন বাড়ি আসত না।

বাঃ! চমৎকার!

দাঁড়াও, দাঁড়াও, ছোটমা, এখনই কোনো মন্তব্য করো না। আরো আছে।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, রেসের মাঠে লাখ লাখ টাকা হারাবার পর শ্রীমান ঠিক করল, রেস জিততে হলে রেসের ঘোড়া কিনতে হবে।

তাতেও নিশ্চয় লাখ লাখ টাকা নষ্ট হলো?

সে আর বলতে!

আর বড়কর্তার ছোটছেলেটা কেমন ছিল?

উঃ! ও হতচ্ছাড়ার কথা মনে হলে এখনও আমার গা জ্বলে যায়।

কণিকা একটু হেসে বলেন, কেন?

অঘোরনাথ বলেন, এই হতচ্ছাড়া ধর্মতলা পাড়ার ফিরিঙ্গিদের একটা স্কুলে ক্লাস এইট-নাইন অবধি পড়েই নিজেকে সাহেব মনে করত। আর্মি অফিসে সাপ্লাই দেবার কাজে যাতায়াত করতে করতে অনেক আর্মি অফিসারের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হলো। সেই বন্ধুত্বের পরিণাম যে কী হয়েছিল, তা শুনলে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

কেন, কী হয়েছিল?

তখন ব্রিটিশ-আমেরিকান-কানাডিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান আর্মি আর অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য চৌরঙ্গিপাড়ায় দশ হাত অন্তর নাচ-গান আর মদ্যপানের আসর ছিল।

সত্যি?

কণিকা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ, ছোটমা, সত্যি।

উনি একটু থেমে বলেন, তখন চারদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধে প্রতিদিনই হাজার হাজার সৈন্য মারা যেত। তাই তো গভর্নমেন্ট আর্মির আনন্দের জন্য চৌরঙ্গি পাড়ায় শত শত বার-এর লাইসেন্স দেয়। এমনকি ফুটপাত ঘিরেও অনেক 'বার' ছিল; আর এই সব বার-এ মেয়েরা নাচ দেখাত, গান গাইত।

কণিকা অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে শুনে যান।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, আর্মির সবাই জানত, যে-কোনো মুহূর্তে ওদের

যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে এবং হয়তো মারা যাবে। তাইত যেমন আকণ্ঠ ড্রিঙ্ক করত, সেইরকমই ফুর্তি করত। বড়কর্তার ছোট ছেলে ওদেরই সঙ্গে সমানতালে ড্রিঙ্কও করত, ফুর্তিও করত।

সত্যিই স্তম্ভিত হবার মতো ব্যাপার।

এইটুকু শুনেই স্তম্ভিত হচ্ছ? এখনো তো আসল ব্যাপারটাই বলিনি।

আবার কী আসল ব্যাপার?

বলছি, বলছি।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ঐ যুদ্ধের বাজারে কন্ট্রাক্টরি করে যোগীন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক প্রচুর পয়সা করেন। তাঁরই মেয়ের সঙ্গে সরকারবাড়ির বড়কর্তার ছোট ছেলের বিয়ে হয়।

ঠাকুমা বলতেন, মেয়েটি দারুণ সুন্দরী ছিল।

হ্যাঁ, সত্যি খুব সুন্দরী ছিল।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বিয়ের পর ঐ ছোকরা প্রায়ই বউকে নিয়ে ক্লাবে গিয়ে আর্মি অফিসারদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করত।

তারপর?

তারপর ঐ বউটিও ড্রিঙ্ক করা শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হলো।

কী বলছেন আপনি?

হ্যাঁ, ছোটমা, ঠিকই বলছি।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলনে, স্বামী-স্ত্রী বেরুত একসঙ্গে কিন্তু ফিরত আলাদা আলাদা।

তার মানে?

শ্রীমান নিজে বেহুঁশ মাতাল হয়ে ফিরত মাঝরাত্তিরের পর কিন্তু তখন ওর সঙ্গে বউ থাকত না। দু'তিনজন আর্মি অফিসার আর্মির গাড়ি করে বউটিকে পৌঁছে দিত রাত দুটো-তিনটের সময়।

কণিকা মুখ বিকৃতি করে বলেন, এ রাম! রাম!

ছোটমা, এ দৃশ্য সারা পাড়ার লোক মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে দেখেছে।

পাড়ার লোক কিছু বলত না?

অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, ছোটমা, তোমরা ঠিক বুঝবে না, তখন কী পরিস্থিতি ছিল।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তখন বহু জজ-ব্যারিস্টার আর আই. সি. এস-এর মেয়ে বউরা পর্যন্ত আমেরিকান বা ব্রিটিশ আর্মি অফিসারদের সঙ্গে মেলোমেশা করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। তাইত...

কী বলছেন আপনি?

হ্যাঁ, ছোটমা, ঠিকই বলছি।

দু'এক মিনিট কেউই কোনো কথা বলেন না। তারপর কণিকা জিজ্ঞেস করেন, মেজকর্তার ছেলেটি কেমন ছিল?

মেজকর্তার ছেলেটির কোনো বদ্ নেশাও ছিল না, চরিত্রও খারাপ ছিল না ; তবে যেমন আয়েসী, সেইরকমই স্ত্রৈণ ছিল।

কণিকা একটু হেসে বলেন, ওবাড়ির কেউ কি স্বাভাবিক ছিল না?

না, ছোটমা, কেউই স্বাভাবিক ছিল না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তা না হলে কি এই বিশাল সম্পত্তি আর এত টাকা এভাবে ক'বছরের মধ্যে শেষ হয়?

ক'বছরের মধ্যে মানে?

যুদ্ধ শেষ হবার বছর পাঁচেকের মধ্যেই সরকারদের সব শেষ হয়ে যায়।

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে?

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, ছোটমা, ফুটো হাঁড়িতে ক্ষীর রাখলেও তা পড়ে যায়।

তা ঠিক, কিন্তু এত টাকা, এত সম্পত্তি পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হলো কীভাবে?

একজন রেসুড়ে, একজন যেমন চালিয়াত সেইরকমই চরিত্রহীন-নেশাখোর আর একজন দিনরাত্তির বউকে নিয়েই ব্যস্ত। ওদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখার সময় কোথায়?

উনি এক নিঃশ্বাসে বলে যান, মোসাহেব, দালাল আর কর্মচারীদের উপর সবকিছু ছেড়ে দিলে কি ব্যবসা-বাণিজ্য চলে?

কণিকা চুপ করে থাকেন।

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, যুদ্ধের শেষের দিকে বড়কর্তা-মেজকর্তার ছেলেরা আলাদা হয়ে যায়। বড়কর্তার বড়ছেলে বেহালায় চলে গেল ; ছোট ছেলে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে তিনতলা প্রাসাদ তৈরি শুরু করে আর শেষ করতে পারল না।

মেজকর্তার ছেলে?

ও বিডন স্ট্রিটে শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যও ভাগাভাগি হয়?

সব বেহাত হয়ে যায়।

অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, ওরা তিন ভাই মাত্র তিন লাখ টকা নিয়ে ব্রেবোর্ন রোডের বাড়িটা কিষণলাল জালান বলে এক ভদ্রলোকের কাছে বন্ধক রাখে কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে টাকা শোধ করতে না পারার জন্য বাড়িটা চলে যায়। আর কর্মচারীরা ভাগ-যোগ করে সব ব্যবসা-বাণিজ্যও হাতিয়ে নেয়।

হাতিয়ে নেয় মানে?

দশ-বিশ হাজার টাকা নিয়ে এক এক ভাই এক এক জনকে একএকটা ব্যবসা লিখে দিয়েছে।

উনি একটু থেমে একটু হেসে বলেন, পঞ্চাশ-বাহান্ন সালে আমি সরকার বাড়ির ছেলেদের সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

বলেন কী?

হ্যাঁ, ছোটমা, ঠিকই বলছি।

উনি একটু থেমে বলেন, অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসাদারই তো এইভাবে শেষ হয়ে গেছে।

একে কলকাতা শহর, তার উপর ভবানীপুরের ঐ জমজমাট বাড়ি ছেড়ে কাশী এসে প্রথম কারুরই বিশেষ ভাল লাগতো না। স্বামীকে সরাসরি কিছু না বললেও বড়বউ প্রায় প্রতিদিনই রাধাকে বলতেন, এইভাবে আনু আর টানুর সংসার করতে আমার একটুও ভাল লাগে না। ভবানীপুরের বাড়িতে কিভাবে যে সময় কেটে যেত, তা টেরই পেতাম না, আর এখানে?

বড়বউ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এখানে এক একটা দিন যেন এক একটা বছর!

রাধা একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, বড়মা, ঠিক বলেছ। সব সময় ভবানীপুরের বাড়ির কথা মনে হয়।

হবেই তো!

উনি একটু থেমে বলেন, যে বাড়িতে পাঁচ ভাই, চারবউ, পাঁচটা ছেলেমেয়ে মিলিয়ে চোদ্দ জন ছাড়াও চাকর-দারোয়ন-কোচোয়ান মিলিয়ে আরো জনা দশেক লোক থাকতো, সে বাড়ি ছেড়ে এসে এখানে এভাবে বোবা হয়ে দিন কাটাতে কি কারুর ভাল লাগতে পারে?

তুমি জেঠুকে বলো না, আমরা ফিরে যাই।

তোর জেঠুকে বললেই যেন সে ফিরে যাবে!

বড়বউ একটু থেমে বলেন, তোর জেঠু সারা জীবনেও আর ওখানে ফিরে যাবে কি না খুব সন্দেহ আছে। একবার যখন বাড়িঘর ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে এসেছে, তখন আর ওসব ঝামেলায় ও যাবে না।

দুর্গাপদ মুখে কিছুই বলেন না। উনি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই দশাশ্বমেধ ঘাটে যান গঙ্গাস্নান করতে। তারপর একটু শাক-সবজি ফল-মূল কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরে এসে একটু কিছু মুখে দিয়েই জঙ্গমবাড়ির ওদিকে ভবানীপুরের জগদীশ মিত্তিরের ভাই নরেশবাবুর বাড়ি যান।

আরে দুর্গাপদ, এসো, এসো।

গড়গড়ার নল মুখ থেকে বের করেই নরেশচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, বুঝলে দুর্গাপদ, ভবানীপুরের লোক ছাড়া কাউকেই ঠিক আপন মনে হয় না।

ফরাস পাতা বিরাট তক্তাপোশের উপর একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসতে বসতে দুর্গাপদ একটু হেসে বলেন, আমারও তো ঐ এক রোগ! তাই তো এখানে এত জানাশুনো লোকজন থাকা সত্ত্বেও শুধু আপনার কাছেই ছুটে আসি।

তা কি আমি জানি না?

নরেশচন্দ্র একটু হেসে বলেন, বাবার কাছে শুনেছি, বড় জ্যেঠু কাশী আসছেন শুনলেই স্যার আশুতোষ পর্যন্ত এখানে এসে হাজির হতেন। আবার আশুবাবু আসার পরের দিনই ত্রিদিব বাঁড়ুজ্যে এখানে চলে আসতেন।

ওঁর কথা শুনে দুর্গাপদ একটু হাসেন। চুপ করে ওঁর কথা শোনেন।

ওরে বাপু, তুমি আর আমিও তো সেই ভবানীপুরের জন্মেছি, বড় হয়েছি। তুমি আমার কাছে না এলে তুমিও শান্তি পাবে না, আমিও পাবো না।

ঠিক বলেছেন।

নরেশচন্দ্র গড়গড়ার নলে দু-একটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, দ্যাখো দুর্গাপদ, সরকারী চাকরি করার সুবাদে চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া, দার্জিলিং থেকে বসিরহাট পর্যন্ত ঘুরতে হয়ছে। তাছাড়া বেড়াবার নেশা ছিল বলে মানস সরোবর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু সত্যি বলছি, ভবানীপুরের মতো একটা পাড়া ভূ-ভারতে আর দেখিনি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, দুর্গাপদ, সত্যিই তাই।

উনি একটু থেমে বলেন, এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ-দিল্লি-করাচি-মাদ্রাজ শহরেও অনেক ভাল ভাল এলাকা আছে। সে সব এলাকায় অনেক ভাল ভাল লোক বাস করেন, কিন্তু একই পাড়ায় আশু মুখুজ্যে, সি.আর.দাশ, সুভাষ বোস বা শরৎ বোসের বাড়ি, একথা বাইরের লোক শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না।

সত্যি, ভবানীপুর নিয়ে আমাদের যথেষ্ট গর্বের কারণ আছে।

নরেশচন্দ্র একটু গলা চড়িয়ে বলেন, আমাদের পাড়া নিয়ে গর্ব করার হাজার কারণ আছে।

উনি না থেমেই এক নিঃশ্বাসে বলে যান, এই একটা পাড়ায় দু'জন কংগ্রেস

প্রেসিডেন্ট, দু-তিনজন ভাইস চ্যান্সেলার, দশ-বারোজন বিখ্যাত অধ্যাপক, দুর্গাদাস-প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো অভিনেতা, অন্তত চার-পাঁচজন আই-সি-এস, বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তার, হাইকোর্টের তিন-চারজন জজ, দশ-বারোজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার.......

ওঁর কথার মাঝখানেই দুর্গাপদ বলেন, এতগুলো বিখ্যাত লোক এক পাড়ায় থাকেন, ভাবলেই মাথা ঘুরে যায়।

ওরে বাপু, তোমাদের মতো ব্যবসাদারই বা অন্য পাড়ায় ক'জন আছে?

কথাটা শুনে দুর্গাপদর খুবই ভাল লাগে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আপনার মতো বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ারই বা অন্য পাড়ায় ক'জন আছেন?

ওঁর কথা শুনে নরেশচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, ওরে বাপু, বাপ-জ্যেঠার পয়সায় বিলেত গিয়ে কোনোমতে একটা তকমা যোগাড় করতে পেরেছিলাম বলে সাহেবদের ঠকিয়ে বেশ জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই জানে, আমি কত ভাল এঞ্জিনিয়ার।

কী যে বলেন আপনি?

দুর্গাপদ, সত্যি কথাই বলছি। বিলেত থেকে একটা সার্টিফিকেট এনেছি বলেই মনে কর না, আমি দারুণ ভাল এঞ্জিনিয়ার।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমরা দু'ভাই যে মহাসুখে জীবন কাটিয়ে দিলাম, তাতে আমাদের বিশেষ কেরামতি নেই।

এবার উনি দুর্গাপদর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলেন, তুমি ভাবলে অবাক হবে, বাবার অঙ্কের বই আর জেঠুর ইতিহাস বই থেকে আমরা দু'ভাই বছরে অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাই।

বলেন কী?

হ্যাঁ, দুর্গাপদ, বাপ-জেঠার বইয়ের টাকাতেই আমাদের বাড়ি-গাড়ি সবকিছু।

নরেশচন্দ্র একটু গর্বের হাসি হেসে বলেন, জ্যেঠার ইতিহাস বই তো এখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও পড়ান হয়।

সত্যি গর্বের কথা।

দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করার পর দুর্গাপদ প্রতিদিন বিকেলে রাধাকে নিয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়ে ঘুরে বেড়ান বেশ কিছুক্ষণ।

দুর্গাপদ একটু হেসে রাধাকে জিজ্ঞেস করেন, কী বড়মা, এই গঙ্গায় নৌকো চড়ে ঘুরে বেড়াতে কেমন লাগে?

ভাল লাগে, তবে ভাইবোনরা নেই বলে তত ভাল নাগে না।

পুজোর ছুটিতে তো কলকাতা থেকে সবাই নিশ্চয়ই এখানে আসবে। তখন সব ভাইবোনদের নিয়ে...

সে তো অনেক দেরি।

হ্যাঁ, তা একটু দেরি আছে ঠিকই কিন্তু আমার সঙ্গে নৌকোয় চড়ে বেড়াতে তোমার ভাল লাগে না?

ভাল কেন লাগবে না কিন্তু ভাইবোনেরা থাকলে খুব মজা হয়।

রাধা মুহূর্তের জন্য থেমেই বলে, ভাইবোনদের ছেড়ে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না। সব সময় মনে হয়, ছুটে ওদের কাছে চলে যাই।

দুর্গাপদ ডান হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, কিন্তু বড়মা, তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে বেড়াব?

আমি কি একলা একলা ভবানীপুর যেতে পারি? তুমি আর বড়মাও তো আমার সঙ্গে যাবে।

রাধা একটা হাত দিয়ে দুর্গাপদর মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করে, জ্যেঠু, যাবে তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো, তবে কিছুদিন পর।

দুর্গাপদ খুব ভাল করেই জানেন, বড়বউও এখানে এসে শান্তিতে নেই। থাকবেন কী করে? উনি যখন বউ হয়ে দত্তবাড়িতে আসেন, তখন ছোট দুই দেওর তো নেহতেই শিশু। গুরুপদকে তো উনি প্রায় নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেন। তাছাড়া কালীপদ আর শ্যামাপদ তো ওঁর নিজের ভাইদের চাইতেও অনেক বেশি প্রিয়। সব চাইতে বড় কথা, নিজের ছেলেমেয়ে না হলেও দেওরদের ছেলেমেয়েরাই তো ওঁর প্রাণ, ওঁর এক একটা স্বপ্ন। এদের সবাইকে ছেড়ে কোনোদিন কোথাও থাকেননি, থাকতে পারেনও না।

দুর্গাপদ জানেন, ভাল না লাগলেও অনেক কাজ করতে হয় সংসারী মানুষকে। তাই তো যে সংসার, যে ব্যবসা-বাণিজ্য উনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, সেসব ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও নিজের মনকে মানিয়ে নিয়েছেন।

কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রের লেনদেন আছে। আগে ভাইরা প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেই দুর্গাপদ উত্তর দিতেন, তোমরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ। বহু বছর ধরিয়াই তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত জড়িত আছো। সুতরাং আমার স্থির বিশ্বাস, পরিস্থিতি অনুযায়ী তোমরা অবশ্যই

সঠিক সিদ্ধান্ত লইবে। পদে পদে প্রবাসী গুরুজনের পরামর্শ লইয়া ব্যবসা পরিচালনা করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়।

ভবানীপুরের বাড়ির সব খোঁজখবর জানিয়ে বড়বউএর কাছে হরদম সেজবউ-ন' বউ-এর চিঠি আসে। তবে ছোট দেওর-এর চিঠি এলেই বড়বউ-এর মন খারাপ হয়ে যায়। স্বামীকে শুনিয়ে উনি রাধাকে বলেন, নিজের পেটে ছেলেমেয়ে না ধরলেও তোর ছোটকাকাকেই তো আমি ছেলের মতো মানুষ করেছি। এই ছেলেটাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে না শুলে আমিও ঘুমুতে পারতাম না, তোর ছোট কাকারও ঘুম আসতো না।

রাধা হাসতে হাসতে বলে, তুমি মাছের কাঁটা বেছে না দিলে তো ছোটকাকা এখনও খেতে পারে না।

বড়বউ একটু হেসে বলেন, আঠারো-বিশ বয়স পর্যন্ত আমি না খাইয়ে দিলে ওর পেটই ভরত না।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণভভাবে বলেন, ওর চিঠি পড়লেই মনে হয়, এখুনি ছুটে ভবানীপুরের বাড়িতে চলে যাই।

দুর্গাপদর কানে সব কথাই পৌঁছায় কিন্তু একটি কথাও বলেন না। তবে দু-চার দিন পর উনি বিকেলের চা খেতে বলেন, বড়বউ, তোমাকে দু-একটা কথা বলতাম।

হ্যাঁ, বল।

দেখো বড়বউ, আমাদের পরিবারের উপর লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকলেও সরস্বতী মোটেই সুপ্রসন্ন না। আমার ঠাকুর্দা দামোদর দত্ত কোনোমতে পাঠশালার পাঠ শেষ করলেও মিডল স্কুলে একই ক্লাসে পরপর তিন বার ফেল করে পড়াশুনা ছেড়ে দেন। শুধু বুদ্ধি, পরিশ্রম আর নিষ্ঠার দ্বারা তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি করেন।

উনি একটু থেমে বলেন, বাবার সব কথাই তো তুমি জানো। তাছাড়া আমরা পাঁচ ভাই যে কী মহাপণ্ডিত, তাও তুমি খুব ভাল করেই জানো।

বড়বউ রাধাকে পাশে নিয়ে চুপ করে ওঁর কথা শোনেন।

বুঝলে বড়বউ, থার্ড ক্লাসে তিন বছর কাটিয়েও যখন সেকেন্ড ক্লাসে উঠতে পারলাম না, তখন বাবার নির্দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম দেখাশুনা শুরু করলাম। আমি তখন ঠিক ষোল বছরের।

দুর্গাপদ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, তারপর আটত্রিশ বছর শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তি আর সংসার ছাড়া আর কোনো দিকে মন দিইনি। আমার উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সব ভাইরাই খুশি থেকেছে।

উনি একটু থামেন ; কি যেন একটু চিন্তা করেন। তারপর বলেন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো হঠাৎ কালী আর মেজবউমা চলে যেতেই মনে হলো যদি কোনো কারণে আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমার তিনটে ভাই তো মহাবিপদে পড়বে। তাই ঠিক করলাম, আমি সুস্থ থাকতে থাকতেই ওদের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমি দূরে চলে

যাবো।

দুর্গাপদ একটু হেসে বললেন, বুঝলে বড়বউ, আমাকে কাছে পেলে ওরা কোনোদিনই ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব নেবে না। তাছাড়া.....

উনি কথাটা না শেষ করেই নীরব হয়ে যান।

বড়বউ বললেন, তাছাড়া কী? কথাটা শেষ কর।

বলছিলাম, সে রকম দরকার হলে ভাইরাও আমার কাছে আসবে বা আমিও ওদের কাছে যাব কিন্তু দিবারাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে সত্যি আর ভাল লাগে না।

বড়বউ একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, তুমি তো শুধু তোমার কথাই বললে কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ! আমারও তো মন-প্রাণ ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু আছে। তার কি কোনো মূল্য নেই?

নিশ্চয়ই মূল্য আছে।

দুর্গাপদ একটু থেমে বলেন, কিন্তু বড়বউ, একটা বয়সে সংসারে যেমন জড়িয়ে পড়তে হয়, তেমনি একটা বয়সে সংসার থেকে মুক্তিও নিতে হয়। তা না হলে....

বড়বউ হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেন, তুমি মুক্তি নিয়ে হিমালয়ে যাও কিন্তু আমাকে এভাবে শাস্তি দিও না। ভবানীপুরের ঐ সংসারই আমার কাশী-গয়া-বৃন্দাবন।

এই ভাবেই প্রায় বছরখানেক কেটে যায়।

সেদিন নরেশবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করে দুর্গাপদ বাড়িতে পা দিতে না দিতেই রাধা লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, জ্যেঠু, ছোটকাকার খুব অসুখ। বড়মা খুব কাঁদছে।

উপরের বারান্দায় উঠতেই গগনের মা একটা ছোট্ট সাদা খাম দুর্গাপদর হাতে দিয়ে বলল, আপনি বেরিয়ে যাবার পরপরই এই তার এসেছে।

টেলিগ্রামের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই দুর্গাপদ আপনমনে অস্ফুট স্বরে বলেন, টাইফায়েড!

রাধা সঙ্গে সঙ্গে বলে, পাশের বাড়ির বড়কাকু এই টেলিগ্রাম পড়ে বললেন, ছোট কাকার খুব অসুখ।

দুর্গাপদ ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, বড়বউ, কান্নাকাটি করো না। ওঠো। আমরা আজই কলকাতা রওনা হব।

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দেখো ছোট মা, আমাদের পাড়ার অনেক পরিবারই নিছক ফুর্তি করে, বদমাইশি করে বা খামখেয়ালিপনার জন্য পথের ভিখিরি

হয়ে গেছে কিন্তু দত্তদের সম্পর্কে এ ধরনের কথা কেউ বলতে পারবে না।

কণিকা বলেন, বনবিহারী দত্তর তো রক্ষিতা ছিল। তাছাড়া মেজবাবুও তো.....

হ্যাঁ, ছোটমা, বনবিহারি দত্তর রক্ষিতা ছিল ঠিকই কিন্তু তার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের, কোনো ক্ষতি করেননি।...

কিন্তু মেজবাবু?

মেজবাবু অনেকগুলো টাকা নষ্ট করেছেন ঠিকই কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের আয় এক পয়সাও কমেনি।

তাহলে ওদের সবকিছু গেল কী ভাবে?

বলতে পার, আট আনা অদৃষ্টের জন্য আর আট আনা নিছক বোকামির বা রক্ষণশীলতার জন্যই ওরা শেষ হয়ে গেল।

কণিকা একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, অদৃষ্টের জন্য মানে?

অঘোরনাথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ছোটমা, আজকাল ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর তো দূরের কথা, কলেরা-টাইফায়েড বা টি.বি হলেও কেউ মরে না কিন্তু চল্লিশের দশকেও অন্তত দশ-পনের লক্ষ বাঙালি প্রত্যেক বছর ম্যালেরিয়ায় মারা যেতো। কলেরা-টাইফায়েড-টি.বি.হলে তো কাউকেই বাঁচান যেতো না।

আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েরা এসব শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

জানি।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার মা মারা যান নিউমোনিয়ায় আর তোমার শ্বশুর মারা যান টাইফায়েডে কিন্তু আজকাল তো ঐসব অসুখে প্রায় কেউই মারা যায় না।

তা তো বটেই।

যাই হোক, দত্তবাড়ির ছোটবাবু মানে গুরুপদও মারা গেলেন টাইফয়েডে।

কাশী থেকে বড়বাবু-বড়বউ আসার আগেই কি মারা যান?

না, না, ওঁরা আসার পনের-কুড়ি দিন পর মারা যান।

অঘোরনাথ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ওঁকে বাঁচাবার জন্য তিন ভাই আর তিন বউ যে কি চেষ্টা করেছিলেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। নলিনী সেনগুপ্তর মতো বিখ্যাত ডাক্তার সকাল-বিকেল এসে দেখে যেতেন। একবার মনে হয়েছিল, ছেলেটা বোধহয় ভালই হয়ে গেল কিন্তু ঠিক তার দুদিনের মধ্যেই ছেলেটা চলে গেল।

বড়বউ নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়েছিলেন?

ঠিক দেড় মাস পর হার্টফেল করে উনিও মারা গেলেন।

বড়বউও মারা গেলেন?

হ্যাঁ, ছোটমা, উনি এই আঘাত সহ্য করতে না পেরেই চলে গেলেন! যে দেওরকে ঠিক নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছেন, ভালবেসেছেন তার মৃত্যু সহ্য করা কী সহজ ব্যাপার?

ইস! কি দুঃখের ব্যাপার!

বৃদ্ধ অঘোরনাথ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে যান, দত্তবাড়ির এই বড়বউকে আমরা মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতাম। সত্যি কথা বলতে কি, উনি এই পাড়ার সব ছোট ছেলেমেয়েকেই নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

সরকারবাড়ির ঠাকুমার কাছেও ওঁর অনেক প্রশংসা শুনেছি।

যাঁরাই ওঁকে চিনতেন, জানতেন, তাঁরাই ওঁর প্রশংসা করবেন।

উনি না থেমেই কণিকার দিকে তাকিয়ে বলেন, জানো ছোটমা, আমার মা ওঁকে প্রথম দেখে কী বলেছিলেন?

কণিকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকাতেই অঘোরনাথ বলেন, বিয়ের পরপরই মা একদিন বড়বাবু আর বড়বউকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর মা বড়বাবুকে বলেছিলেন, দুর্গা, তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তোমার এই বউ কিন্তু সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এর মুখে যত দিন হাসি থাকবে, তত দিন তোমাদের সংসারে লক্ষ্মী বাঁধা থাকবে। আর এই বউমা যদি কোনো দুঃখ পায়, তাহলে বোধহয় তোমাদের মঙ্গল হবে না।

আমাদের ঠাকুমা এই কথা বলেছিলেন?

হ্যাঁ, ছোটমা, মা এই কথাই বলেছিলেন আর তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

বড়বউ মারা যাবার পর ওদের কি হয়েছিল?

ওর মৃত্যুর পরই তো ওরা ধাপে ধাপে পড়তে শুরু করল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ছোট মা, সত্যিই তাই।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, সব গাছেরই হাজার হাজার শিকড় থাকে কিন্তু তার মধ্যে প্রধান শিকড়টাই গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখে। সব সংসারেই এক একজন মানুষ থাকেন, যাঁকে কেন্দ্র করে সংসারের সুখ-শান্তি-শ্রীবৃদ্ধি হয়। বড়বউ তো এইরকমই একজন ছিলেন।

দত্ত পরিবারের এই সব রোগ-শোক-মৃত্যুর পালা শুরু হবার আগে থেকেই বিশ্বের বাজারে নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছিল কিন্তু তার গুরুত্ব বা ভবিষ্যৎ প্রভাব উপলব্ধির মতো বিদ্যা-বুদ্ধি ওদের কারুরই ছিল না। তখনও বিলেত থেকে জাহাজে সবকিছুই আসছে ; দত্ত পরিবার সেসব বিক্রি করে লাভও করছে। তবে হ্যাঁ, এরই মধ্যে দু'একটা কোম্পানি যন্ত্রপাতি পাঠাতে দেরি করছে বা তৈরি করা বন্ধ করে অন্য কিছু করছে। যে দুটি জার্মান কোম্পানি ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রপাতি দত্তদের সাপ্লাই করতো, তারা তো সোজাসুজি জানিয়ে দিল, ওরা অন্য ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরিতে এতই ব্যস্ত যে ভারতবর্ষের এজেন্টদের অর্ডার নেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হলো। এদিকে

বিলেত থেকে আসা সব যন্ত্রপাতির দাম বাড়তে শুরু করল। শুধু তাই নয়, প্রায় সব বিলিতি কোম্পানিই জানিয়ে দিল, অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক দাম পাঠাতে হবে ; বাকি অর্ধেক জাহাজ থেকে মালপত্র ছাড়াবার আগেই দিতে হবে।

বিলেত থেকে এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেজবাবু আর ন'বাবু বেশ চিন্তায় পড়লেন।

শ্যামাপদ গম্ভীর হয়ে বললেন, এতদিন পর্যন্ত মালপত্র বিক্রি করে টাকাকড়ি হাতে পাবার তিন-চার মাস পরে আমরা ঐসব কোম্পানির পাওনা মিটিয়েছি বলেই আমরা এতগুলি কোম্পানির এজেন্সি চালাতে পেরেছি।

শিবপদ বললেন, তা আর জানি না! খুব ভাল করেই জানি।

কিন্তু এখন থেকে অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক টাকা পাঠাতে হলে তো আমাদের পক্ষে আগের মতো মালপত্র আনানোই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

দু'এক মিনিট চিন্তাভাবনা করার পর ন'বাবু বললেন, একবার বড়দার সঙ্গে পরামর্শ করলে বোধহয় ভাল হয়।

সেজবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বড়দার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা আমায় অনেক আগেই মনে হয়েছে কিন্তু তিনি কি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবেন?

আমরা তো তাঁকে রোজ রোজ বিরক্ত করবো না।

শিবপদ একটু থেমে বলেন, এখন যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে, শুধু সেই ব্যাপারে তাঁর মতামত জেনে নেব।

ঠিক আছে ; আজ রাত্রেই আমি বড়দার সঙ্গে কথা বলব।

দুর্গাপদ প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত সবকিছু শোনার পর বললেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও। দু'একদিন পর আমি তোমাদের দু'জনের সঙ্গেই কথা বলব।

পরের দিনই রাত্রিতে উনি দু'ভাইকে বললেন, কালই তোমরা মিঃ কেলি বা ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নাও, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ম-কানুন কি সাময়িক ব্যাপার নাকি অনেকদিন চলবে।

বড়বাবু একটু থেমে বলেন, ব্যাপারটা সাময়িক হলে বিশেষ কোনো চিন্তার কারণ নেই কিন্তু এই টাকাকড়ির কড়াকড়ি বা মালপত্র আসার ব্যাপারে খানিকটা অনিশ্চয়তা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয়।

সেজবাবু বললেন, আমি কালই ওঁদের সঙ্গে দেখা করে দেখি ওরা কি বলেন।

মিঃ কেলি সেদিনই জরুরি কাজে মাদ্রাজ রওনা হবেন বলে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তাই শ্যামাপদ মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করে সবকিছু খোলাখুলি জানতে চাইলেন।

মিঃ ব্রাউন হাতের সিগারেটটা ধরাতে গিয়েও না ধরিয়ে বললেন, মিঃ দাত্তা, তোমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের কোম্পানির কী সম্পর্ক, তা অত্যন্ত ভালভাবে জানি বলেই তোমাকে আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, অবস্থা দিন দিনই খারাপ হবে।

স্যার, আপনিই বলুন, আমাদের কী করা উচিত।

মিঃ ব্রাউন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমাদের কোম্পানিগুলো যেমন অর্ধেক দাম অ্যাডভান্স নিচ্ছে, আপনারাও সেইরকম অ্যাডভান্স নিতে পারলে সব চাইতে ভাল হয়, কিন্তু গভর্নমেন্টের কোনো ডিপার্টমেন্টই তো অ্যাডভান্স দেবে না।

উনি একটু থেমে বলেন, এখানকার দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলোও অ্যাডভান্স দেবে কি না তা আমি বলতে পারবো না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, পরিস্থিতি যখন বিশেষ ভাল না, তখন আপনারা যদি সব বিলেতি মালেরই দাম কিছু বাড়িয়ে দেন, তাহলে বোধহয় সকলে তা মেনে নিতে বাধ্য হবে।

শ্যামাপদ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতেই মিঃ ব্রাউন জিজ্ঞেস করলেন, হোয়ার ইজ বড়বাবু? উনি কী এখনও ভারানসীতে?

না, স্যার ; উনি এখন এখানেই আছেন।

গুড!

মিঃ ব্রাউন মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে উনি যেন আমার সঙ্গে একদিন দেখা করেন।

না না স্যার, অসুবিধে কেন হবে? উনি নিশ্চয়ই দু'একদিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

ব্রাউন সাহেব একটু হেসে বলেন, তুমি কি জানো, ডুগাপডোকে আমি বন্ধু মনে করি?

শ্যামাপদ একগাল হেসে বলেন, খুব জানি স্যার!

দু'দিন পর বড়বাবু ঘরে পা দিতেই মিঃ ব্রাউন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, ডুগাপডো, তুমি এসেছো বলে আমি খুব খুশি।

ঘরের কোণের দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে নানা কথাবর্তার পর মিঃ ব্রাউন গম্ভীর হয়ে বললেন, ডুগাপডো, তুমি আমাদের কোম্পানির ক্যালকাটা এজেন্ট হলেও তোমাকে আমি বন্ধু মনে করি বলেই দু'একটা কথা বলতে চাই।

উনি একটু থেমে বলেন, ডুগাপডো, আমি তোমাকে খোলাখুলি বলছি, ইউরোপের অবস্থা বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। ফ্রান্স আর আমাদের ইংল্যান্ড মিউনিকে হিটলারের

সঙ্গে চুক্তি সই করলেও কখন কী হয়, কিচ্ছু বলা যায় না।

বড়বাবু চুপ করে ওঁর কথা শোনেন।

সত্যি কথা বলতে কি দু'বছর আগে মুসোলিনি হঠাৎ কাউকে তোয়াক্কা না করে ইথিওপিয়া দখল করে নেবার পর থেকেই ইউরোপের সব দেশই বেশ চিন্তায় পড়েছে।

মিঃ ব্রাউন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ডুগাপডো, একটা কথা আমি তোমাকে খুব গোপনে বলতে চাই যে বিলেতের কোনো কোম্পানিই আগের মতো মালপত্র পাঠাতে পারবে না। এই অবস্থা কত দিন চলবে, তা কেউ বলতে পারবে না।

এতক্ষণ চুপ করে এইসব কথা শোনার পর বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, নিছক বন্ধু হিসেবে বলুন, আমাদের কী করা উচিত।

বিলেত থেকে কম-বেশি যেরকমই মালপত্র আসুক না কেন, এজেন্সির কাজ চালিয়ে যাও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এখানেই ছোটখটো যন্ত্রপাতি তৈরি করা শুরু করে দাও।

ব্রাউন একটু থেমে বলেন, বিলেত থেকে এখনই যন্ত্রপাতি আনিয়ে চটপট একটা ফ্যাক্টরি চালু করে দাও। বেশি দেরি করলে এই সুযোগটুকুও বোধহয় থাকবে না।

দুর্গাপদ বাড়ি ফিরেই দুই ভাইকে ব্রাউন সাহেবের সব কথা বললেন। তারপর দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, কেন জানি না, ব্রাউন সাহেবের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো, বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি আসা হয়তো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে।

দু'ভাই প্রায় এক সঙ্গেই বললেন, তাহলে তো সর্বনাশ।

বড়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সত্যি সত্যিই যদি বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের আসল ব্যবসাটাই উঠে যাবে।

সেজবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, তা তো হবেই।

ন'বাবু বললেন, বড়দা, কারখানা করার ব্যাপারে আপনার কী মত?

বড়বাবু বললেন, সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে, কারখানার ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। শুধু টাকা থাকলেই তো কারখানা চালানো যায় না।

সেজবাবু বললেন, আমরা বরাবর বিলেত থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি বিক্রি করেই আয় করেছি।

বড়বাবু সঙ্গে বললেন, ব্রিজ তৈরি করেও তো আমাদের কম আয় হয় না।

তা ঠিক কিন্তু সে কাজ তো অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিই।

কারখানাও তো আমরা অন্যদের দিয়ে চালিয়ে নিতে পারি।

বড়বাবু প্রায় না থেমেই বলেন, সমস্যাটা সেখানে না। আসল চিন্তার বিষয় হচ্ছে, কারখানায় কী তৈরি করা হবে, কারখানা চালাবার উপযুক্ত লোক কোথায় পাওয়া যাবে, কারখানায় তৈরি মালপত্র কোথায় বিক্রি করা যাবে ইত্যাদি।

ন'বাবু বললেন, বড়দা, আমরা কী এইসব ঝামেলা সামলাতে পারব?

সব ব্যবসাতেই ঝামেলা আছে। তবে কারখানা চালাতে পারবে কি না তা তোমরাই ভেবে দেখ।

সেজবাবু একটু হেসে বলেন, বড়দা, আমরা এঞ্জিনিয়ারও না, বি. এ.-এম. এ পাসও করিনি। আমাদের দ্বারা কি কারখানা চালানো সম্ভব?

বড়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্যাপারটা যে খুব সহজ না, তা আমি জানি কিন্তু তবু তোমরা ভেবে দেখে আমাকে জানিও।

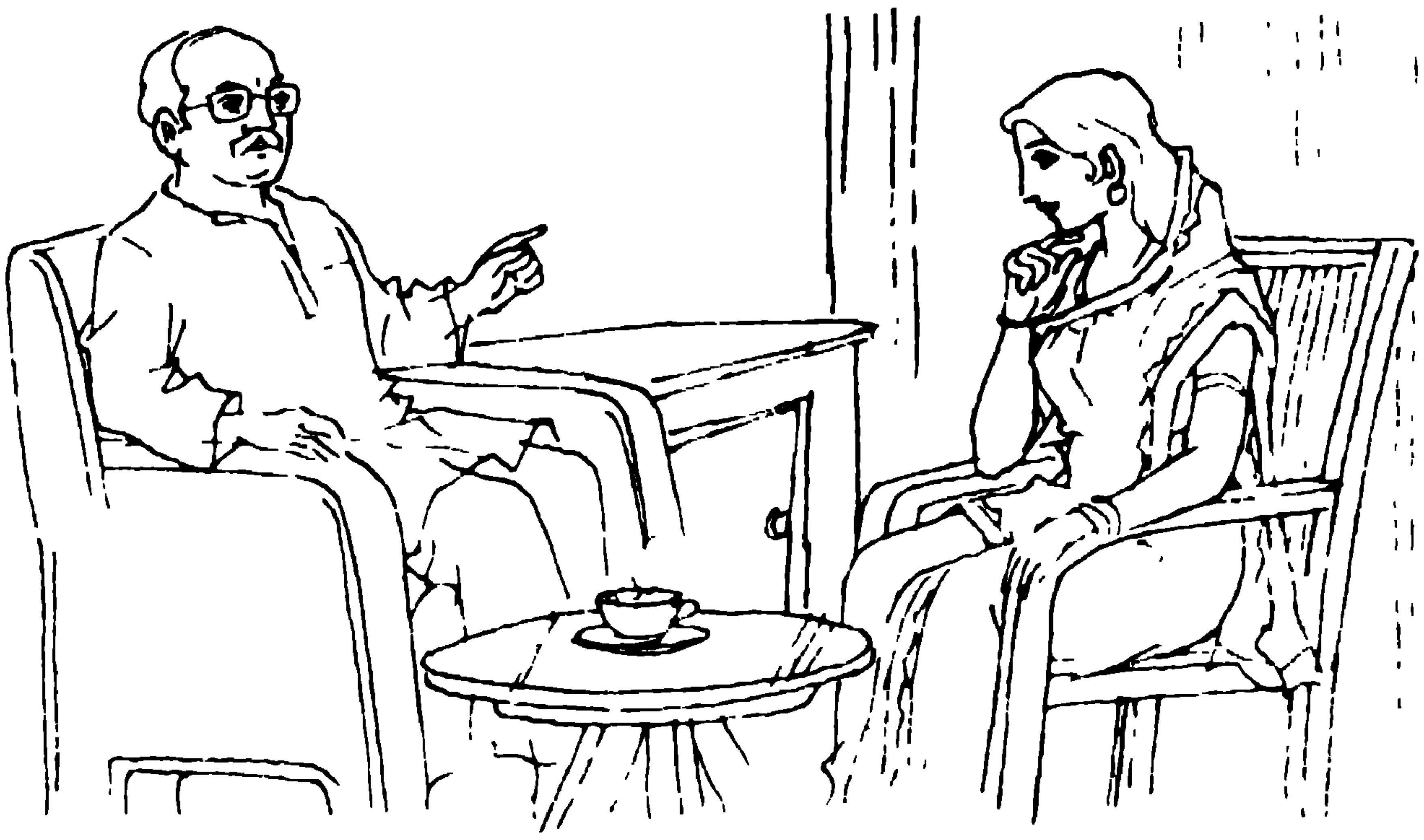

দশ

অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, বুঝলে ছোটমা, ওরা ভাবনা-চিন্তা আর এর-ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে করতেই হিটলারের সৈন্যরা পোল্যান্ড আক্রমণ করেই দখল করে নিল।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বললেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন আর ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেই শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

কণিকা প্রশ্ন করেন, সঙ্গে সঙ্গেই কি বিলেত থেকে এখানে যন্ত্রপাতি আসা বন্ধ হয়ে গেল?

খুব জরুরি জিনিসপত্র ছাড়া সবকিছু আসা বন্ধ হয়ে গেল।

দত্তদের ব্যবসার কী হলো?

যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিকে ওরা ভালই ব্যবসা করেন।...

কী ভাবে?

গুদামে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল, তা বেশ চড়া দামে বিক্রি করতেন। তাছাড়া জার্মানি নরওয়ে-ডেনমার্ক-নেদারল্যান্ড ইত্যাদি জয় করে ফ্রান্স আক্রমণ না করা পর্যন্ত বিলেত থেকে যে সামান্য যন্ত্রপাতিই আসুক না কেন, তাও বেশ চড়া দামে বিক্রি করে দত্তরা ভালই আয় করেন।

তারপর?

তারপর যুদ্ধ আরো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে জাহাজ আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। কদাচিৎ কখনও এক-আধটা জাহাজ এলেও তাতে যন্ত্রপাতি কখনই আসত না।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, যুদ্ধ শুরু হবার বছর দেড়-দুই পর থেকেই দত্তদের এজেন্সির ব্যবসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল।

কণিকা বললেন, ওঁরা, তো ব্রিজও তৈরি করতেন।

হ্যাঁ, করতেন।

উনি একটু থেমে বলেন, যুদ্ধের প্রথম দিকে যুদ্ধে খরচ চালাবার জন্য গভর্নমেন্ট শুধু ব্রিজ তৈরি না, অনেক কাজই বন্ধ করে দেয়। তারপর জাপান যখন একটার পর একটা দেশ দখল করে বার্মা আর ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল, তখন গভর্নমেন্ট সৈন্য-সামন্ত গাড়ি-ঘোড়া ট্যাঙ্ক নিয়ে যাবার জন্য আসামের দিকে তড়িঘড়ি করে রাস্তাঘাট-ব্রিজ বা এয়ার ফিল্ড তৈরি শুরু করল।

অঘোরনাথ একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, হ্যাঁ, তখন হাজার হাজার নতুন কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে ওঁরাও বেশ ভালই কাজ পেয়েছিলেন।

তারপর ওঁরা কী ব্যবসা করেন?

বলছি ছোটমা, সব বলছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ঐ যুদ্ধের বাজারেই ওরা মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে দিলেন খুবই ধুমধাম করে। যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে বড়বাবু মারা গেলেন।

তারপর?

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের মে মাসে জার্মানি আর আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো ঠিকই কিন্তু সারা দেশের অবস্থা তখন খুবই খারাপ।

খারাপ মানে?

অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, ছোটমা, তখন তুমি নেহাতই শিশু ছিলে বলে কিছুই বুঝতে পারোনি।

উনি একটু থেমে বলেন, তখন টাকা দিয়েও চাল-ডাল-তেল-নুন-কাপড়-চোপড় পাওয়া দুষ্কর ছিল। যুদ্ধ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক রাতারাতি বেকার হয়ে গেল। এককথায় তখন চারদিকেই হাহাকার অবস্থা।

কণিকা চুপ করে শুধু ওঁর কথা শোনেন।

অন্য দিকে রাজনীতিতেও তখন টালমাটাল অবস্থা। কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের জন্য যেসব কংগ্রেস নেতা আর কর্মীরা জেলে ছিলেন তাঁরা জেল থেকে ছাড়া পেলেও মুসলিম লিগের দৌরাত্ম্যে যখন-তখন এখানে-ওখানে

মারামারি কাটাকাটি লেগেই থাকত।

অঘোরনাথ একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, এদিকে দেশ স্বাধীনতার দিকে যতই এগুচ্ছে ততই মারামারি কাটাকাটি বাড়তে লাগল।

উনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলেন, বুঝলে ছোটমা, মুসলিম লিগের ডায়রেক্ট অ্যাকশানের দিন লিগের হাজার হাজার লাখ লাখ গুণ্ডারা মুড়ি-মুড়কির মতো হিন্দুদের খুন করল।

কণিকা গম্ভীর হয়ে বলেন, হ্যাঁ, বাবা-মা'র কাছে শুনেছি, তখন ঐ খুন-খারাপির জন্য আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে ওঁদের পালাতে হয়েছিল।

ছোটমা, তুমি শুনলে অবাক হবে, সারা শহরে যখন তাণ্ডব চলছে, তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব পুলিশকে কিচ্ছু করতে দেননি। ক'দিন পর যখন হিন্দুরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল, তখনই প্রথম পুলিশকে রাস্তায় দেখা গেল।

এসব আমরা ভাবতেই পারি না।

ছোটমা, তখন শুধু কলকাতায় না, বিহার আর নোয়াখালিতে যা ঘটেছিল, তা কোনো সভ্য দেশে ঘটে না।

তখন দত্তদের কী অবস্থা?

যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে দেশ স্বাধীন হবার বছর খানেক-বছর দেড়েক পর্যন্ত ওঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না বললেই হয়। এই সময়ই সেজবাবু আর ন'বাবু ওঁদের স্ট্রান্ড রোডের বিশাল গুদাম আর ক্যানিং স্ট্রিট-চীনাবাজার এলাকার দুটো অফিস জালানদের কাছে বিক্রি করে দেন।

তারপর কি ওঁরা আর ব্যবসা-বাণিজ্য করেননি?

অঘোরনাথ একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, করেছিলেন বৈকি। তবে এমনি কোনো ব্যবসা না, ব্যাঙ্কের ব্যবসা।

কণিকা অবাক হয়ে বলেন, ব্যাঙ্কের ব্যবসা?

উনি আগের মতোই চাপা হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ, ছোটমা, ব্যাঙ্কের ব্যবসা।

ব্যাঙ্কের ব্যবসা মানে?

তাহলে তোমাকে একটু খুলেইই বলি।

সেদিন রবিবার।

সাত সকালে বাড়ির সামনে বিরাট ফোর্ড গাড়িটাকে থামতে দেখেই সেজবউ স্বামীকে বললেন, হ্যাঁগো, তোমার কাছে বোধহয় কেউ এসেছেন।

কে আবার এলেন এই সাত সকালে?

ভদ্রলোককে ঠিক চিনতে পারলাম না।

সেজবউ একটু থেমে বললেন, তবে ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো, বোধহয় রাধার

বিয়েতে এসেছিলেন।

ঠিক সেই সময়ই মাখন এসে বলল, সেজবাবু, বিধু দত্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সেজবাবু অবাক হয়ে বললেন, বিধু দত্ত নিজে এসেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্যামাপদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই বলেন, বৈঠকখানায় বসিয়েছিস তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পাখা খুলে দিয়েছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেজবাবু নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েই মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে স্ত্রীকে বললেন, সেজবউ, চট করে ঠৈকখানায় চা-জলখাবার পাঠিয়ে দাও।

স্ত্রীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই উনি তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যান।

সেজবাবুকে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে দেখেই বিধু দত্ত এক গাল হেসে বলেন, এসো, শ্যামাপদ, এসো। টেলিফোন না করে এসে গেলাম বলে কী....

সেজবাবুও একগাল হাসি হেসে বলেন, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন? আমাকেই তো ডেকে পাঠাতে পারতেন।

সেজবাবু পাশের সোফায় বসতেই বিধুবাবু বললেন, যে বাড়িতে ছোটবেলায় হরদম এসেছি, খেয়েছি, সেখানে এলে যে ভাল লাগে, তা কি জানো না?

কথাটা শুনে সেজবাবু একটু হাসেন।

বিধুবাবু বললেন, শিবপদ কি বাড়িতে আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে।

তাহলে ওকেও ডাক দাও।

বিধুবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোমাদের দু'জনের সঙ্গে একটু জরুরি পরামর্শ আছে।

বিধুবাবু চা-জলখাবার খেতে খেতে ন'বাবু হাজির হন।

দু'পাঁচ মিনিট পারিবারিক কথাবার্তা বলার পর বিধুবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, যুদ্ধে যত ক্ষয়-ক্ষতিই হোক, তোমরা নিশ্চই স্বীকার করবে, যুদ্ধের কৃপায় হাজার হাজার বাঙালি ব্যবসা করতে শিখেছে ও প্রায় সবাই বেশ ভাল টাকাই আয় করেছে।

সেজবাবু বললেন, তা ঠিক।

শিবপদ একটু হেসে বলেন, আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবই তো একজোট হয়ে যশোর এয়ারফোর্সে স্টেশনে নানা ধরনের কাজকর্ম করে রাজা হয়ে গেছে।

বিধুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমরা নিশ্চই স্বীকার করবে, এইসব লোকজন যেভাবেই হোক আবার নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করবে।

সম্মতিতে দু'ভাই মাথা নাড়েন।

উনি বলে যান, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে এদের আরো টাকা লাগবে এবং ব্যাঙ্ক ছাড়া কেউই সে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার যোগান দিতে পারবে না।

শ্যামাপদ বললেন, কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কি ওদের সবাইকে টাকা দিতে রাজি হবে?

বিধুবাবু একটু হেসে সামনের গোল টেবিলে একটা চাঁটি মেরে বললেন, কখনোই দেবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক এইজন্যই ঠিক করেছি, আমরা কয়েকজন মিলে নতুন ব্যাঙ্ক খুলব।

শ্যামাপদ বললেন, যেমন ত্রিদিব লাহা কর্নওয়ালিশ ব্যাঙ্ক খুলেছেন, সেইরকম?

হ্যাঁ।

শিবপদ বললেন, এই ক'মাসের মধ্যেই তো ওরা বোধহয় সাত-আটটা ব্রাঞ্চ খুলে ফেলেছেন।

লোকে যদি টাকা রাখতে চায়, তাহলে ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ খুলবে না কেন?

এবার উনি একটু হেসে বলেন, আমাদের নতুন ব্যাঙ্কে তোমরাও থাকবে। তোমরা ভাইই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হবে।

শ্যামাপদ আর শিবপদ একই সঙ্গে বলেন, আমরা?

বিধুবাবু বেশ জোরেই হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা।

অঘোরনাথ একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, বুঝলে ছোটমা, এই বিধুবাবু তখনকার দিনে এক স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।

ওর কথার ইঙ্গিত ঠিক বুঝতে না পেরে কণিকা জিজ্ঞেস করেন, স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন মানে? উনি কি খুব বড়লোক, নাকি নাম করা পণ্ডিত মানুষ ছিলেন?

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বলেন, দুঃখের কথা কি বলব ছোট মা,

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে আমাদের এই বাংলা দেশে যে পঞ্চাশ লাখ লোক না খেয়ে মারা যায়, তার মধ্যে অন্তত পনের-বিশ লাখ লোকের মৃত্যুর জন্য এই বিধুবাবু দায়ী ছিলেন।

কণিকা চমকে উঠেন, বলেন কী ছোটকাকা?

হ্যাঁ, ছোট মা, ঠিকই বলছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থামতেই কণিকা জিজ্ঞেস করেন, ঐ তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লাখ মারা যায়? সে বছর কি দেশে ধান-চাল হয়নি?

ধান-চালের অভাবে তো সেবার দুর্ভিক্ষ হয়নি। সেবারের দুর্ভিক্ষ তো বিধুবাবুর মত কিছু ব্যবসাদার সৃষ্টি করেছিলেন।

বিধুবাবুদের জন্য দুর্ভিক্ষ হয়েছিল?

হ্যাঁ, ছোট মা, বিধুবাবুর মত কয়েকজন বিবেকহীন হৃদয়হীন স্বার্থপর লোভী ব্যবসাদারের জন্যই পঞ্চাশ লাখ লোক না খেয়ে মারা যায়।

অঘোরনাথ একটু থেমে কণিকার দিকে তাকিয়ে বলেন, জাপান একটা পর একটা দেশ দখল করে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসতেই লক্ষ লক্ষ ইংরেজ-আমেরিকান-অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বহু শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

কণিকা কোন প্রশ্ন না করে অপলক দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বৃদ্ধ বলে যান, ঐ লক্ষ লক্ষ সৈন্যসামন্ত আর যুদ্ধের ব্যাপারে হাজার রকম কাজে নিযুক্ত লোকজনদের খাওয়াবার জন্য গভর্নমেন্ট বাজার থেকে চাল কেনা শুরু করল।

অঘোরনাথ একটা তুড়ি দিয়েই বলেন, ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা, দশ টাকা থেকে বিশ টাকা, বিশ টাকা থেকে......

ওর কথার মাঝখানেই কণিকা প্রশ্ন করেন, তখন কি এক কিলো চালের দাম পাঁচ টাকা ছিলো?

না, না, কিলো-টিলো না। যুদ্ধ শুরু হবার পরও চালের মণ পাঁচ টাকা ছিল।

কণিকা একটু হেসে বলেন, তখন চাল এত সস্তা ছিল? অঘোরনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, ছোট মা, তখন সব কিছুই সস্তা ছিল। সরষের তেল ছিল পাঁচ আনা সের। আমাদের এই ভবানীপুরের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশন যেতাম এক টাকা দু' আনায় আর হাওড়া থেকে এলাহাবাদের ইন্টার ক্লাশের ভাড়া ছিল আট টাকা।

কণিকা হাসতে হাসতেই বলেন, এ তো রাম রাজত্বের কাহিনী শোনালেন।

আমি জানি ছোট মা, এসব তোমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকেই জিনিস-পত্তরের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করল।

উনি একটু থেমে বলেন, এখন তো তুমিই দশ টাকা দিয়ে এক কিলো চাল কিনছ কিন্তু তখন চালের মণ চল্লিশ টাকা হওয়ায় পঞ্চাশ লাখ লোককে না খেয়ে মরতে হয়েছিল।

বিধুবাবুও এর জন্য দায়ী?

এক শ' বার দায়ী।

অঘোরনাথ বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলে একটু থামেন। তারপর আবার শুরু

করেন, যুদ্ধ শুরু হবার আগে বার্মা থেকে চাল না আনলে আমাদের প্রয়োজন মিটত না কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে গেল। তবু দেশের ধান-চাল খেয়েই দেশের মানুষ কোনমতে বাঁচতে পারতো কিন্তু তখন ইংরেজদের কাছে যুদ্ধে লড়াই করাই সব চাইতে বড় ব্যাপার। দেশের লোক মরলো কি বাঁচলো, তাতে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে অঘোরনাথ কয়েক মিনিট চুপ করে থাকেন।

তারপর আবার উনি বলেন, পাঞ্জাবের ইস্পাহানী সাহেবকে গভর্নমেন্টই বাংলাদেশের বাজার থেকে লক্ষ লক্ষ মণ চাল কেনার কনট্রাক্ট দিলেন। আর ইস্পাহানী এই দায়িত্ব যে তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিলেন, তার একজন ছিলেন এই বিধু দত্ত।

অঘোরনাথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বুঝলে ছোট মা, ঐ ইস্পাহানীর পরামর্শে এই বিধু দত্তরা বাজারের দরের চাইতে দু' পাঁচ টাকা বেশি দাম দিয়ে রোজ হাজার হাজার মণ চাল কিনতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চালের দাম বাড়তে শুরু করল।

এই বিধু দত্ত কী ভবানীপুরেরই লোক?

না, না, ও কোন কালেই আমাদের পাড়ায় থাকেনি।

উনি একটু থেমে বলেন, শুনেছি, আগে বিধু দত্ত বারো টাকা ভাড়ায় কালীঘাটের একটা বাড়ির দু'খানা ঘরে চারটি ছেলেমেয়ে ছাড়া মা আর বউকে নিয়ে থাকত।

তারপর কোথায় থাকতেন?

অঘোরনাথ একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, বিধু দত্ত সমস্ত উত্তর বাংলা—মানে দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রাজশাহি, দিনাজপুর, রংপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি—এই আটটা জেলা থেকে চাল কেনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এক একটা জেলার লাভ দিয়ে উনি কলকাতায় এক একটা বাড়ি করেন বা কেনেন।

তার মানে ওর আটটা বাড়ি ছিল?

হ্যাঁ।

উনি একটু থেমে বলেন, তার মধ্যে কবীর রোড, সাদার্ন অ্যাভিনিউ বা আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের বাড়িগুলো তো প্রাসাদের মত ছিল।

তার মানে উনি প্রচুর টাকা আয় করেছিলেন।

হ্যাঁ, দু' তিন কোটি টাকা নিশ্চয়ই আয় করেছিলেন।

বৃদ্ধ মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, আর কি জানো ছোট মা, এই পাপের টাকা আয় করার ফলও উনি হাতে হাতে পেয়েছিলেন।

কী ফল পেয়েছিলেন?

যে দিনই উনি দশ-বিশ লাখ টাকার চেক নিয়ে বাড়িতে এসেছেন, সেই সব দিনই ওর এক একটা সর্বনাশ হয়েছে।

তাই নাকি?

অঘোরনাথ গম্ভীর হয়ে বলেন, প্রথম দিন যেদিন উনি মোটা টাকার চেক পান, সেদিনই ওঁর স্ত্রী মারা যায়। মাস তিনেক পর আবার যেদিন দশ-বারো লাখ টাকার চেক পান, সেদিনই ওর মা আগুনে পুড়ে মারা যায়।

বলেন কী ছোটকাকা?

শুনলে তুমি অবাক হবে ছোট মা, কবীর রোডের বাড়ির গৃহপ্রবেশের দিনই তিন তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ওঁর ছোট ছেলে মারা যায়।

কণিকা একটু মুখ বিকৃতি করে বলেন, এতগুলো সর্বনাশের পরও বিধুবাবুর মাথা ঠিক ছিল?

বৃদ্ধ একটু মুখ বিকৃত করে বলেন, এই সর্বনাশের পর বিধু দত্ত বড়ছেলের বিয়ে দেবার জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে মেয়েটিকে ওর এত ভাল লেগে গেল যে ঐ মেয়েটিকে উনি নিজেই বিয়ে করেন।

এ রাম! রাম!

কণিকা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, মেয়েটার বাড়ির লোকজন রাজি হল কীভাবে?

বিধু দত্ত'র বাড়ি-গাড়ি টাকাকড়ি দেখে বেচারীদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর কণিকা জিজ্ঞেস করেন, বিধুবাবুর ছেলেমেয়েরা কেমন ছিল? উনি ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে-থা দিয়েছিলেন?

ঐ বাপের ছেলেমেয়ে কী ভাল হয়?

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, বিধুবাবুর চার পাঁচটা মোটর গাড়ি ছিল। হিন্দুস্থানী ড্রাইভাররা এই গাড়িগুলো চালাত। তখন কবীর রোডে কাননবালাও থাকতেন। উনি একটা প্যাকার্ড গাড়ি চড়তেন বলে বিধুবাবুও প্রায় লাখ খানেক টাকা দিয়ে একটা প্যাকার্ড গাড়ি কিনলেন।.....

প্যাকার্ড কি খুব দামী গাড়ি ছিল?

হ্যাঁ, ছোট মা, খুবই দামী গাড়ি ছিল।

উনি একটু থেমে বলেন, তখন কলকাতা শহরে শুধু গভর্নর আর কাননবালাই প্যাকার্ড চড়তেন। ওদের পর বিধু দত্ত আর গোয়েঙ্কারা প্যাকার্ড কেনেন।

বিধুবাবুর ছেলেমেয়েদের কথা বলুন।

ওর মেয়ের কথাই বলব বলেই তো প্যাকার্ড গাড়ির কথা বলতে হল।

কণিকা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, প্যাকার্ড গাড়ির সঙ্গে মেয়ের লেখাপড়া বা বিয়ে-থা'র কী সম্পর্ক?

অঘোরনাথ একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, বিধু দত্ত ঐ প্যাকার্ড গাড়ি চালাবার জন্য যে বাঙালি ছোকরাটাকে চাকরি দিয়েছিলেন, সে একদিন ঐ গাড়ি আর বিধু দত্ত'র মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

হা ভগবান!

কিন্তু ছোট মা, তুমি শুনলে অবাক হবে, মেয়েটা ওকে বিয়ে করে সত্যি সুখী হয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, ওরা পালিয়ে যাবার মাস তিনেক পর একদিন ভোরবেলায় উঠে বিধু দত্ত দেখলেন, বাড়ির সামনে তার প্যাকার্ড গাড়িটা রাখা আছে। সামনের সিটের উপর মেয়ের লেখা দু'চার লাইনের একটা চিঠি—বাবা, আমি আমার সিদ্ধান্তে ভুল করিনি। আমার স্বামীর অর্থ-প্রতিপত্তি না থাকলেও সে সৎ এবং পরিশ্রমী। আমি আমার স্বামীর কাছে যে মর্যাদা ও ভালবাসা পাচ্ছি, তা অনেকের কপালেই জোটে না।...

বিধু দত্ত'র ছেলেরা কী করতো?

ওর দুটি' ছেলে দুটি অবতার ছিল। দুটোর কোনটাই ম্যাট্রিক পাস করতে না পারলেও গুণের শেষ ছিল না।

আচ্ছা ছোটকাকা, বিধু দত্ত সত্যি সত্যি ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন?

হ্যাঁ, ছোট মা, ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন।

সে ব্যাঙ্ক এখনও চলছে?

না, না, সে ব্যাঙ্ক কবে উঠে গেছে।

উঠে গেছে?

হ্যাঁ।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, এই হতচ্ছাড়া বিধু দত্ত'র জন্য যে কত হাজার হাজার মধ্যবিত্ত আর ছোটখাটো ব্যবসাদারদের সর্বনাশ হয়েছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, এই ব্যাঙ্কের জন্যই তো আমাদের এই দত্ত পরিবারকে বাড়ি থেকে পালাতে হয়েছিল।

কণিকা অবাক হয়ে বলেন, পালাতে হয়েছিল? কেন?

সে অনেক কথা।

মাস তিনেক ধরে আলাপ-আলোচনা শলা-পরামর্শের পর ঠিক হল, ব্যাঙ্কের নাম হবে 'গ্রেট ক্যালকাটা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন'। চেয়ারম্যান হলেন বিধুভূষণ দত্ত। ডিরেক্টর হলেন শ্যামাপদ দত্ত, শিবপদ দত্ত ছাড়াও বিধুবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী পারুল দত্ত ও ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ভূতপূর্ব চিফ্ ক্যাশিয়ার স্নেহময় সরকার।

বিধুবাবু বললেন, বুঝলে শ্যামাপদ, ব্যাঙ্কের কয়েক শ' কর্মচারীকে ঠিক মত চালান

আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার পাই পয়সা পর্যন্ত হিসেব-নিকেশ রাখা খুব সহজ ব্যাপার না।

শিবপদ একটু হেসে বলেন, তা আমরা খুব ভাল করেই জানি।

তাছাড়া আমাদের ব্যাঙ্কের ভিতরকার খবর-টবর যাতে অন্য ব্যাঙ্কে পৌঁছে না যায়, সেদিকেও যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে।

শ্যামাপদ বললেন, সে তো রাখতেই হবে। তা না হলে আমরা ব্যাঙ্ক চালাব কী করে?

এবার বিধুবাবু বললেন, শ্যামাপদ-শিবপদ, তোমাদের যদি মত থাকে, তাহলে বাইরের কাউকে জেনারেল ম্যানেজার না করে স্নেহময়বাবুকেই জেনারেল ম্যানেজার করলেই বোধহয় ভাল হয়।

প্রস্তাবটা শুনে স্নেহময়বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমাকে? রিটায়ার করার পর আবার...

শ্যামাপদ বললেন, স্নেহময়বাবু, আপনি জেনারেল ম্যানেজার হলে আমরা কত নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো, তা জানেন?

শিবপদ ওকে বললেন, আপনি ব্যাঙ্কের একজন প্রধান শেয়ার হোল্ডার আর ডিরেক্টর। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে আপনার যে দরদ থাকবে, তা কি মাইনে করা লোকের কাছে পাওয়া সম্ভব?

বিধুবাবু বলেন, ঠিক বলেছ শিবপদ।

শেষ পর্যন্ত স্নেহময়বাবু ওদের প্রস্তাব মেনে নেন।

এদিকে ঠিক হল, বিধুবাবু ও তার স্ত্রী দশ-দশ লাখ করে বিশ লাখ ও শ্যামাপদ-শিবপদও বিশ লাখ বিনিয়োগ করবেন। এছাড়া স্নেহময়বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করবেন ; তবে তার অর্ধেক নগদে ও বাকি অর্ধেক মাসিক হাজার টাকার কিস্তিতে। হ্যাঁ, স্নেহময়বাবুর মাইনে ঠিক হল দু'হাজার টাকা।

এরপর ওরা ঠিক করলেন, জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রথমেই অত্যন্ত ভালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে দশটি ব্রাঞ্চ খোলা হবে। তারপর প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে একটি করে নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হবে।

বিধুবাবু স্নেহময়বাবুকে বললেন, মিঃ সরকার, এমন করে ব্যাঙ্ক চালাতে হবে যে প্রত্যেকটি লোক যেন স্বীকার করতে বাধ্য হয়, আমাদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিলিতি ব্যাঙ্কের কোনো পার্থক্য নেই।

হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই চাই।

আর একটা কথা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হবার আগে যেন এই ব্যাঙ্কের ব্যাপারে কেউ কিচ্ছু না জানতে পারে, সেদিকে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

অঘোরনাথ চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, তোমাকে কি বলব ছোট মা, ওদের ঐ ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার মানুষ সত্যি চমকে উঠল।

চমকে উঠল কেন?

তখন দু'তিনটে বিলেতি ব্যাঙ্ক ছাড়া শুধু ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কই বিখ্যাত ছিল। যুদ্ধের বাজারে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ভবানীপুর ব্যাঙ্ক, ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক বা ঐ ধরনের যে ব্যাঙ্কগুলো গজিয়ে উঠেছিল তারা মোটামুটি ভাল ব্যবসা করলেও দত্তদের ব্যাঙ্কের মত আধুনিকও ছিল না- বা একই সঙ্গে এতগুলো ব্রাঞ্চ খুলে ব্যবসাও শুরু করতে পারেনি।

ওদের ব্যাঙ্ক বুঝি খুব সুন্দর ছিল?

হ্যাঁ, ছোটমা, ওদের ব্যাঙ্কে গেলেই মনে হতো, কোনো বিলিতি ব্যাঙ্কে এসেছি।

উনি একটু থেমে বলেন, দু'তিন মাসের মধ্যেই ঐ ব্যাঙ্কের এমন সুনাম হল যে হাজার হাজার লোক অন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ওদের ব্যাঙ্কে রাখতে শুরু করল।...

কণিকা প্রশ্ন করেন, তাহলে ওদের ব্যাঙ্ক উঠে গেল কেন?

অঘোরনাথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তখন ব্যাঙের ছাতার মত যতগুলো ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠেছিল, সেগুলো উঠে যায় এক দল লোকের জোচ্চুরি বদমাইশির জন্য।

জোচ্চুরি মানে?

বৃদ্ধ একটু হেসে বলে, বিধু দত্ত স্রেফ জোচ্চুরি করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই ব্যাঙ্ক খুলেছিল কিন্তু তিনি খুব ভাল করেই জানতেন, শ্যামাপদ-শিবপদ টাকা খাটিয়ে লাভ করার জন্যই বিশ লাখ টাকা এই ব্যবসায় ঢেলেছিল।

উনি একটু থেমে বলেন, তাই তো ব্যাঙ্ক একটু জমে উঠতেই বিধু আর ওর চেলা স্নেহময় সরকার ওদের দু'ভাইকে হাত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।

সাত সকালে সস্ত্রীক বিধু দত্ত ফিরপো'র বিরাট দুটো কেক নিয়ে হাজির হতেই শ্যামাপদ আর শিবপদ অবাক।

বিধু দত্ত হাসতে হাসতে বললেন, গ্রেট ক্যালকাটা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টরদের বাড়িতে তো আর দশ-বিশ টাকার দানাদার হাতে করে আসতে পারি না!

ওর কথা শুনে দু'ভাই হো হো করে হেসে ওঠেন।

শ্যামাপদ চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, এবার মনে হচ্ছে, আমরা সত্যি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হয়েছি।

বিধু দত্ত একটু হেসে বলেন, এ তো সবে কলির সন্ধে। এখন দিন দিনই বুঝতে পারবে, এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হওয়া কত সম্মানের, কত ক্ষমতার।

শিবপদ শ্রীমতী দত্তকে উপরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতেই বিধুবাবু একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে, ব্যাঙ্কের ব্যাপারে তোমরা খুশি তো?

শ্যামাপদ খুশির হাসি হেসে বলেন, আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি ব্যাঙ্ক এত ভাল চলবে। কী হে শিবপদ, তোমার কী মনে হচ্ছে?

শিবপদ একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, আমার তো মনে হচ্ছে, বছর তিনেকের মধ্যেই.আমরা আমাদের ইনভেস্ট করা টাকাটা উঠিয়ে নিতে পারব।

বিধুবাবু মুচকি হেসে বললেন, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের বিশ লাখ টাকা দু'বছরের মধ্যেই পেয়ে যাবে।

দু'বছরের মধ্যে পেয়ে যাব?

হ্যাঁ, পেয়ে যাবে।

তার মানে বছরে দশ লাখ...

শ্যামাপদ ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, তার মানে মোটামুটি ভাবে মাসে মাসে প্রায় একাশি হাজার টাকা।

বিধুবাবু আলতো করে টেবিল চাপড়ে বলেন, আরে ওর চাইতে বেশিই তো তোমরা ডিরেক্টর হিসেবে পাবে। এর উপর শেয়ার হোল্ডার হিসেবে লাভ তো আছেই।

শিবপদ বলে, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

বিধুবাবু একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কটা গাড়ি?

তিনটে।

ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হিসেবে ব্যাঙ্ক থেকেই তোমাদের দুটো গাড়ি পাবার কথা।

শ্যামাপদ বলেন, ব্যাঙ্কের গাড়ি পেলে ব্রাঞ্চগুলো একটু ঘুরে-ফিরে দেখার সুবিধে হয়।

শোনো শ্যামাপদ, ব্যাঙ্ক থেকেই তোমাদের দুটো গাড়ি কিনে দেওয়া হবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোমাদের গাড়ি তোমাদের কাছেই থাকবে। মাঝখান থেকে তোমরা দুটো গাড়ির জন্য লাখ খানেক টাকা পেয়ে যাবে আর গাড়ি দুটো চালাবার অন্য সব খরচও ব্যাঙ্ক দেবে।

শিবপদ খুশির হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেন, দু'জন ড্রাইভারের মাইনেও ব্যাঙ্ক দেবে?

একশ'বার দেবে।

বিধুবাবু একটু হেসে বলেন, ভুলে যেও না শিবপদ, আমরা ভাল টাকা আয় করব বলেই ব্যাঙ্কের ব্যবসা শুরু করেছি ; ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি বিলিয়ে দেবার জন্য আশ্রম খুলিনি।

শ্যামাপদ জিজ্ঞেস করেন, আপনি আর বৌদিও গাড়ির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা...

সব ডিরেক্টরেরই সমান সুযোগ পাওয়া উচিত, তাই না?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমরা দু'জনেও একই ভাবে ব্যাঙ্ক থেকে লাখখানেক নেব।

না, না, আপত্তির কী আছে!

তাহলে কাল এগারটা নাগাদ তোমরা দু'জনেই হেড অফিসে এসো। এই গাড়ির

ব্যাপারটা তখনই মিটিয়ে ফেলা যাবে।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

বিধুবাবু একটু হেসে বলেন, আমাদের দু'জনের কাগজে তোমরা সই করবে আর তোমাদের কাগজে আমরা সই করব। ব্যস! তাহলেই কোন ঝামেলা থাকবে না।

শিবপদ বললেন, আমরা ডিরেক্টর হিসেবে তো এসব করতেই পারি, তাই না?

বিধুবাবু সামনের সেন্টার টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, আমরা তিনজন ডিরেক্টর এক মত হলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

ঠিক সেই সময় শ্রীমতী দত্ত উপর থেকে নেমে এসে ড্রইংরুমে পা দিয়েই স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, আমরা কি ব্যাঙ্কের টাকায় বাইরে যেতে পারি?

বাইরে মানে?

বাইরে মানে দিল্লি- বোম্বে এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ...

বিধুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ব্যাঙ্কের কাজে যাচ্ছ বললেই ব্যাঙ্ক সব খরচ-পত্তর দিতে বাধ্য।

পারুল দেবী স্বামীর পাশে বসেই বললেন, তাহলে আমার একটা প্রস্তাব তোমাদের সাবাইকে মেনে নিতে হবে।

শ্যামাপদ সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলেন, বৌদি, আপনার প্রস্তাব না মেনে নিলে ভবিষ্যতে আমাদের প্রস্তাবও তো আপনি মেনে নেবেন না।

না, তা না কিন্তু...

বিধুবাবু বললেন, আগে তোমার প্রস্তাবটাই তো বলো।

পারুল দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, কালই ন'ঠাকুরপোকে বাইরে যাবার জন্য দশ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করবে।

শিবপদ অবাক হয়ে বলেন, আমি ব্যাঙ্কের কাজে দিল্লি-বোম্বে গিয়ে কী করব?

বিধুবাবু বলেন, ওরে বাপু, শুধু ব্যাঙ্কের খাতায় লেখা থাকবে তুমি ব্যাঙ্কের কাজে যাচ্ছ।

পারুল দেবী বলেন, ন'ঠাকুরপো ওর স্ত্রী আর ছেলেদের নিয়ে ঘুরে আসার পর সেজ ঠাকুরপোরা বাইরে যাবেন। তারপর আমরা যাবো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, কী, আমার প্রস্তাব পাস হলো তো?

ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে হাসতে হাসতে বললেন, পাস।

অঘোরনাথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ছোট মা, মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ যেমন পাগল হয়ে ওঠে, সেইরকম পরের টাকায় ফুর্তি করার সুযোগ পেলেও মানুষ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না।

উনি একটু থেমে বলেন, ঐ হতচ্ছাড়া বিধু দত্ত'র পাল্লায় পড়ে সেজবাবু-ন'বাবু পর্যন্ত দু'হাতে না—দশ হাতে ব্যাঙ্কের টাকা ওড়াতে শুরু করলেন।

কণিকা জিজ্ঞেস করেন, কী ভাবে ওরা টাকা ওড়াতে শুরু করলেন? ব্যাঙ্কের টাকা কী যা-তা ভাবে খরচ করা যায়?

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, ছোট মা, তখনকার দিনে পান-বিড়ি বা মুদিখানার দোকান খোলার মত যে কেউ ব্যাঙ্কের ব্যবসা করতে পারত। তবে টাটা-বিড়লাদের মত পাকা ব্যবসাদাররা অন্য পাঁচটা ব্যবসার মত ব্যাঙ্কের ব্যবসাও ভাল ভাবে চালিয়ে লাখ লাখ কোটি-কোটি টাকা লাভ করত। আর বিধু দত্তদের মত বেইমানরা শুধু জোচ্চুরি করার জন্যই ব্যাঙ্ক খুলেছিল।

উনি একটু থেমে বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর ব্যাঙ্কের এইসব জোচ্চুরি বন্ধ করার জন্যই নতুন আইন তৈরি হয়।

যাই হোক, বিধু দত্তদের কথা বলুন।

বছর দুয়েকের মধ্যে ওদের ঐ ব্যাঙ্ক দার্জিলিং কুচবিহার-রাজশাহি থেকে চব্বিশ পরগনা-মেদিনীপুর আর চট্টগ্রাম-নোয়াখালি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ তাদের দু'শ পাঁচশ' বা হাজার দু হাজার টাকা এই ব্যাঙ্কে রাখায় বিধু দত্তদের হাতে কোটি কোটি টাকা এসে গেল।

অতগুলো ব্রাঞ্চ খুললে কোটি কোটি টাকা তো জমা পড়বেই।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, বিধু দত্ত প্রথমেই কী করলেন জানো?

কী?

শেয়ারহোল্ডার ডিরেক্টরদের প্রায় সব টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিলেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল লুটপাট।

লুটপাট মানে?

হাজার রকম ভাবে ওরা ব্যাঙ্কের টাকা ওড়াতে শুরু করলেন।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, বিধু দত্ত সেজবাবু-ন'বাবুকে খুশি করার জন্য প্রথমেই ওদের দুই ছেলেকেও ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার করে দিলেন।

তখন সেজবাবু-ন'বাবুর ছেলেরা কত বড় ছিল?

তখন ওদের বয়স সাতাশ-আঠাশ হবে।

ও! তার মানে বেশ বড়?

হ্যাঁ।

অঘোরনাথ একটু হেসে বলেন, ওরা দু'জনে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হবার পর ওদের হাব-ভাব চাল-চলন দেখে সারা পাড়ার লোক কী হাসাহাসি করত।

কেন?

উনি চাপা হাসি হেসেই বলেন, দত্তদের উপর মা লক্ষ্মীর অপার করুণা থাকলেও সরস্বতীর সঙ্গে ওদের কারুরই বিশেষ ভাল সম্পর্ক ছিল না। ওদের বাড়ি ছেলেরা

চিরাচরিত নিয়মে পারিবারিক ব্যবসা চালাতে জানলেও ব্যাঙ্কের কেরানি হবারও যোগ্যতা ঐ দুই ছেলের ছিল না।

তাহলে ওরা কাজ করতেন কী করে?

বিধুবাবুর নির্দেশ মত স্নেহময় সরকার সব কাগজপত্র তৈরি করিয়ে শুধু ওদের দিয়ে সই করিয়ে নিতেন।

অঘোরনাথ হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন, বিধু দত্ত ডজন ডজন আজেবাজে লোকের নামে আজগুবি সম্পত্তির মিথ্যা দলিল তৈরি করে ব্যাঙ্কে সেগুলো বন্ধক রেখে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে।

বলেন কী?

হ্যাঁ, ছোট মা, ঠিকই বলছি।

উনি একটু থেমে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, পরবর্তীকালে গভর্নমেন্টের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জানা যায় যে সেজবাবু-ন'বাবুর দুই মূর্খ ছেলে ঐ টাকা মঞ্জুর করেছিল।

সেজবাবু-ন'বাবুও ব্যাঙ্কের টাকা মেরেছিলেন?

না, না, ওরা চুরি-জোচ্চুরি করে টাকা মারেনি ; তবে....

অঘোরনাথ কথা শেষ না করে থামতেই কণিকা জিজ্ঞেস করেন, তবে কী?

পরিচিত-অপরিচিত যারাই ওদের ধরাধরি করেছে, তাদেরই ওরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দিয়েছে। তাদের কেউই ব্যাঙ্কের টাকা শোধ দেয়নি।

এইভাবে যা তা ভাবে টাকা নেবার পর ব্যাঙ্ক চলত কী ভাবে?

ব্যাঙ্ক তো চলেনি।

চলেনি মানে?

হঠাৎ একদিন লোকজন নিজেদের গচ্ছিত টাকা তুলতে এসে দেখল, ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারছে না।

বলেন কী ছোটকাকা? ব্যাঙ্ক টাকা দিতে পারলো না?

না, না, দিতে পারলো না।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, ওদের ঐ ব্যাঙ্কের হেড অফিস ছিল আমাদের এই ভবানীপুরেই, আর সেখানেই থাকতো খদ্দেরদের বন্ধক দেওয়া সোনা-দানা ছাড়াও ব্যাঙ্কের বারো আনা টাকা। খদ্দেরদের টাকা দেওয়া যাবে না বুঝতে পেরেই বিধু দত্ত আর স্নেহময় সরকার একদিন মাঝরাত্তিরে হেড অফিসের আলমারি সিন্দুক থেকে সমস্ত সোনাদানা-টাকাকড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

এ রাম! রাম!

কণিকা একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, ওদের পুলিশ ধরেনি?

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, বহু লোকজন ভবানীপুর থানায় গিয়েছিল কিন্তু তাদের বলা হল, ব্যাঙ্কের দু'জন দারোয়ান আলমারি আর সিন্দুক ভেঙে সমস্ত

সোনাদানা-টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে বলে আগের দিন রাত্রেই বিধু দত্ত পুলিশের কাছে নালিশ করেছেন।

তারপর?

পুলিশ বলল, ওরা দারোয়ানদের খুঁজে পাচ্ছে না ; তবে ধরার চেষ্টা করছে।

অঘোরনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ছোট মা, যেদিন ওদের ব্যাঙ্ক ফেল মারল, সেদিন এই দত্ত বাড়ির সামনে কি কাণ্ড হয়েছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

কী হয়েছিল ছোট কাকা?

সেদিন হাজার হাজার মানুষ এই বাড়ির সামনে হাজির হয়ে তাদের টাকাকড়ি-সোনাদানা ফিরিয়ে দেবার জন্য কী কাণ্ড করেছিল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

উনি একটু থেমে বলেন, সর্বস্ব হারিয়ে এক দল বিধবা তো পাগলের মত কান্নাকাটি শুরু করলেন। আর ওদের ঐ কান্নাকাটি দেখে এক দল লোক তো দত্তদের অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করল।

তখন সেজবাবু-ন'বাবু কী করলেন?

বিধু দত্ত আর সরকার মশাই পালিয়েছে জানতে পেরেই ভোর হতে না হতেই দু'তিনটে ঝি-চাকরের উপর বাড়ির ভার দিয়ে সেজবাবুরা ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যান।

ওরা আবার ফিরল কবে?

না, ছোট মা, ওরা আর এই বাড়িতে কোনদিন ফিরে আসতে সাহস করেনি।

ওদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কী হল?

যুদ্ধ শুরু হবার দু' এক বছর পর থেকেই তো ওদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। তার বছর খানেক পর দেশ স্বাধীন হলেও তখন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

উনি একটু থেমে বলেন, মোটকথা কয়েক বছরের মধ্যেই ওদের সব ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠল।

তাহলে ওদের চলতো কী করে?

বনবিহারী দত্ত কি ছেলেদের জন্য কম বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তাছাড়া মেজবাবু সব উড়িয়ে দিলেও অন্য দু'ভাইয়ের ভাগের সবকিছু সেজবাবু-ন'বাবু পান। সব মিলিয়ে তখন ওরা রীতিমত ধনী ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে সবই চলে যায়।

চলে যায় কেন?

তখন জানতে না পারলেও পরে জানা গিয়েছিল, সেজবাবু-ন'বাবুরা ভবানীপুর থেকে পালিয়ে সোজা গিরিডি চলে যান। ওখানে থাকতে থাকতে ওর কলকাতার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করেন।

ওরা আবার নতুন করে কোনো ব্যবসা শুরু করলেন না কেন?

ছোটমা, আগে ওরা সাহেবদের তৈল মর্দন করেই ব্যবসা করতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধির জোরে ব্যবসা করার ক্ষমতা ওদের ছিল না।

অঘোরনাথ একটু ভেবে বলেন, আমাদের এই ভবানীপুরেই কত ধনী বাঙালি ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের মধ্যে সরকারদের মত কিছু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল শুধু মদ-মেয়ের জন্য দশ হাতে খরচ করে ; দত্তদের মত পরিবাররা শেষ হয়ে গেল নিছক বোকামি আর দূরদর্শিতার অভাবে।

কণিকা একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করেন, দত্তবাড়ির সেজবাবু-ন'বাবুরা এখান থেকে পালিয়ে যাবার পর আপনার সঙ্গে ওদের আর দেখশুনা হয়নি?

হ্যাঁ, বেশ কয়েকবারই ওদের সঙ্গে আমাদের দেখাশুনা হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে মানে?

মানে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী আর আমার সঙ্গে।

এই কলকাতাতেই দেখা হয়েছিল?

না, না, কলকাতায় না।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, ওরা এই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার বছর তিনেক পর তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী দিল্লিতে আমার কাছে আসার পথে সপ্তাহ খানেক নৈনীতালে ছিলেন। তখন ওরাও নৈনীতাল বেড়াতে গিয়েছিল বলে দাদা-বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কণিকা একটু হেসে বলেন, তার মানে ওরা বেশ ভালই ছিলেন?

ছোট মা, ঐ নৈনীতালেই সেজবাবু কথায় কথায় দাদাকে বলেছিলেন, স্ট্র্যান্ড রোডের গুদামঘরগুলো বিক্রি করে ওরা আঠারো লাখ টাকা পেয়েছিলেন।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তখনকার দিনের আঠারো লাখ আজকের দিনে আঠারো কোটির সমান। ঐ টাকা দিয়ে ওরা বিহারেই দু'তিনটে ব্যবসা শুরু করেও চালাতে পারেনি।

তারপর?

তারপর একটার পর একটা সম্পত্তি বিক্রি করে মহানন্দে জীবন কাটাতে কাটাতে একদিন সব শেষ হয়ে গেল।

সব শেষ হয়ে গেল?

হ্যাঁ, ছোট মা, মোটামুটি দশ-বারো বছরের মধ্যে ওরা সব উড়িয়ে দিয়েছিল।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, তুমি ভাবতে পারো, বনবিহারী দত্ত'র নাতিকে আমি দেওঘরে মুদির দোকান চালাতে দেখেছি।

কণিকা অবাক হয়ে বলেন, শেষ পর্যন্ত দত্তদের এইরকম অবস্থা হয়েছিল?

বৃদ্ধ একটু হেসে বলেন, ছোট মা, বাপ-ঠাকুর্দার বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে যে বিদ্যা-বুদ্ধি-সংযম দরকার, তা কি ওদের ছিল?

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, তুমি ভাবতে পারো, ঐ গোলাপী সরকারবাড়ির এক বউ এই পাড়ারই চার-পাঁচটা বাড়িতে রান্না করে নিজের পেট চালাতেন?

কী বলছেন ছোটকাকা?

হ্যাঁ, ছোট মা, ঠিকই বলছি। দেবী মিত্তিরের মত বিখ্যাত উকিলের ছেলে যদি সিনেমা হলের গেট কিপার হতে পারে, তাহলে সরকার বাড়ির বউ রাঁধুনীগিরি করলে তো আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই।

কণিকা মাথা নেড়ে বলেন, তা ঠিক।

যে সব পরিবার অনাচার-অবিচার-ব্যাভিচারে ভরে যায়, তাদের বিপর্যয় কে ঠেকাতে পারে?

হ্যাঁ, ছোটকাকা, ঠিকই বলেছেন। পুরনো বাড়িগুলো দেখেই বুঝতে পারি, এক কালে এদের কত ঐশ্বর্য ছিল। এই সব ফ্যামিলিতে মারাত্মক কিছু অন্যায় বা ভুল না করলে কি ওদের এই অবস্থা হয়?

দু'চার মিনিট চুপ করে থাকার পর কণিকা জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা ছোট কাকা, ইংরেজ আমলের সব বাঙালি বড়লোকেদের কী এই রকম অবস্থা হয়েছিল?

না, না, সবার অবস্থা এ রকম হয়নি।

অঘোরনাথ একটু থেমে বলেন, যাদের বিচার-বুদ্ধির বা বাস্তব জ্ঞান ছিল, তাদের অবস্থা কখনই দত্তদের বা সরকারদের মত হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে বা অন্য কোনভাবে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করেছে।

হঠাৎ সবকিছু বদলে গেল। যারা জেল খাটত, কয়েদ খাটত, নিত্য নৈমিত্তিক পুলিশের লাঠি-গুলি খেত, তারা রাজার গদিতে বসল; আর যারা দেড়শ'-দু'শ বছর ধরে রাজত্ব করেছে, তারা সবাই নিঃশব্দে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিল। যে লাল পাগড়িওলায়াদের দেখে সাধারণ মানুষের হৃদপিণ্ডের ওঠানামা হঠাৎ থমকে যেতো,

সেই লালবাজারের লাল পাগড়িওয়ালারা পর্যন্ত সাধারণ মানুষদের ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। হোয়াইটওয়ে লেডল আর হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসনের বিক্রি যত কমল, খাদি প্রতিষ্ঠানের বিক্রি ঠিক তত বাড়ল।

আরো, আরো কত কি হল। রোগে-শোকে না, মানুষেরই হাতে মানুষ মরল হাজার হাজার! মানুষের ঘরবাড়িতে মানুষই আগুন দিল। লাখ লাখ মানুষ এদিক থেকে ওদিকে গেল, ওদিক থেকে এগিয়ে এলো। লাখ লাখ মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে ভিখিরি হল ; আবার ভাগ্যবান ভিখিরির দল খেয়াল খুশিমত ঘরবাড়ি দখল করে নিতেও দ্বিধা করল না। বাস্তুহারা বলে একটা নতুন সম্প্রদায় জন্ম নিল সারা দেশের গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে।

আরো, আরো কত কি ঘটল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দালাল আদর্শহীন মনুষ্যত্বহীন হৃদয়হীন আই-সি-এস আর দালাল অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের দল হঠাৎ রাতারাতি দেশবাসীর সেবক ও দেশপ্রেমিক হবার জন্য রীতিমত হাস্যকর প্রতিযোগিতা শুরু করল।

দেশের এইসব অভাবনীয় পরিবর্তনের কথা ভেবে কুলকিনারা পান না নরোত্তম মল্লিক। আপনমনে বিভোর হয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে কী করা উচিত, তাও বুঝতে পারেন না।

এইসব ভাবনা-চিন্তা করতে করতেই বেশ কয়েক মাস কেটে গেল।

সেদিন সকালে উঠেই নরোত্তম ভটচাজ্‌মশাইকে ডেকে পাঠালেন।...

ভটচাজ্‌মশাই ঘরে ঢুকেই বলেন, আমাকে কি কিছু বলবে?

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, শুধু বলব না, কিছু শুনতেও চাই।

ভটচাজ্‌মশাই বসতেই নরোত্তম বলেন, দেশের অবস্থা কী রকম মনে হচ্ছে?

নিশ্চয় ভাল না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, হাজার হোক রাজত্ব বদল হল। রাজত্ব বদল হলেই এই ধরনের অশান্তি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চিরকালই ঘটেছে কিন্তু অনন্তকাল ধরে তো এইরকম পরিস্থিতি থাকবে না।

ভটচাজ্‌মশাই একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমি কখনই বলছি না, দু'চার মাসের মধ্যেই সারা দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে; তবে দু'চার বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

নরোত্তম মাথা নেড়ে বলেন, বোধহয় আপনি ঠিকই বলছেন।

এবার উনি মুখ তুলে ভটচাজ্‌মশায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন আপনার মতে আমার এখন কী করা উচিত?

আমার মতামত না হয় পরে বলব। তুমি কী ভাবছ, সেটা আগে শুনি।

আমার আর ব্যবসা-বাণিজ্য করার ইচ্ছা নেই।

কেন?

প্রথম কথা, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তাছাড়া যেসব কংগ্রেসিরা গদিতে বসেছে, তারা আমাকে একদমই পছন্দ করে না।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর যে বিলেতি কাপড়ের আমদানি বা ব্যবসা আর চলতে পারে না, তা আমি জানি কিন্তু সারা দেশে রেল চালাতে হলে এই গভর্নমেন্টকেও বিলেত থেকে কয়েক শ'কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বা পার্টস আমদানী করতেই হবে।

হ্যাঁ, তা তো হবেই।

কিন্তু কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কখনই আমাকে ঐ ব্যবসাও করতে দেবে না।

ভটচাজ্‌মশাই একটু হেসে বলেন, নরোত্তম, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে জওহরলাল বা সর্দার প্যাটেল যখন কংগ্রেসিদের থানার দারোগা বা আই-সি-এস'দের চেয়ারে বসাননি, তখন তোমার মত ব্যবসাদারদের যে ওরা লাইসেন্স-পারমিট দেবে না, তা মনে করার কোনো কারণ নেই।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তবে হ্যাঁ, নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে ব্যবসা করতে হবে।

কিন্তু ভটচাজ্‌মশাই, এই বয়সে আমি আর নতুন করে কিছু করতে চাই না।

তুমি না পার, সুবল করবে।

ভটচাজ্‌মশাই মুহূর্ত্তের জন্য থেমে বলেন, সুবল তোমার মেজ ছেলের মত বি.এ. পাস করে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে না গেলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে।

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, আপনি সুবলকে একটু বেশি ভালবাসেন।

কথাটা ঠিক বললে না। তোমার তিনটি ছেলেই অত্যন্ত ভাল। আমি ওদের তিনজনকেই যেমন পছন্দ করি, সেইরকমই স্নেহ করি। ওরাও আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

উনি একটু থেমে বলেন, তবে বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সুবলকে যেভাবে কাজ করতে দেখছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, ও অত্যন্ত নির্ভরশীল ছেলে।

হ্যাঁ, তা ঠিক কিন্তু অন্য দু'ছেলে তো ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে একদম আগ্রহী না।

তোমার সেজ ছেলে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসে নিশ্চয়ই লালাবাজারের অফিসে বসে ব্যবসা করবে না কিন্তু ছোট ছেলে পড়াশুনা শেষ করে কী করবে, তা এখনই বলা মুশকিল।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর নরোত্তম বললেন, সুবল নিজের মত নতুন করে ব্যবসা করুক, তাতে আমার আপত্তি নেই; তবে আমি নিজে আর ব্যবসা-বাণিজ্য করব না।

উনি একটু থেমে বলেন, আমাদের গুদামে কী কোনো কাপড়-চোপড় আছে?

না।

আমরা সব পেমেন্ট পেয়েছি?

না ; বাজারে পঞ্চাশ-ষাট হাজারের মত পাওনা আছে।

রেল থেকে নতুন অর্ডার এসেছে কি?

না।

রেলের কাছে আমাদের কত পাওনা?

তা ন' -দশ লাখ হবে।

সে টাকা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে?

সামনের মার্চের মধ্যে নিশ্চয়ই সব পেমেন্ট এসে যাবে।

কোন ব্যাঙ্কে কত আছে আর কোথায় কি দেবার বা পাবার আছে, তার একটা পুরো হিসেব আমাকে দেবেন তো!

হ্যাঁ, দু'একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব।

ঐ হিসেব-নিকেশ পাবার দু'চারদিন পরই নরোত্তম ভটচাজ্‌মশাইকে বললেন, পুরো টাকাটা ছ'ভাগ হবে। আমি, আমার দুই স্ত্রী আর তিন ছেলের নামে সমানভাবে ভাগ করে ছ'টা আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

ভটচাজ্‌মশাই মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, খুলে দেব।

কলকাতার কোন একটা সম্পত্তি বিক্রি করে আমি কাশীতে আর পুরীতে দুটো বাড়ি কিনতে চাই কিন্তু কোন সম্পত্তিটা বিক্রি করা ঠিক হবে, তা একটু ভেবেচিন্তে আমাকে বলবেন।

তুমি কি এখান থেকে চলে যেতে চাও?

পুরোপুরি না গেলেও বারো মাস এখানে পড়ে থাকতে চাই না।

নরোত্তম একটু থেমে বললেন, উকিলবাবুকে একটু দেখা করতে বলবেন।

হ্যাঁ, বলব।

দিনের পর দিন উকিলবাবুর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে উইলের খসড়া তৈরি হবার পর নরোত্তম হাইকোর্টের প্রবীণ ব্যারিস্টার নগেন রায়চৌধুরীকে বললেন, উইলটা যদি একটু দেখে দেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

আপনি রবিবার সকালে এলেই আমি আমার মতামত জানিয়ে দেব।

রবিবার সকালে নরোত্তম ব্যারিস্টার সাহেবের চেম্বারে ঢুকতেই অমর রায়চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, মল্লিকমশাই, দারুণ উইল করেছেন। আপনার ছেলেরা তো দূরের কথা, নাতিরাও এইসব সম্পত্তি নষ্ট করতে পারবে না। আর বসতবাড়িটা দেবোত্তর করে খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন।

এবার উনি হাসতে হাসতে বললেন, ব্যারিস্টারি করতে গিয়ে দেখছি, বাঙালি কেনারামদের প্রায় সব ছেলেরাই বেচারাম হয় কিন্তু আপনার ছেলেদের সে দুর্নাম হবার রাস্তা আপনিই বন্ধ করে গেলেন।

উইল-পর্ব মেটার পর ভটচাজ্‌মশাই বললেন, নরোত্তম, এবার কি আমার ছুটি?

না, আরো একটা জরুরি কাজ আপনাকে করতে হবে।

আবার কী কাজ?

নরোত্তম একটু চাপা হাসি হেসে বলে, শুধু আপনি না, আমার দুই স্ত্রী ছাড়া মেয়ে-জামাইও করুণাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন।

ভটচাজ্‌মশাই এক গাল হাসি হেসে বলেন, পছন্দ তো দূরের কথা, ওকে আমি ঠিক মায়ের মত শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।

করুণা যদি বিধবা না হতো, তাহলে কি সুবলের সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারত?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কিন্তু করুণা যে সম্পর্কে ওর মাসি হয়?

করুণার সঙ্গে তো ছোট মা'র প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

এবার নরোত্তম একে প্রশ্ন করেন, সুবল যদি আপনার ছেলে হতো, তাহলে কি এই বিধবা করুণার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারতেন?

ভটচাজ্‌মশাই আবার এক গাল হাসি হেসে বলেন, করুণা আমার পুত্রবধূ হলে আমি আবার প্রাণভরে মা বলে ডাকতে পারতাম।

যদি আমার দুই স্ত্রীর মত আদায় করতে পারেন, তাহলে আপনি সুবলের সঙ্গে করুণার বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

ওরা দু'জনে তো অনেক দিন ধরেই এই বিয়ের কথা আমাকে বলছে কিন্তু সাহস করে.......

তাহলে আর কি! এবার উঠে-পড়ে লেগে যান।

কী ব্যাপার মল্লিকমশাই? হঠাৎ এতদিন পর.....

সাবিত্রীর বিস্ময়মিশ্রিত কৌতুকে নরোত্তম কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে শুধু বললেন, ঘরে চল। তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সাবিত্রী নরোত্তমের দুটো হাত ধরে প্রশ্ন করে, আগে বল, তুমি কেমন আছো। এর মধ্যে শরীর খারাপ হয়নি তো?

আমি ভালই আছি।

বড় বউ, ছোট বউ আর ছেলেমেয়েরা?

ওরাও ভাল আছে।

করুণা কেমন আছে? ও তোমাদের কাছেই আছে তো?

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, করুণা খুব ভাল আছে।

সাবিত্রী একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, খুব ভাল আছে মানে?

সুবলের সঙ্গে করুণার বিয়ে দিয়েছি।

আনন্দে-খুশিতে উত্তেজিত হয়ে সাবিত্রী এক গাল হেসে বলে, সত্যি সুবলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

খুব ভাল কাজ করেছ মল্লিকমশাই।

সাবিত্রী উদাস দৃষ্টিতে বহু দূরের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এ সংসারে মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট কেউ বুঝতে চায় না।

এবার ও ঘুরিয়ে নরোত্তমের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তুমি যে ঐ হতভাগিনীকে নিজের পুত্রবধূ করেছ, তা জেনে খুব ভাল লাগছে।

নরোত্তম শুধু একটু হাসেন।

সাবিত্রী আবার বলে, বিধবার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে বলে আত্মীয়-স্বজনরা নিশ্চয়ই খুব নিন্দা করেছে?

হ্যাঁ, অনেকেই নিন্দা করেছে, অনেকই আসে নি।

নরোত্তম একটু হেসে বলেন, তুই তো জানিস, আমি নিন্দা বা প্রশংসার পরোয়া করি না। আমি আমার কাজ করে যাই।

তা আর জানি না? খুব ভাল করেই জানি।

সাবিত্রী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি বসো। আমি তোমার জলখাবার আনি।

না, না, কিছু আনতে হবে না।

নরোত্তম এক গাল হেসে বলেন, আজকাল বৌমা আমাকে এক পেট না খাইয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই দেয় না।

খুব ভাল করেছে।

সাবিত্রী একটু থেমে বলে, এবার বল কি জরুরি কথা বলবে।

হ্যাঁ, বলছি।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি তিন ছেলে আর দুই বউকে দিয়ে আমি ছুটি নিলাম।

ছুটি নিলাম মানে?

মানে আমি আর ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলায় নেই। এবার থেকে কাশী আর পুরীতেই বেশি সময় থাকব ঠিক করেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

নরোত্তম একটু থেমে বলেন, আমি কালই কাশী যাচ্ছি। কবে ফিরব ঠিক নেই। তাই তোকে একটা জিনিস দিতে এলাম।

কী দিতে এসেছ?

নরোত্তম সাবিত্রীর দুটো হাত ধরে বলেন, তুই আমাকে যে আনন্দ, যে শান্তি দিয়েছিস, তা আমি জীবনে ভুলব না। তাই কাশী যাবার আগে তোকে কিছু টাকা দিতে এসেছি।

সাবিত্রী চাপা হাসি হেসে বলে, কত টাকা?

মাত্র কুড়ি হাজার।

দাও।

সাবিত্রী টাকাটা হাতে নিয়েই বলে, এই টাকাটা করুণাকে দিয়ে বলবে, তার এক মাসি বিয়েতে আসতে পারেনি বলে আশীর্বাদী পাঠিয়েছে।

টাকাটা নরোত্তমের হাতে দিয়ে ও বলে, আমাকে সত্যিই যদি কিছু দিতে চাও, তাহলে একটা কথা দাও।

বল, কী কথা দিতে হবে।

তুমি জীবনে আর কোনদিন আমার কাছে আসবে না। কেউ যেন বলতে না পারে, করুণার ঐ বুড়ো শ্বশুর বেশ্যাবাড়ি যায়।

সাবিত্রী চোখের জল ফেলতে ফেলতেই নরোত্তমকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।